বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

# রাজবাড়ী

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

# বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

## রাজবাড়ী

প্রধান সম্পাদক

**শামসুজ্জামান খান**

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

**মো. আলতাফ হোসেন**

সহযোগী সম্পাদক

**আমিনুর রহমান সুলতান**

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মো. সাইফুল আলম

সংগ্রাহক

জয়নুল আবেদীন

গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
রাজবাড়ী

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩০৪

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

---

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA RAJBARI : (Present state of Folklore in Rajbari District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managaing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 200.00 only. US$ : 04

**ISBN-984-07-5313-4**

www.pathagar.com

# প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ

www.pathagar.com

চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements)১ কীভাবে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

## লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

**কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে**

১.সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

২.সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।

৩.সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।

৪.সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৫.সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।

৬.সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।

৭.সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।

৮.প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।

৯.সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।

১০.সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।

১১.সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১২.বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

**যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে**

**ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

১.জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২.জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩.জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪.জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫.জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬.লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭.অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

**খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত**

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

## ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

**প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা**

ক.ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ.ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ.দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ.যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ.স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ.থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner

www.pathagar.com

rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল

www.pathagar.com

বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

## লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি

## নির্দেশিকা

**সংজ্ঞা :** Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

**ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় :** Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. **নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. **বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ি), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল, উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি এবং বিন্নি, কদমা, বাতাসা, কুলখানি, চেহলাম, জিয়ারত, মেজমানী ইত্যাদি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ির শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলা ভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

**মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :**

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি :

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম :বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

**মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না**

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

**প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)**

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

**দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)**

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

**তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)**

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

**চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)**

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

**পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)**
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

**ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)**
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

**সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)**
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

**অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)**
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

**নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)**
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

**দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)**

**একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)**

**দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য**
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

**ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)**

**চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)**
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রণয়ন সমন্বয়কারী এবং বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান রাজবাড়ী জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রাজবাড়ীর সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

**শামসুজ্জামান খান**
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

# সূচিপত্র

**জেলা পরিচিতি** (introduction of the district) ২৩–৬০

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. জনবসতির পরিচয়
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
ঞ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
ট. বিখ্যাত গায়ক.শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

**লোকসাহিত্য** (folk literature/folk narrative) ৬১–৭৬

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকছড়া

**বস্তুগত লোকসংস্কৃতি** (material culture) ৭৭–৯২

১. বাঁশজাত শিল্প
২. বেতজাত শিল্প
৩. পাটজাত শিল্প
৪. পাটি শিল্প
৫. পাখা শিল্প
৬. তাঁত শিল্প
৭. মৃৎশিল্প
৮. নকশি কাঁথা
৯. ওয়ালমেট

**লোকপোশাক-পরিচ্ছদ** (folk costume & folk ornaments) ৯৩–৯৪

www.pathagar.com

**লোকস্থাপত্য** (folk architecture) ৯৫–৯৬
১. চারচালা/দোচালা ঘর
২. খড়/ছনের ঘর

**লোকসংগীত** (folk song) ৯৭–১৩৬
১. জাগ গান
২. বারমাসি গান বা বারাসে গান বা রাখালি
৩. মেয়েলি গীত
৪. ধুয়া গান
৫. মুর্শিদি গান
৬. সারি গান
৭. ভাইফোঁটার গান
৮. নবান্নের গান
৯. ঢেঁকির গান
১০. বৃষ্টি নামানোর গান
১১. অষ্টক গান

**লোকবাদ্যযন্ত্র** (folk instruments) ১৩৭–১৪০

**লোকউৎসব** (folk festival) ১৪১–১৪৮
১. নবান্ন উৎসব
২. বৈশাখি উৎসব
৩. পৌষ পার্বণ উৎসব
৪. নৌকা বাইচ
৫. রথযাত্রা
৬. জন্মাষ্টমী
৭. চরক উৎসব
৮. বাস উৎসব
৯. আশুরা বা মহররম উৎসব
১০. নুটানি লোকউৎসব
১১. গুরু দাবড়ানো উৎসব
১২. বিচার গানের উৎসব
১৩. মহোৎসব

**লোকমেলা** (folk fair) ১৪৯–১৫০
১. লুসির মেলা

www.pathagar.com

২. হাজরা তলার মেলা
৩. ঢেঁকি গারিয়ার মেলা
৪. বারুনির মেলা
৫. দুর্গা পূজার মেলা
৬. চৌদ্দ হাত কালী পূজার মেলা
৭. রথের মেলা

লোকাচার (ritual) ১৫১–১৫৮
১. গর্ভবতী মায়ের সাত খাওয়ানো
২. অন্ন প্রাসন
৩. আশীর্বাদ অনুষ্ঠান
৪. গায়ে হলুদ
৫. চৈত্র সংক্রান্তি
৬. গাজির গানের আসর
৭. মানত
৮. গোসল করানো অনুষ্ঠান
৯. খির খাওয়ানো অনুষ্ঠান
১০. ব্যাঙের বিয়ে
১১. আমাবতি আচার
১২. খাল পার হওয়া অনুষ্ঠান
১৩. বৃষ্টি নামানোর বন্দনা বা হলুদ দেওয়া
১৪. গুক্কুনাড়ু
১৫. ভূত তাড়ানো
১৬. ভিটা পূজা
১৭. গোছ আঁকা
১৮. কাশি পূজা
১৯. গাম্মি পূজা

লোকখাদ্য (folk food) ১৫৯–১৬০
১. আমসত্ব
২. তালগুড়
৩. আকড়া
৪. টাকি মাছ ভর্তা
৫. রামদিয়ার মটকা
৬. কচুর খাটা
৭. কুলসি পিঠা

www.pathagar.com

**লোকনাট্য** (folk theatre) ১৬১–১৬৬

১. রাম লক্ষ্মণের কাহিনি
২. রাধাকৃষ্ণ : নৌকা বিলাস
৩. চণ্ডীদাস ও রজকিনির বড়শি বাওয়ার গান

**লোকক্রীড়া** (folk games) ১৬৭–১৭৪

১. সাকো খেতা, ২. ধাপ্পা খেলা, ৩. নাচটি ছাগল কাটি খেলা, ৪. বানে বউ বানে বউ খেলা, ৫. মালাবদল খেলা, ৬. সাতপাতা, ৭. আকাশে তিন তারা, ৮. ভেবি খেলা, ৯. কলাডুম ডুম, ১০. কপাল টুনি খেলা, ১১. শিকল বাঁধা, ১২. পলান টুক টুক, ১৩. রুটি পিঠে, ১৪. ঘোরা পাদানি, ১৫. ঝিঙে ভাজা/বিলকিস নাচল, ১৬. বাগুন ভাজা, ১৭. মানিক জোড় খেলা, ১৮. ছাগলগিরি খেলা, ১৯. রেশমা খেলা, ২০. চম্পা খেলা, ২১. পেপাস খেলা, ২২. বরফ পানি খেলা, ২৩. ডাতা ডাতা, ২৪. নেকচি খেলা, ২৫. দুধ কলা খেলা, ২৬. ট্যাক ট্যাক, ২৭. কুত কুত খেলা ও মাংস চুরি খেলা, ২৮. লাঠি বাড়ি খেলা

**লোকপেশাজীবী গ্রুপ** (folk groups) ১৭৫–১৭৬

**লোকচিকিৎসা** (folk medicine) **ও তন্ত্রমন্ত্র** (chant) ১৭৭–১৮০

**ধাঁধা** (riddle) ১৮১–১৮৮

**প্রবাদ-প্রবচন** (folk sayings & proverb) ১৮৯–১৯৪

**লোকবিশ্বাস** (folk belief) **ও লোকসংস্কার** (folk superstition) ১৯৫–২০৬

**লোকপ্রযুক্তি** (folk technology) ২০৭–২০৮

www.pathagar.com

# জেলা পরিচিতি

## ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার বা ভূ-স্বামীর প্রভাবের কথা লোকশ্রুতি ও ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত হলেও কোনো 'রাজবাড়ী'কে বা রাজাদের বাড়িকে কেন্দ্র করে জেলার নাম হয়নি। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে এ দিক থেকে 'রাজবাড়ী' জেলা ব্যতিক্রম। রাজবাড়ী জেলার নামকরণ করা হয় রাজা সূর্যকুমার রায়বাহাদুরের বাড়ির নাম অনুসারে। ইস্টার্ন (পূর্বদেশ) রেলওয়ে ১৮৭১ সালে জগতি থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারণের কালে 'সূর্যনগর' ও 'রাজবাড়ী' রেলস্টেশন ছিল না। ১৮৯০ সালে পদ্মার ভাঙনের কারণে তৎকালীন গোয়ালন্দঘাট বর্তমান গোয়ালন্দ বাজার সংলগ্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই তখন রেললাইন কালুখালি, বেলগাছি, রাজবাড়ী (বর্তমান স্টেশন) পাঁচুরিয়া হয়ে গোয়ালন্দঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়ে রাজবাড়ী স্টেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময়ে এর নামকরণ নিয়ে মতান্তর ঘটে। তৎকালীন শাসক সম্প্রদায়ের নীতিনির্ধারকগণ স্টেশনটির নাম দিতে চেয়েছিলেন ভাজনডাঙা। ভাজন সম্প্রদায় রাজবাড়ী শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়—যারা সম্পদশালী ও প্রভাবশালী। বর্তমানেও তাদের নামানুসারে রাজবাড়ী শহরের একটি অঞ্চলের নাম ভাজনচালা। স্টেশনটি বাণীবহের জমিদারি এলাকার মধ্যে থাকায় জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদার নামকরণের ক্ষেত্রে তাঁর নাম সংযুক্তির দাবি জানান। অন্যদিকে লক্ষ্মীকোলের জমিদার রাজা সূর্যকুমার একই রকম দাবি উত্থাপন করেন। এ রকম পরিস্থিতিতে ইংরেজ নীতিনির্ধারক দেশীয় রাজাদের বাড়ি এবং রাজা সূর্যকুমারের ঐতিহ্যবাহী বাড়ি বিবেচনায় রেখে স্টেশনটির নামকরণ করেন 'রাজবাড়ী'। রাজার দাবির প্রতি সম্মান দেখাতেই পরবর্তী স্টেশনের নাম তাঁর নামানুসারে রাখা হয় 'সূর্যনগর'। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ পপুলেশন ও হাউজিং সেনসাস ২০১২-এর রাজবাড়ী জেলার প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে রাজবাড়ী জেলার নামকরণ রাজা সূর্যকুমারের বাড়ির নামানুসারে 'রাজবাড়ী' হয়েছে।

১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ সালে গোয়ালন্দে ঘাট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্থাপন করা হয় রেল স্টেশন, মহকুমা অফিসারের কার্যালয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। তবে বার বার নদীর ভাঙন এবং ঘাট স্থানান্তরের কারণে ১৮৭৫ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে গোয়ালন্দে অবস্থিত সকল সরকারি কার্যালয় এবং গোয়ালন্দ মডেল হাই স্কুল পর্যায়ক্রমে রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। গোয়ালন্দ মহকুমা ও থানার প্রশাসনিক কাজ রাজবাড়ী থেকে সম্পাদিত হলেও কাগজে-কলমে নাম ছিল গোয়ালন্দ। ১৯৮৪ সালে গোয়ালন্দ মহকুমাকে জেলা গঠনের উদ্যোগ নিলে

www.pathagar.com

রাজবাড়ী জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

গোয়ালন্দের অধিবাসীরা মহকুমার নামে জেলা ঘোষণার দাবি জানান। কিন্তু বাস্তবে গোয়ালন্দ নামে মহকুমা হলেও অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারি ও রেলওয়ের স্থাপনা ছিল রাজবাড়ীকেন্দ্রিক। এই বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যেরভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ রাজবাড়ী জেলা ঘোষিত হয়। রাজবাড়ী জেলার আয়তন ১০৯২.২৮ বর্গ কিলোমিটার। ঢাকা বিভাগে অবস্থিত জেলাটি আয়তনের দিক থেকে ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহের মধ্যে ১৫তম এবং দেশের সকল জেলাসমূহের মধ্যে ৫৬তম। জেলাটি বাংলাদেশের মোট আয়তনের ০.৭৬ অংশ ধারণ করে আছে। লোকসংখ্য-১০৪৯৭৭৮, উপজেলা-৫, ইউনিয়ন-৪২, মৌজা-৭২০, গ্রাম-৯৬৭, পৌরসভা-৩, ওয়ার্ড-২৭, মহল্লা-৯৭। রাজবাড়ী জেলার উপজেলাসমূহ হলো রাজবাড়ী সদর, পাংশা, বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, কালুখালি।

## খ. ভৌগোলিক অবস্থান

**রাজবাড়ী :** রাজবাড়ী জেলার আয়তন ১০৯২.২৮ বর্গকিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে পাবনা জেলা, দক্ষিণে ফরিদপুর ও মাগুরা জেলা, পূর্বে মানিকগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলা। রাজবাড়ী জেলার উত্তর ও পূর্ব দিকে পদ্মা নদী, দক্ষিণ পশ্চিমে গড়াই নদী। পদ্মা নদী রাজবাড়ী জেলাকে উত্তরে পাবনা এবং পূর্বে মানিকগঞ্জ জেলা থেকে পৃথক করেছে। গড়াই নদী রাজবাড়ী জেলাকে দক্ষিণ পশ্চিমে মাগুরা জেলা এবং ঝিনাইদহ জেলা থেকে পৃথক করেছে। এ জেলা পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ এবং উত্তর পশ্চিমে প্রশস্ত। রাজবাড়ী জেলা ২২°৪০´ এবং ২৩°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°১৯´ এবং ৯০°৪০´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৬ ফুট উচ্চে অবস্থান করছে। রাজবাড়ী জেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে মূলত তিনটি মৌসুম সহজে পরিলক্ষিত হয়। শীতকাল নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিস্তৃত। এ মৌসুম খুবই শুষ্ক, তবে কখনো কখনো সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালের সময়সীমা মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত থাকে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। মার্চ ও এপ্রিল মাসে মাঝেমধ্যে কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে থাকে। বর্ষাকাল জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়িত্ব পায়। মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮৬ ভাগ বৃষ্টি এ সময় হয়ে থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১০৫ মিলি মিটার।

**রাজবাড়ী সদর :** রাজবাড়ী সদর উপজেলার আয়তন ৩২২.৩৪ বর্গ-কিলোমিটার। উত্তরে পাবনা জেলার বেড়া ও সুজানগর উপজেলা এবং পদ্মা নদী। দক্ষিণে ফরিদপুর জেলার মধুপুর ও ফরিদপুর সদর উপজেলা। পূর্বে গোয়ালন্দ উপজেলা এবং পশ্চিমে পাংশা ও বালিয়াকান্দি উপজেলা। ২৩°৩৫´ এবং ২৩°৪৯´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°৩৫´ এবং ৮৯°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এ উপজেলার অবস্থান।

**পাংশা :** পাংশা উপজেলার আয়তন ২৫০.৩১ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে পাবনা জেলার সুজানগর ও পাবনা সদর উপজেলা। দক্ষিণে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা। পূর্বে কালুখালি উপজেলা। পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলা এবং ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলা। ২২°৪০´ এবং ২২°৫৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°১৯´ এবং ৮৯°৩৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এ উপজেলার অবস্থান।

www.pathagar.com

**বালিয়াকান্দি :** বালিয়াকান্দি উপজেলার আয়তন ২২৮.৯৯ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে কালুখালি উপজেলা। দক্ষিণে ফরিদপুর জেলার মধুখালি উপজেলা। পূর্বে রাজবাড়ী সদর উপজেলা। পশ্চিমে কালুখালি ও মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা। ২৩°৩৩ এবং ২৩°৪৪ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°২৬ এবং ৯০°৪০ দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে এ উপজেলার অবস্থান।

**গোয়ালন্দ :** গোয়ালন্দ উপজেলার আয়তন ১২১.৮২ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে পদ্মার ওপারে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় এবং পাবনা জেলার বেড়া উপজেলা। দক্ষিণে ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর উপজেলা। পূর্বে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলা। পশ্চিমে রাজবাড়ী সদর উপজেলা। ২৩°৪১ এবং ২৩°৫০ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°৪১ এবং ৮৯°৫১ দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে গোয়ালন্দ উপজেলার অবস্থান।

**কালুখালি :** কালুখালি উপজেলার আয়তন ১৬৮.৮১ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে পদ্মার ওপারে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা। দক্ষিণে বালিয়াকান্দি উপজেলা ও মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা। পূর্বে রাজবাড়ী সদর উপজেলা। পশ্চিমে পাংশা উপজেলা। ২২°৪০ এবং ২২°৫৫ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°১৯ এবং ৮৯°৩৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে কালুখালি উপজেলার অবস্থান।

## গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রাজবাড়ী মূলত রেলওয়ে শহর। রেল স্থাপন ও রেলওয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে রাজবাড়ী শহর পরিচিতি লাভ করে। ১৯২৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল রাজবাড়ী পৌরসভা। রাজবাড়ী শহরের আয়তন ১২.১৪ বর্গ কিলোমিটার। সম্রাট আকবরের সময় বঙ্গে বারো ভূঁইয়াদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। এ সময় মুকুন্দ রায়ের অধীনে রাজবাড়ী শাসিত হয়। ষোড়শ শতকের শেষে রাজবাড়ী ভূষণা পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূষণা বর্তমানে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার একটি ধ্বংসাবশেষের নাম। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে নাওয়ারা মহল (রাজবাড়ীর কিয়দংশ ও ভূষণা) রাজা সংগ্রাম শাহ কর্তৃক শাসিত হয়। মূলত মোগল শাসন আমলে বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। প্রদেশের সকল শাসন ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন নবাব বা সুবেদার। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি সরকারগুলোকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন করেন। ঢাকা চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোনারগাঁ, বাকলা (বাকেরগঞ্জ), বাজুহা (নোয়াখালী), ফতেয়াবাদ, উদয়পুর, ভূষণা (বর্তমানে ফরিদপুরের মধুখালি উপজেলা)। ভূষণা চাকলার অন্তর্গত রাজবাড়ী অঞ্চল রাজা সীতারাম কর্তৃক শাসিত হয়। এই বিস্তৃত এলাকা কিছু সংখ্যক জমিদারিতে উপ-বিভক্ত করে জালালপুরের অধীনে বিন্যস্ত করা হয়। ঘোড়াঘাট ও যশোহরের পার্শ্ববর্তী এলাকাও জালালপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই ঢাকা চাকলার অংশ ও জালালপুরের অংশবিশেষ নিয়েই ফরিদপুর জেলা গঠিত হয়েছিল।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদদৌলার পতন ঘটে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করায় শাসন ও ভূমি

www.pathagar.com

রাজস্বের কর্তৃত্ব লাভ করে। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শাসন ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে অঞ্চলভিত্তিক ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হতে থাকেন। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডেপুটি কালেক্টরেটরের এলাকা ডিস্ট্রিক বা জেলা নামে পরিচিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা-জালালপুর, যশোহর, চট্টগ্রাম, নদীয়া, পূর্ণিয়া, বর্ধমান জেলা গঠিত হয়। পরবর্তীকালে বৃহৎ জেলাগুলোকে ভেঙে নতুন জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব জেলাকে আবার উপ-বিভাগ করে সাব-ডিভিশন বা মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বর্তমান রাজবাড়ী জেলার সাবেক মহকুমা গোয়ালন্দঘাট হিসেবে যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৮০৭ সালে পাংশা থানা যশোহর থেকে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফরিদপুর যুক্ত ছিল ঢাকা জালালপুরের সঙ্গে। ১৮১১ সালে ফরিদপুর জেলা গঠিত হলে গোয়ালন্দ ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার সমগ্র এলাকা (মধুখালি উপজেলা ব্যতিরেকে) নিয়েই বর্তমান রাজবাড়ী জেলা। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার সীমানা পুনর্গঠিত হয়। এ সময়ই গোয়ালন্দ মহকুমার সীমানার পুনর্বিন্যাস করা হয়। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে পদ্মা নদী, দক্ষিণে গড়াই নদী, পূর্বে ফরিদপুর সদর, পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলা নিয়েই গোয়ালন্দ মহকুমা যাত্রা আরম্ভ করে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার যে আদমশুমারি হয় তাতে গোয়ালন্দ মহকুমার তিনটি থানার নাম পাওয়া যায়। থানাগুলো হলো গোয়ালন্দ, বেলগাছি, পাংশা। রাজবাড়ী জেলার উপজেলাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বালিয়াকান্দি, পাংশা, খোকসা ও কুমারখালি থানা নিয়ে কুমারখালি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হলে পাংশা ও বালিয়াকান্দি থানা পাবনা জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ালন্দ মহকুমা গঠিত হলে পাংশা ও বালিয়াকান্দি গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পদ্মার ভাঙনের কারণে রাজবাড়ীতে মহকুমা সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয়।

১৮৮৮ সালে রাজবাড়ী থানা স্থাপিত হয়। থানাকে রাজবাড়ী সদর উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয় ১৯৮৪ সালে। এটি বর্তমানে রাজবাড়ী জেলার বৃহত্তম উপজেলা। উপজেলা শহরের আয়তন ১২.১৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯২৩ সালে রাজবাড়ী পৌরসভা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ৯, পৌর মহল্লা ৩১, ইউনিয়ন ১৪, গ্রাম ২০৯, মৌজা ২০০। ১৮৬৩ সালে পাংশা থানা স্থাপিত হয়। থানাটি উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৪ সালে। উপজেলা শহরের আয়তন ১৬.১৪ বর্গকিলোমিটার। পাংশা পৌরসভা সৃষ্টি হয় ১৯৯০ সালে। পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ৯, পৌর মহল্লা ২১, ইউনিয়ন ১০, গ্রাম ১৯২, মৌজা ১৬২। পাংশা উপজেলার নামকরণ অনুমান নির্ভর। এ ক্ষেত্রে দুটি মত প্রচলিত আছে : প্রথমত 'পান্‌জ শাহ' থেকে পাংশা নামের উৎপত্তি 'পান্‌জ' অর্থ পাঁচজন আর 'শাহ' অর্থ আউলিয়া বা ধর্মীয় নেতা। পাঁচজন আউলিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য নদীপথে এ অঞ্চলে আসেন। পাংশায় আস্থানা স্থাপন করে তারা পাংশার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এদের স্মৃতি রক্ষার জন্যই এই অঞ্চলের নাম হয়েছে 'পাংশা'। দ্বিতীয়ত 'পাংসী' নাম থেকে পাংশার উৎপত্তি। 'পাংসী' একপ্রকার বড় নৌকা। মোঘল আমলে সুবেদার ও শাসনকর্তাবৃন্দ নদী পথেই রাজকীয় 'পাংসী' নৌকা করেই গড়াই ও চন্দনা নদী দিয়ে দিল্লি-কলকাতা যাতায়াত করতেন। সেই

www.pathagar.com

থেকে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে 'পাংশা'। ১৮৮১ সালে বালিয়াকান্দি থানা প্রতিষ্ঠা পায়। এ থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। উপজেলা শহরের আয়তন ৬.২০ বর্গকিলোমিটার। তিনটি মৌজা নিয়ে উপজেলা শহর গঠিত। ইউনিয়ন ৭, গ্রাম ২৫৮, মৌজা ১৪৯। চন্দনা নদীর বালিয়াড়িতে গড়ে ওঠা বালিয়াকান্দির নামকরণে বালিয়াড়ির 'বালি' এবং চন্দনার 'কান্দা' (নদীর তীর) শব্দদ্বয়ের ভূমিকা আছে ধারণা করা হয়। গোয়ালন্দ রাজবাড়ী জেলার ক্ষুদ্রতম উপজেলা। ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা স্থাপিত হলেও নদী ভাঙনের কারণে প্রশাসনিক কার্যালয় ও অন্যান্য কার্যালয় রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। মহকুমার সকল কার্যক্রম রাজবাড়ী থেকে সম্পাদিত হলেও কাগজে-কলমে নাম ছিল গোয়ালন্দ। নানা পরিবর্তনের ধারায় গোয়ালন্দ থানা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে ১৯২০ সালে। ১৯৮৪ সালে গোয়ালন্দকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। উপজেলা শহরের আয়তন ৪.৫৩ বর্গ কিলোমিটার। পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ৯, পৌর মহল্লা ৪৫, ইউনিয়ন ৪, গ্রাম ১৫২, মৌজা ৫৬। গোয়ালন্দ নামের পিছনে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। এক সময় এখানে পর্তুগিজ, মগ, ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করতো। পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালেশের নামের পরিবর্তিত রূপ থেকেই গোয়ালন্দ নামের উৎপত্তি। এখানকার চরাঞ্চলে গোয়ালারা গরু পালতো বলে প্রচুর দুধ উৎপাদন হতো। এই কারণে এলাকাটি গোয়ালপাড়া নামে পরিচিত হয়। অনেকে মনে করেন গোয়ালা থেকে গোয়ালন্দ নামের উৎপত্তি। মানুষ ও দ্রব্যসামগ্রী পারাপারের জন্য এখানে একটি ঘাট বা বন্দর স্থাপিত হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন ঘাটের কারণে গোয়ালন্দ থানা গোয়ালন্দঘাট নামে পরিচিতি পায়। তবে বর্তমানে উপজেলাটি গোয়ালন্দ নামেই বিদ্যমান। ১৬ নভেম্বর ২০০৯ কালুখালি উপজেলা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। পূর্বে এ উপজেলাটি পাংশা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালুখালি উপজেলাটি পাংশার ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ইউনিয়নগুলো হলো রতনদিয়া, বোয়ালিয়া, কালিকাপুর, মাজবাড়ি, মদাপুর, মৃগী ও সাওরাইল। ইউনিয়ন ৭, গ্রাম ১৫৬, মৌজা ১৫৩। ১৯৩২ সালে কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া রেল লাইন স্থাপনের সময় কালুখালিতে জংশন স্টেশন স্থাপিত হয়। চন্দনা নদীর তীরবর্তী বাণিজ্যিক স্থান এবং রেল জংশন হিসেবে কালুখালির ব্যাপক পরিচিতির কারণে নতুন উপজেলা স্থাপনের সময় কালুখালি নামকরণ করা হয়।

পদ্মা নদীর ভাঙাগড়ার সঙ্গে রাজবাড়ী জেলার সাধারণ মানুষের ভাগ্য জড়িত। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) অধীনে রাজবাড়ী জেলায় ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বেড়ি বাঁধ আছে। এই বাঁধটি গোয়ালন্দ উপজেলার জামতলা এলাকা থেকে শুরু করে পাংশা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের সেনগ্রামে শেষ হয়েছে।

## ঘ. জনবসতির পরিচয়

১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে গোয়ালন্দ মহকুমার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৯%। পরবর্তী দশকে অর্থাৎ (১৮৯১-১৯০১) সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বদলে মৃত্যুর হার ছিল ৯.২%। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার প্রবাহ স্থির

www.pathagar.com

থাকে। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩ শতাংশ হারে কমে যায়। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ২.৯ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময় কেবল বালিয়াকান্দির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ ও পাংশার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। এর কারণ মূলত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মহামারীর প্রাদুর্ভাব অন্য তিনটি থানার তুলনায় বালিয়াকান্দিতে কম ছিল।

তা ছাড়া কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া রেললাইন নির্মাণের কারণে অন্য জেলা থেকে অনেক শ্রমিক বালিয়াকান্দিতে বসবাস করতে শুরু করে। অন্য তিনটি থানায় জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যান্য কারণ হলো নদীর ভাঙন, ভূমির উর্বরতা হ্রাস। এই কারণে অনেকেই অন্য জেলা থেকে বিশেষ করে পাবনা জেলায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে প্রথম দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হলেও শেষের দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে হয় ২২.৪ শতাংশ। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে হয় ৩.৩ শতাংশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক মন্দা, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গিয়েছিল। তবে দেশ ভাগের কারণে যে পরিমাণ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে যায় সে পরিমাণ মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্তানে আসেনি। যারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে আসেন তাদের মধ্যে বাঙালিরা মোহাজের এবং অবাঙালিরা বিহারি বলে পরিচিতি লাভ করে। এরা রাজবাড়ী সদর থানার দক্ষিণাঞ্চল এবং বালিয়াকান্দি থানার উত্তর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

## ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

রাজবাড়ী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদী হলো পদ্মা ,গড়াই, হড়াই, চন্দনা।

**গড়াই :** গড়াই রাজবাড়ী জেলার অন্যতম একটি নদী। কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়ার পূর্ব পাশে পদ্মা নদী থেকেই গড়াই নদীর উৎপত্তি হয়েছে। এই নদীর গতিপথ কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন গড়াই নদী সিরাজপুর হাওর (পাংশা উপজেলার কসবা মাজাইলের পাশে) থেকে বর্তমান প্রবাহের ৬-৭ কিলোমিটার মাইল উত্তর দিয়ে ঘিকমলা চষাবিল হয়ে পূর্ব মুখে বালিয়াকান্দির পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতো। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে এই নদী প্রায় ১৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে বালিয়াকান্দি উপজেলার পশ্চিম সীমা বরাবর প্রবাহিত। ১৫/২০ বছর পূর্বেও গড়াই নদী নাব্য ছিল। এ নদীতে জোয়ার-ভাটা হতো। এ নদী শুষ্ক মৌসুমে নাব্য থাকে না। গড়াই নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে এর প্রাচীন বড় কোল অর্থাৎ মরা খাত তেঢালা, পাকুরিয়া, কাছমিয়া বিলে পরিণত হয়েছে। সিরাজপুর হাওর গড়াই নদীর পুরাতন প্রবাহ। এ হাওর থেকে উৎসারিত চত্রা খাল বালিয়াকান্দির নাড়ুয়া ঘাটে এসে গড়াই নদীতে মিশেছে। বালিয়াকান্দির এলাঙ্গি, তেকাটি হয়ে যে ভাটিখাল বিদ্যমান তা গড়াই নদীর মরা খাত। গড়াই নদী যখন নাব্য ছিল তখন পণ্য পরিবহন ও ব্যবসার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

www.pathagar.com

**পদ্মা :** রাজবাড়ী জেলার পাংশা, রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলার সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বর্তমানে প্রবাহিত পদ্মা নদী। বিভিন্ন সময়ে এ নদী বার বার খাত পরিবর্তন করেছে। খাত পরিবর্তনের কারণে এ নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। চলার পথে এ নদী রেখে গেছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, খাল, কোল ইত্যাদি। গঙ্গার প্রবাহ বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত। অর্ধশতাব্দী পূর্বে গঙ্গার প্রধান ধারা ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত হতো। ভাগীরথী নদীতে পলি জমলে নদীর গতিপথ ক্রমশ পূর্বে জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, কুমার, গড়াই, হড়াই, চন্দনা দিয়ে চলতে থাকে। পদ্মা নদী কালে কালে খাত পরিবর্তন করে পশ্চিম থেকে ক্রমশ পূর্ব দিকে নতুন নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে পদ্মা নদী উত্তর দিকে পাংশা উপজেলার হাবাসপুর থেকে ধাওয়াপাড়া ঘাট পর্যন্ত এসে মিজানপুর থেকে বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে গোয়ালন্দের ৩ কিলোমিটার উত্তরে দৌলতদিয়ার কাছাকাছি যমুনার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পাংশা উপজেলার উত্তরাংশ, রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দ উপজেলার অধিকাংশ এলাকা পদ্মা নদী থেকে জেগে উঠা চর দ্বারা সৃষ্টি।

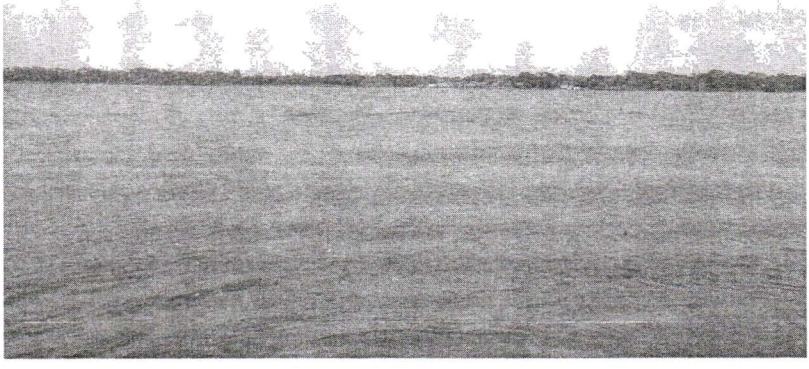

পদ্মা নদী

**চন্দনা :** চন্দনা নদী পাংশা উপজেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ফরিদপুর জেলার মধুখালি উপজেলার চিনিকলের নিকট কুমার নদীতে মিলিত হয়েছে। চন্দনা নদী শুষ্ক মৌসুমে নাব্য থাকে না। বর্ষা মৌসুমে এ নদী নাব্য হয়ে ওঠে। চন্দনা পদ্মার একটি শাখা। এই নদী কালুখালি উপজেলার দক্ষিণে সোনাপুর ও রামদিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বালিয়াকান্দি হয়ে পাঁচমোহনীতে মিলিত হয়েছে। চন্দনা, কুমার, হড়াই ও গড়াই নদীর মিলনস্থল পাঁচমোহনী। চন্দনা নদী প্রাচীনকালে অনেক প্রশস্ত ছিল। তবে তা বর্তমানে অনেক সরু হয়ে এখন প্রায় মৃত নদী হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

**হড়াই :** হড়াই প্রাচীন নদী। দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত হড়াই নদী অনেক প্রশস্ত ছিল। পরে তা দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি প্রবাহ মাটিপাড়া পিঁজেঘাটা বিলে পরিণত হয়েছে। অন্য প্রবাহ পদ্মা নদী থেকে উৎসারিত হয়ে বেলগাছির পশ্চিম দিক দিয়ে বাণীবহের দক্ষিণ দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পাঁচমোহনীতে মিলিত হয়েছে। হড়াই বর্তমানে মৃত নদী।

## চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাজবাড়ী জেলার শিক্ষার হার ৫২.৩%, এর মধ্যে পুরুষ ৫৪.০%, মহিলা ৫০.৬%। ২ টি সরকারি কলেজের মধ্যে ১টি পুরুষদের এবং ১টি মহিলাদের। ২২টি বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১৮টি পুরুষদের এবং ৪টি মহিলাদের। ৪টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ২টি বালকদের এবং ২টি বালিকাদের। ৭৯টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৬ টি বালকদের এবং ১৩টি বালিকাদের। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ৫২টি। বেসরকারি মাদ্রাসার মধ্যে দাখিল মাদ্রাসা ৪৩টি, আলীম মাদ্রাসা ৯টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৮টি, কামিল মাদ্রাসা ৩টি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬৩টি। বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৬টি। বেসরকারি রেজিস্টার্ডবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪টি। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পর্যায়ক্রমে সরকারিকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন। কমিউনিটি বিদ্যালয় ২১টি এবং স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ৬৪টি। কারিগরি ইনস্টিটিউট ২টি।

রাজবাড়ী জেলার প্রথম মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় বালিয়াকান্দি থানার পদমদীতে। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলী। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মধ্যে এটিই ছিল প্রথম মাইনর ইংলিশ স্কুল। এ জেলায় প্রথম হাই স্কুল হলো গোয়ালন্দ হাই স্কুল। ১৮৭২ সালে এটি নবগঠিত গোয়ালন্দ মহকুমা সদরে স্থাপিত হয়। নদীর ভাঙনের কারণে স্কুলটি ১৮৯২ সালে রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হলেও পূর্বের নাম বহাল রাখা হয়। ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়। বর্তমানে স্কুলটি রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়/ জিলা স্কুল নামে পরিচিত। এ জেলার দ্বিতীয় হাই স্কুল রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন। ১৮৮৮ সালে রাজা সূর্যকুমার এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে পাংশা জর্জ হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলটি ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে স্কুলটির নামকরণ হয়েছে পাংশা জর্জ পাইলট হাই স্কুল। ১৯১৭ সালে বালিয়াকান্দি হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাংশা থানার দ্বিতীয় হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হয় হাবাসপুরে। ১৯১৮ সালে স্থাপিত বিদ্যালয়টির নাম ছিল হাবাসপুর কাশিমবাজার রাজ হাই ইংলিশ স্কুল। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কাশিমবাজারের রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। বর্তমানে বিদ্যালয়টি হাবাসপুর কে বি রাজ হাই স্কুল নামে পরিচিত।

বালিয়াকান্দির নলিয়ার জমিদার বাড়িতে ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এস. এম. ইসস্টিটিউট। এই হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় নলিয়ার জমিদারের অবদান ছিল। ব্রিটিশ শাসন

www.pathagar.com

আমলে রাজবাড়ী জেলায় কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে কালুখালি উপজেলায় অবস্থিত রতনদিয়া রজনীকান্ত হাই স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৪০ সালে। রাজবাড়ী সদর উপজেলায় অবস্থিত বেলগাছি আলিমুজ্জামান হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালে। পাংশা উপজেলায় অবস্থিত মাছপাড়া হাই স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে। বর্তমানে কালুখালি উপজেলায় অবস্থিত মৃগী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে—রাজবাড়ী সদরের ইয়াছিন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫০), বালিয়াকান্দির নাড়ুয়া লিয়াকত আলী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫১), পাংশার কসবা আতাহার হোসেন হাই স্কুল (১৯৫৪), বি-কয়া হাই স্কুল (১৯৫৫), বাগদুলী হাই স্কুল(১৯৬১)। রাজবাড়ী সদরের রাজবাড়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয় (১৯৬১)। পাংশা উপজেলার কসবা মাজাইল গার্লস হাই স্কুল (১৯৬৫), পাংশা গার্লস হাই স্কুল (১৯৬৬), কালুখালি উপজেলার কালুখালি গার্লস হাই স্কুল (১৯৬৬)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয়গুলো হলো বালিয়াকান্দির পটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৯), রাজবাড়ী সদরের বাজার পাঠশালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯০৮)। রাজবাড়ী জেলায় উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পাঠদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজবাড়ী সরকারি কলেজ (১৯৬১), পাংশা কলেজ (১৯৬৯), বালিয়াকান্দি কলেজ (১৯৭০) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

## ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

১২০১ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০২ বা ১২০৩) তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তার পূর্বে পাল রাজা ও সেন রাজারা এদেশে অনেক মঠ, মন্দির নির্মাণ করেন। রাজবাড়ী জেলা অর্থাৎ পূর্বের গোয়ালন্দ মহকুমাতে এ ধরনের অনেক মঠ ও মন্দিরের কথা জানা যায়। এর মধ্যে পুরাতন যে সমস্ত মন্দির পাওয়া যায় তা হচ্ছে বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মেঘনা গ্রামের ছিন্নমস্তক কালী মাতার মূর্তি, দক্ষিণবাড়ী দক্ষিণা দেবী কালীর মূর্তি, কালুখালি মদনমোহন জিউর আঙিনা, বেলগাছি পুরাতন বাজার এলাকায় অবস্থিত শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির, মদাপুর রাজ রাজেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত। এসব মন্দির সপ্তদশ শতকের পূর্বে নির্মিত হয়েছে। ইতিহাসখ্যাত ত্রৈলাঙ্গস্বামী আনুমানিক সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে মেঘনা গ্রামের কালীমন্দির নির্মাণ করেন। দক্ষিণবাড়ী কালীমন্দির নির্মিত হয় প্রায় একই সময়ে, জনশ্রুতি আছে যে, কালীমাতার সাত বোন এবং তার একজন দক্ষিণা দেবী যার নামানুসারে দক্ষিণবাড়ী গ্রামের নাম। মলিয়াট গ্রামের মদনমোহন জিউর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে এবং পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে যখন নদীয়ায় শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আর্বিভাব ঘটে। তখন রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতারের ভক্তিরসের স্রোত সারা দেশ প্লাবিত হয়ে যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এতদ্‌অঞ্চলে এসেছিলেন বলে কথিত আছে। বেলগাছি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির ঐ সময়েই নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মদাপুর বাজারে অবস্থিত রাজরাজেশ্বরের মন্দিরটি বহু পুরাতন এবং সম্ভবত এটি প্রতিষ্ঠিত হয় সপ্তদশ

www.pathagar.com

শতকের শেষ দিকে। এছাড়া, সপ্তদশ শতকের পর যে মন্দির ও মঠের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে বালিয়াকান্দি উপজেলার নলিয়া গ্রামের জোড় বাংলা মন্দির, সমাধিনগর মঠ, রাজবাড়ী সদরের খানখানাপুর অন্নপূর্ণার মন্দির, গোয়ালন্দ উপজেলার বিজয়বাবুর মন্দির, বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুরের বাজার মন্দির, রাজবাড়ীর বিনোদপুরের হরিসভা মন্দির উল্লেখযোগ্য। বালিয়াকান্দির জঙ্গল ইউনিয়নের সমাধিনগর গ্রামে গড়াই নদীর পূর্ব দিকে মহাপ্রভুর সমাধিনগর মঠ বা অনাদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন বিশ শতকের গোড়ার দিকে। এখানেই গড়ে ওঠে আর্য সংঘ বিদ্যা মন্দির, যা পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সমাধিনগর মঠ সর্ব শ্রেণির হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্থস্থান। বহরপুর বাজার মন্দির উনিশ শতকের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের মাধ্যমেই বহরপুরের প্রায় শতাধিক বছরকাল ধরে রাসলীলা হয়ে আসছে। রাজবাড়ী শহরের পাশেই বিনোদপুর হরিসভাতে যে মন্দির অবস্থিত, তাও বহু প্রাচীন। এখানে প্রতি বছর খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে নামযজ্ঞ ও কীর্তন হয়ে থাকে। এছাড়া আরো অনেক ছোট খাটো মঠ মন্দির বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে।

রাজবাড়ী জেলার প্রাচীনতম মসজিদ হিসাবে বালিয়াকান্দি থানার শেকাড়া গ্রামের হযরত বাবা শাহ্ পালোয়ান নির্মিত মসজিদ। শাহ্ পালোয়ান ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বপুরুষ। শাহ্ পালোয়ান রাজবাড়ীর শেকাড়ায় আগমন করেন ১৪৮০-১৫১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। বহরপুর রেল স্টেশনের কিছুটা উত্তরে চন্দনা নদীর পূর্ব পাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এসে প্রথমে তিনি খান্‌কা আস্তানা করেন, পরে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকেই তিনি ঐ ঐতিহাসিক মসজিদ গড়ে তোলেন। পরে তাঁর মৃত্যু হলে মসজিদের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। কবরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা তাঁর মাজার বহুকাল ধরেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকট পবিত্র ও দর্শনীয় স্থান। সম্ভবত তিনি কাদেরিয়া তরিকার সাধক ছিলেন। তার জামাতা ছিলেন সৈয়দ সাদুল্লাহ। তাঁর মাজার পদমদীতে 'মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি কেন্দ্র'-এর কিছুটা উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে। সৈয়দ সাদুল্লাহের অধস্তন পুরুষ পদমদীর নবাব মীর সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, পদমদী গ্রামের আরেকজন সুফি দরবেশ মিঠুন শাহ্ এর মাজারও জঙ্গলের মধ্যে আছে। স্মৃতি কেন্দ্রের আঙ্গিনায় রয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের আবক্ষ ভাস্কর্য।

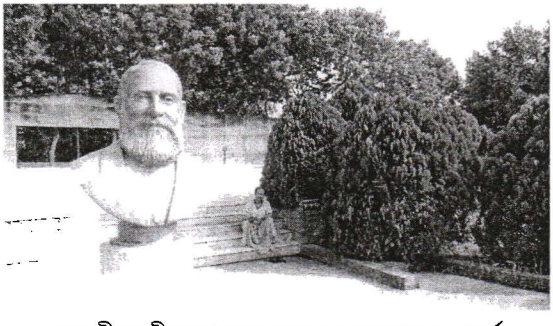

পদমদীতে মীর মশাররফ হোসেন-এর আবক্ষ ভাস্কর্য

www.pathagar.com

রাজবাড়ী জেলার দক্ষিণবাড়ী গ্রামে মসজিদবাড়ী নামক স্থানে পির মনু মিয়া ও পির ছনু মিয়ার কবর। কিন্তু তার কোন চিহ্ন কোনদিনও পাওয়া যায়নি। তাঁর অধস্তন পুরুষ সৈয়দ আব্দুল গণি, সৈয়দ মোখলেসুর রহমান ও সৈয়দ আব্দুল মোতালেবের কাছ থেকে জানা যায় ঐ দুই মহাসাধকের কবর ঐখানেই থাকলেও তাঁরাও তাদের খবর রাখেন না। তাঁদের কাছে গচ্ছিত শেজরানামায় (বংশ পরম্পরায়) দেখা যায় পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে হযরত শাহ্ আলী বোগদাদি প্রথমে মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে আসেন এবং পরে ফরিদপুরের গের্দায় এসে বসবাস ও ইসলাম প্রচার শুরু করেন। বাবা শাহ্ পালোয়ানের আগমন আরো অনেক (১৪৮০-১৫১০) পরে। শাহ্ পালোয়ানের সঙ্গে মনু মিয়া ও ছনু মিয়ার কোন সম্পর্ক ছিল না বা সাক্ষাৎও হয়নি। পাংশা উপজেলার অন্তর্গত শিকজান গ্রামে হযরত শাহ পালোয়ান আনসারীর মাজার। ইনি ছিলেন কাদেরিয়া তরিকার এবং অষ্টাদশ শতকের সাধক। তার পুত্র কাদেরিয়া তরিকার পির শাহ্ আতিউল্লাহ ওরফে শীতল শাহ্-এর মাজার বালিয়াকান্দি উপজেলার খালিয়া গ্রামে। প্রতি বছর এ দুই মাজারে ওরস উদ্‌যাপিত হয়। শাহ্ আতিউল্লাহর পুত্র ফকির এরন শাহ ও তৎপুত্র ফকির বাহাদুর আলী চিশতীর মাজার দক্ষিণবাড়ী গ্রামে অবস্থিত। তাঁরা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের বহু কেরামতি লোকমুখে প্রচলিত আছে। প্রতি বছর তাঁদের মাজারে বার্ষিক ওরস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। রাজবাড়ী জেলার ঘুঘুশাইল গ্রামে শাহ্ মফিজদ্দিন এবং পাংশার দেওয়ান জসীমুদ্দিন শাহ্ নামে দুজন সুফি দরবেশের মাজার রয়েছে।

রাজবাড়ীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাজবাড়ী বড় মসজিদ। এর গোড়াপত্তনের ইতিহাস অজানা হলেও ১৮৯২ সাল থেকে এর একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং পরিচিতি প্রকাশ পায়। হজরত বড়পির গওসুল আজমের ষোড়শ অধস্তন পুরুষ হজরত সৈয়দ্‌না ও মওলানা আবু মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আবদুল্লাহ আল্‌জিলী আল্ কাদেরি। তাঁর চার পুত্র ১. হজরত সৈয়দ্‌না ও মওলানা সৈয়দ শাহ আবুল হাসান যাকের আলী আল্ কাদেরি আল বাগদাদি যিনি গওসে সানী উপাধিতে ভূষিত। ২. হজরত সৈয়দ্‌না ও মওলানা সৈয়দ শাহ গোলাম হুসাইন আল কাদেরি আল বাগদাদি। ৩. হজরত সৈয়দ্‌না ও মওলানা সৈয়দ শাহ রজব আলী আল্ কাদেরি আল্ বাগদাদি। ৪. কনিষ্ঠ পুত্র হজরত সৈয়দনা ও মওলানা শাহ রওশন আলী আল্ কাদেরি আল্ বাগদাদি—যিনি কুতুবে বারী উপাধিতে ভূষিত। হজরত মওলানা শাহ রওশন আলী আল্ কাদেরি এর পুত্র হজরত সৈয়দ শাহ তোফায়েল আলী আল্ কাদেরির মধ্যম পুত্র হজরত সৈয়দ শাহ মেহের আলী আল্ কাদেরি (হজরত আলা হুজুর)-এর বড়পুত্র হজরত সৈয়দ শাহ মুর্শিদ আলী আল্ কাদেরি (হজরত মওলাপাক)। ১৮৯২ সালে হজরত মওলা পাক রাজবাড়ীর এই বড় মসজিদ তথা কাদেরিয়া তরিকার খান্‌কা শরীফে তার পবিত্র কদম পাক রাখেন। এই মসজিদের বিশেষত্বই হলো আওলাদে রসুল-এর কদম পাকের চিহ্ন এখানে রয়েছে। প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর শহরে মির্জা মহল্লায় ৪ ও ৫ ফাল্গুন হজরত সৈয়দনা সৈয়দ শাহ আলী আব্দুল কাদের শামসুল কাদেরি ওরফে সৈয়দ্‌না ও মওলানা সৈয়দ শাহ মুর্শিদ আলী আল্ কাদেরি, যিনি মওলা পাক নামে সমধিক পরিচিত। ঐ দিনটিতে

www.pathagar.com

বংশধারায় উত্তরাধিকারীর পরিচালনায় ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাগের অনেক আগে থেকেই ঐ উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ী থেকে একটি বিশেষ ট্রেন সরাসরি ভারতের মেদিনীপুর যায়। হুজুর পাকের অগণিত মুরীদান রয়েছে। যারা অঞ্জুমানে কাদেরিয়ার তরিকাভুক্ত বলে পরিচিত। উল্লিখিত মসজিদটি উক্ত তরিকার প্রাণকেন্দ্র।

রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার আনাচে কানাচে রয়েছে অজানা মসজিদ। এই মসজিদগুলো সর্ম্পকে লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে কিংবদন্তি। এ মসজিদগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। কত সালে তৈরি তা কেউ বলতে পারেন না। তবে স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে জানা যায় ৫০০ থেকে ৭০০ বছর পূর্বে এই মসজিদগুলো অলৌকিক-ভাবে নির্মিত হয়ে থাকবে। তেমন একটি মসজিদ রয়েছে কালুখালী থেকে কিছু দূরে রূপসা গ্রামে। কালুখালী রেলওয়ে স্টেশন থেকে বেশ কিছু দুর্গম পথ অতিক্রম করে যেতে হয় রূপসা গ্রামে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রূপসা খাল। খালের পাড়ে অলৌকিক এই মসজিদ।

অধ্যাপক মতিয়র রহমানের মতে 'এ মসজিদের ইতিহাসের সাথে পরিচিত নয় বলেই সাধারণ মানুষ মনে করে গায়েবি বা অলৌকিকভাবে মসজিদটি তৈরি হয়েছিল। এ গায়েবি মসজিদ এ অঞ্চলে প্রাচীন কালের ইসলাম প্রচারের নিদর্শন। হযরত পির খান জাহান আলীর শিষ্যবর্গ এ মসজিদ তৈরি করে থাকবে।' (রাজবাড়ী জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ২য় সংস্করণ পৃ. ৪৮)।

লোকমুখে প্রচলিত আছে হযরত শেখ ফরিদ একই সময়ে ৭ (সাত) জায়গায় ইন্তেকাল করেন। তারই সম্মানে ঐ সাতটি স্থানে অলৌকিকভাবে সাতটি মসজিদ তৈরি হয়ে যায়। বর্তমানে এই মসজিদের প্রাচীন একটি দেয়াল অবশিষ্ট আছে যা থেকে বোঝা যায় এখানে অতি প্রাচীন একটি মসজিদ বিদ্যমান ছিল। ঐ দেয়ালকে ভেতরে নিয়ে বর্তমানে একটি টিনের ঘর দিয়ে মসজিদ বানানো হয়েছে। মসজিদ প্রাঙ্গণে পুরাতন মসজিদের ভাঙা অংশবিশেষের ওপর গজিয়ে উঠেছে বিরাট এক বটগাছ। বটগাছটি দেখেই বোঝা যায় তার বয়স ৫ শত থেকে ৬ শত বছর। বটগাছ এবং মসজিদের ইট থেকে কিংবদন্তির এই মসজিদটির বয়স নির্ণয় করা সম্ভব। বর্তমানে মসজিদটির সামনে রয়েছে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। যেখানে প্রতিটি ঈদের নামাজের জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এখন অবশ্য স্থানটি পাকা করা। পাশেই রয়েছে একটি মঞ্চ, এখানে প্রতি বছর ইসলামি জলসাও অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের সাথেই একটি পাকা কবর এই কবরটি আল্লাহর ওলী হযরত শেখ ফরিদ (র. আ.)-এর।

রাজবাড়ী শহর থেকে সূর্যনগর যেতে বাগমারা বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদটি সর্ম্পকে রয়েছে রূপসা মসজিদের মতো কিংবদন্তি। ধারণা করা হয় ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের পর শাহ আলী বাগদাদির বংশধর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অত্র এলাকায় এসে থাকবেন। এলাকার প্রবীণরা বংশনুক্রমিকভাবে জেনে আসছেন প্রায় ৩০০ শত বছর পূর্বে কোনো এক সময়ে এক রাতের মধ্যে মসজিদটি তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু ছাদ করতে পারেনি। কারণ মধ্যরাতে ঐ গ্রামের এক গৃহবধূ চিড়ে কোটার জন্য ঢেঁকিতে পাড় (পা দিয়ে আঘাত করা) দেন এবং একই সময়ে একটি পাখি ডেকে ওঠে

www.pathagar.com

এবং কাজ বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামবাসীর ধারণা যারা মসজিদ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিল তারা সবাই ছিল জ্বিন। আল্লাহর ওলীর নির্দেশে তারা মসজিদ বানানোর কাজে নিয়োজিত ছিল। এলাকার লোকজন এই কাহিনি এখনো বিশ্বাস করে। মসজিদের পাশে একটি কবরে শুয়ে আছেন সৈয়দ শাহ রাজেক আলী। ইনিই প্রথম এখানে আস্তানা নির্মাণ করেন এবং আল্লার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর চেরাগ আলী ফকির এবং শাহ নজর আলী এখানে অবস্থান করেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে অত্র এলাকার বাসিন্দা আজাহার মোল্লা এই মসজিদটি পাকা করেন।

রাজবাড়ী জেলার আলিপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম শিঙ্গা। এই গ্রামে রয়েছে একটি গায়েবি মসজিদ ৩০০ বছর অথবা তারও বেশি পূর্বের। জনশ্রুতি আছে, এখানে এক রাতের মধ্যে পুকুর কেটে সেখানে ইট ভিজিয়ে এই মসজিদ তৈরি হয়। এখনো সেই ইটের তৈরি দেয়ালের রেখা রয়েছে। ঐ সময়কার ইট জায়গায়, জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও স্তূপীকৃত ইটের উপর পরগাছা জন্মেছে। অলৌকিকভাবে নির্মিত পুকুরটির অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। যদিও তার প্রায় অর্ধেক অংশ এখন বেদ্‌খল হয়ে গেছে। রূপসা মসজিদের ইট আর এই শিঙ্গা গায়েবি মসজিদের ইটের আকৃতি একই রকমের। এ থেকে বোঝা যায় মসজিদগুলো একই সময়ে নির্মিত। মসজিদটি যে স্থানে অবস্থিত সে জায়টির মালিক ছিল খেদু মুন্‌শী নামে এক ব্যক্তি। মসজিদটি বর্তমানে ইট ও টিন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

রাজবাড়ী জেলার কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনার বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

**দাদশী মাজার শরীফ :** রাজবাড়ী রেল স্টেশন থেকে দাদশী যেতে রাস্তার পাশেই দাদশী মাজারটি অবস্থিত। এই মাজারটি কত দিনের পুরনো তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। ১৮৯০ সালে রাজবাড়ী থেকে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের সময় এর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই এলাকায় রেলপথ নির্মাণের সময় রেলওয়ের নিজস্ব টেলিফোন লাইন স্থাপনের জন্য টেলিফোনের খুটি পোঁতার জন্য জনৈক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার যে স্থান নির্বাচন করেন ঐ স্থানে (বর্তমান মাজার) দুটি খেজুর গাছ বিদ্যমান ছিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উক্ত খেজুর গাছ দুটি কেটে ফেলার জন্য কর্মরত শ্রমিকদের নির্দেশ প্রদান করেন।

এলাকায় যে কাহিনি প্রচলিত তা হলো—ওই দিন মজুরেরা উক্ত গাছ দুটো কাটতে ব্যর্থ হয়। কাটতে গেলেই কারো হাত ভাঙে, কারো পা ভাঙে, কারো শরীরে আঘাত লেগে অবশ হয়ে যায়। এ সমস্ত কারণে দিন মজুরেরা ভয় পেয়ে আর ঐ খেজুর গাছের কাছেই ঘেঁসে না। পরে এ খবর পেয়ে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার নিজেই ঘটনা স্থানে চলে আসেন এবং দিন মজুরদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। এত গালাগালের পরও দিন মজুরেরা আর ঐ গাছ কাটতে রাজি হয়নি। তখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই ঐ খেজুর গাছ দুটো কাটতে লেগে যান। শরীরে নানা রকম আঘাত এবং জখম হওয়া সত্ত্বেও তিনি গাছ দুটো কাটতে পিছপা হননি। গাছ দুটো কেটেই তবে তিনি ক্ষান্ত হন। গাছ দুটো কেটে তিনি বাসায় চলে যান। রাতে যথারীতি ঘুমিয়ে পরেন। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে তিনি আর পৃথিবীর আলো দেখতে পাননি, সবকিছু অন্ধকার। তিনি

www.pathagar.com

আর চোখে কিছুই দেখতে পান না। অতি দ্রুত তিনি তার দেশে চলে যান এবং সেই সময়ে যত রকম আধুনিক চিকিৎসা ছিল সাহেবের চোখ ভালো করতে সবই ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় একদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং শুনতে পান 'তুই আমার দুটো চোখ কেটে নিয়েছিস তাই আমি তোর চোখ নিয়েছি। তুই যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে চাস তাহলে তুই দুটো সোনা রুপার চোখ দিবি। তাহলে তুই তোর দৃষ্টি ফিরে পাবি।' ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঐ খানে দুটো সোনা রুপার চোখ প্রদান করেন এবং ১ মন চাউল এবং ১ টা খাসি দিয়ে ওখানে সিন্নি করেন এবং ওখানে একটি ঘর তুলে দেন। তারপর থেকেই সবাই জানতে পারে এখানে একজন কামেল আউলিয়া শুয়ে আছেন কিন্তু ওনার কী নাম ছিল বা কোথা থেকে আগমন ঘটে তা কেউ বলতে পারে না। তবে মতিয়র রহমানের অনুসন্ধানে তাঁর নাম কামাল শাহ্। ষোড়শ শতকে এতদাঞ্চলে তিনি আগমন করেন। এলাকবাসীর মতে জনৈক পির একবার এখানে পরিদর্শনে এসে ওনাকে আখ্যায়িত করেন খোদার বেটা সেই থেকে নাম খোদাই দরগা। দাদশী মাজার শরীফ অত্র এলাকায় খোদাই দরগা নামে পরিচিত।

**বাবা মুর্শিদ জামাই পাগলের মাজার :** রাজবাড়ী শহর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রধান সড়ক দিয়ে ফরিদপুর যেতে ৪ কিলোমিটার দূরত্বে আলাদীপুর মোড়। চোখে পড়ে আধুনিক টাইলস্ দিয়ে নির্মিত কারুকার্যমণ্ডিত প্রশস্ত একটি গেট। গেটের সামনে লেখা রয়েছে বাবা মুর্শিদ জামাই পাগলের মাজার। গেটের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে একটি রাস্তা। ওই রাস্তা ধরে কিছু দূর এগিয়ে গেলে রাধাগঞ্জ বিলের ধারে মোহন শাহ-এর বটতলা। এখানে বসেই বাবা মুর্শিদ জামাই পাগল অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

কতকাল বা কবে এই কামেল ফকিরের আগমন ঘটে স্থানীয় বাসিন্দারা তা বলতে পারেন না। কথিত আছে রাজবাড়ী জেলার পাশেই উত্তরে পাবনা জেলা, ওখানে একজন ধনী লোক বাস করতেন, তার ছিল একটি বোবা মেয়ে। বাবা মুর্শিদ জামাই পাগল তখন ঐ গ্রামেই থাকতেন। গ্রামের লোকজন তাকে পাগল বলে জানতো। ধনী লোকটির মেয়ে বোবা বলে তার বিয়ে হচ্ছিল না। তখন ওই পাগলের সাথে মেয়েটিকে বিয়ে দেন। বাসর রাত শেষ হতেই মেয়েটি ঘর হতে কথা বলতে বলতে বের হয়ে আসে, মা তোমাদের জামাই কোথায়? মা-বাবা অবাক হয়ে শোনেন তাদের বোবা মেয়ে কথা বলছে। কিন্তু জামাইকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে আলাদীপুরে তারা জামাইকে পান। কিন্তুআর সংসারে ফিরে যাননি। সেই থেকে তাঁর নাম হয় জামাই পাগল। স্থানীয়ভাবে তাঁর সংস্পর্শে আসেন গহের ফকির, ইন্দ্রনারায়ণপুরের মঙ্গল শেখ।

জামাই পাগল সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি শোনা যায়। তিনি যখন এই এলাকায় প্রথম আসেন তখন এখানে ডায়রিয়ার প্রার্দুভাব দেখা দেয়। তিনি তা সারিয়ে তোলেন। ১৯৮৮ সালের বন্যায় সমস্ত এলাকা পানিতে ডুবে গেলেও মাজার প্রাঙ্গণ বন্যামুক্ত থাকে। শোনা যায় তাঁর মৃত্যুর পর এলাকাবাসী তাঁর সৎকার করেননি, কোথা থেকে জোব্বা পরিহিত কিছু লোক এসে তাঁর গোসল এবং দাফন-কাফন সম্পন্ন করে দ্রুত

www.pathagar.com

চলে যান। তাঁর মৃত্যুর পর নূর বাকের শাহ নামে এক ভক্ত এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন যার পরিধানে থাকতো চট বস্ত্র, সারা শরীর জুড়ে পেচানো থাকতো মোটা মোটা লোহার শিকল। রাজবাড়ী শহরে অনেকেই তাকে এ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। নূর বাকের শাহ প্রধানত মাজারটি আলোকিত করেন। নূর বাকের শাহের শিষ্য গৌরী পাগলী নামে এক মহিলা তাঁর সমস্ত সম্পদ এখানে ব্যয় করেন। তার বাড়ি ছিল জয়পুরহাট। নূর বাকের শাহ'র মৃত্যুর পর মাজারটি দেখাশোনা করেন গৌরী পাগলী (গৌরী মা) তিনি প্রায় ২৫ বছর এটা দেখাশোনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর খাদেম হন আব্দুর রহমান।

মাজারটির ভেতরে তিনটি কবর দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটি বাবা মুর্শিদ জামাই পাগল, তার পাশে নূর বাকের শাহ এবং তার পাশে গৌরী পাগলী (যা এখনো পাকা হয়নি)। মাজারের বাইরে একটি জায়গায় পাকা করে সুন্দর ঘর তৈরি করা হয়েছে। জানা যায় বাবা মুর্শিদ জামাই পাগলের মৃত্যুর পর জোব্বা পড়া আগন্তুক ব্যক্তিরা ঐ স্থানে তাঁকে গোসল করিয়ে ছিলেন। এখানে ওরস হয় ১৫ ফাল্গুন এবং ৩১ ফাল্গুন।

**কোমরপুর পীরজঙ্গী মাজার (শাহ জঙ্গী মাজার) :** আলাদীপুরের পাশেই কোমরপুর। কোমরপুরের পাশেই সুতা নদী। ধারণা করা যায় এ সুতা নদী এক সময়ে হড়াই নদীর শাখা ছিল। জনৈক পির এ সুতা নদী হেঁটে পার হবার সময় গভীর নদীটির পানি পিরের কোমর সমান হয়, আর তা থেকে কোমরপুর। এই পিরই পীরজঙ্গী মতান্তরে শাহ জঙ্গী। এই কামেল পিরের এখানে আগমনের সঠিক সাল-তারিখ জানা যায়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতানুসারে ১৫০০ শতকের দিকে তাঁর আগমন ঘটে। তৎকালীন সময়ে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে পির আউলিয়াদের অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হতো। ক্ষেত্র বিশেষে ধর্ম প্রচারের জন্য লড়াই করতে হতো। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করেছেন, লড়াই করেছেন মন্দ সকলের বিরুদ্ধে, তাই তিনি পির জঙ্গী। বর্তমানে ৭২ শতাংশ জমিতে এই মাজারটি অবস্থিত।

**খোশবাড়ী দরগা শরীফ :** বেলগাছি রেল স্টেশনের উত্তরে বাঁধের রাস্তার পাশে একটি বাজার।এই বাজার থেকে আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই দরগা শরীফ। লোকমুখে শোনা যায়, এটি শাহ জামাল রহমতউল্লাহ সাহেবের মাজার। জানা যায় তিনি এখানে আগমন করেন ১৭০০ সালের দিকে। ইসলাম প্রচারই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই মাজার সর্ম্পকে একটি অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। পদ্মা নদী ভাঙতে ভাঙতে মাজার পর্যন্ত এসে ঘুরে যায়। এ রকম ঘটনা নাকি কয়েক বার ঘটেছে।

**শাহ পাহলোয়ান :** মীর মশাররফ হোসেনের মতে ১৪৮০ থেকে ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শাহ পাহলোয়ান বাগদাদ শরীফ পরিত্যাগ করে ফরিদপুর অঞ্চলে এসে চন্দনা নদীর তীরে বাসস্থান নির্মাণ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এ সমস্ত তাপস প্রবরের তপস্যার জন্য নির্জনতার প্রয়োজন। চন্দনা নদীর উত্তরে সেকাড়া গ্রামে এই তাপস প্রবরের কবর বিদ্যমান। কথিত আছে তার মৃত্যুর সময় তিনি শিষ্যদের তার কবর পূর্ব পশ্চিম লম্বালম্বি দিতে বলেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা প্রচলিত

www.pathagar.com

নিয়ম মতোই তাঁকে সমাহিত করেন। কিন্তু সকালে দেখা যায় তার কবর ঘুরে পূর্ব-পশ্চিম হয়ে আছে। এখনো সেই অবস্থা বিদ্যমান।

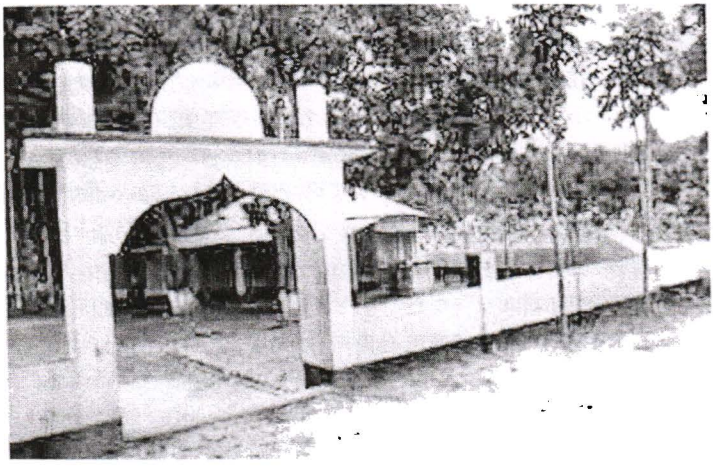

শাহ পাহলোয়ানের মাজার

**রাজবাড়ী জেলার অন্যান্য মাজার ও দরগা :** অত্র অঞ্চলে পির ওলি আউলিয়াদের সংখ্যা অনেক। আরো যাঁদের নাম শোনা যায়, যাঁদের দরগা মাজার ইত্যাদি রয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেলগাছী পুরাতন বাজার নিয়ামতউল্লাহ শাহ, পাংশা পৌরসভার মধ্যে শাহ জুঁই, খানখানাপুরের কবুল শাহ, সোনাকান্দরের শাহ আব্দুল লতিফ, গোয়ালন্দের উজানচরের শাহ এলেম মুনশী, পাঁচুরিয়ার আরব শাহ, রাজবাড়ীর উত্তরে ধুঞ্চি শাহ সাহেবের মাজার, ধুঞ্চির জুড়ান সাধুর বটতলা ইত্যাদি।

**রাজবাড়ী জেলার মন্দির :** অষ্টম শতক অথবা তার কিছু পূর্ব থেকেই রাজবাড়ী জেলায় সনাতন হিন্দুধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় থেকেই রাজবাড়ী প্রধানত হিন্দু ঘনবসতি এলাকা হিসাবে গণ্য করা হয়। আর সেই কারণেই এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে বিভিন্ন দেব-দেবীর সুদৃশ্য কারুকাজেমণ্ডিত মন্দির, মঠ, পূজামণ্ডপ এবং নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কালের বিবর্তনে বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকে এ অঞ্চলে সনাতন ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে। সেই সাথে অযত্নে অবহেলায় বিলুপ্ত হতে থাকে দৃষ্টিনন্দন সম্পন্ন মন্দির বা হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলো। কিন্তু তার পরেও এখনো অনেক মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট রয়েছে ,যার ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে যার গুরুত্বও কম নয়।

**খানখানাপুর অন্নপূর্ণার মন্দির :** খানখানাপুরের অন্নপূর্ণা মন্দির কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা জানা না গেলেও এই মন্দিরটি প্রথম খানখানাপুর বাজারের মধ্যে ছিল। এখন বাঁশহাটায় মন্দিরটি অবস্থিত যা পুনর্নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মন্দিরটি আগে ছিল ছনের ঘর। পরবর্তীকালে তা টিনের ঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল যা বর্তমানে

www.pathagar.com

সুদৃশ্য ইমারত। এই ইমারতটির প্রতিটি স্তম্ভ কারুকার্যময়। মন্দিরটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি খাল। এটা নাকি এক সময় খরস্রোতা নদী ছিল, নাম ঢোলসুন্দরী। এই মন্দিরে অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা হয় না। শুধু অন্নপূর্ণার পূজা হয়। এক সময় দীননাথ কুণ্ডুর উদ্যোগে খানখানাপুর বাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দের সহযোগিতায় এ মন্দির উন্নয়ন, পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। সে সময়ে খানখানাপুর বাজারে যে দ্রব্য বেচাকেনা হতো তা থেকে মনপ্রতি ১ (এক) পয়সা করে ঈশ্বরবৃত্তি জমা হতো। ঐ টাকা দিয়ে পূজা হতো। অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমী তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এক সময় পূজা উপলক্ষে এখানে ১৫ দিন ধরে চলতো জারি, সারি, যাত্রা, নাটক ইত্যাদি।

**কালুখালি মদনমোহন জিউর (আঙিনা)** : কালুখালি রেল স্টেশন হতে দক্ষিণে মালিয়াটে রয়েছে একটি অদ্ভুত সুন্দর মন্দির। স্থানীয় মানুষের ভাষায় মদন মোহন আঙ্গিনা। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় ৫ শত বছর পূর্বে। বাণীকণ্ঠ গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত সম্মানীয় ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে তার মাতার শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হচ্ছিল, ঠিক ঐ সময়ই বাণীকণ্ঠ গোস্বামী ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার কানে এলো ভুল মন্ত্র পাঠে পুজো হচ্ছে। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। পূজাস্থলে উপস্থিত হয়ে পূজারত ঠাকুরকে বললেন তোমার মন্ত্র ঠিক হচ্ছে না, শুদ্ধ করে পড়। ঠাকুর বললেন আমিতো এই জানি। তখন যার মায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তিনি বাণীকণ্ঠ গোস্বামীকে সবিনয় অনুরোধ করেন শুদ্ধ মন্ত্র পাঠে তার মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে দিতে।

বাণীকণ্ঠ গোস্বামী তার বাবার নিষেধ অমান্য করে সঠিক মন্ত্র ঐ ঠাকুরকে বলে দেয় এবং দ্রুত প্রস্থান করেন। এ ঘটনার পর ঐ ব্যক্তি (যার মায়ের শ্রাদ্ধ হচ্ছিল) তিনি অনেক উপঢৌকন নিয়ে বাণীকণ্ঠের বাড়ি গেলে, বাণীকণ্ঠের পিতা সমস্ত জানতে পেরে বাণীকণ্ঠ গোস্বামীকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেন।

এমতাবস্থায় বাণীকণ্ঠ অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার মনে হয় জীবনে বেঁচে থাকার আর কোন অর্থই হয় না। পাশেই নদী, আত্মহত্যা করার মানসে তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে যাবার পর তিনি দেখতে পান জল তার হাঁটু পর্যন্ত। আবার তিনি গভীর পানি আছে এমন স্থান নির্বাচন করে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একই অবস্থা। এভাবে বার বার প্রচেষ্টা নেয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মহত্যায় সফল হতে পারেন না। আবার যখন গলায় কলসি বেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান, 'ওহে বাণীকণ্ঠ তুমি কি করছো? ফিরে এসো, তুমি আমার নাম প্রচার করবে। মানুষের সেবায় নিয়োজিত হবে। তাকাও এদিকে।' বাণীকণ্ঠ গোস্বামী দেখতে পান নদীর ভেতর থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসছে শ্রী শ্রী মদনমোহন। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করেন। বাণীকণ্ঠ গোস্বামী তাঁকে অনুরোধ জানান তাকে ছেড়ে না যাবার জন্য। তখন মদনমোহন কোন বাঁশঝাড়ের কথা বলে বলেন, ওখানে তাঁর স্ত্রী রাধারাণী রয়েছেন, তাকে নিয়ে আসার জন্য। রাধারাণীকে বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। রাধারাণী ছিলেন মদনমোহনের চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা। এমন অবস্থায় মদনমোহন তাঁর স্ত্রী রাধারাণীর সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ

www.pathagar.com

করতেন। একদিন রাধারাণী বিষয়টি বুঝতে পেরে স্বামী মদনমোহনকে বিনীতভাবে বললেন- হে প্রভু, আমি আপনার সংকোচের কারণ বুঝতে পেরেছি, আপনি আর সংকোচ করবেন না। আমি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আপনার পদতলে মিশে যাব। এ ঘটনা পরবর্তীতে সত্যে পরিণত হয়। মদনমোহন যে পাথরে ভেসে নদী থেকে উঠে এসেছিলেন, সে পাথরটি মদনমোহন রাধারাণীর মন্দিরে আজও বিদ্যমান। কারুকার্যখচিত মন্দিরের উপরের অংশে রয়েছে একটি সুউচ্চ বুরুজ (টাওয়ার)। মন্দিরের সামনে রয়েছে নামকীর্তন মঞ্চ, পাশে রয়েছে রথ। এর পাশে রয়েছে আরো একটি মন্দির। তার পাশে রয়েছে রাসযাত্রা মঞ্চ। এ মন্দিরের নিয়ম অত্যন্ত কঠিন। এ মন্দিরের পুরোহিতগণ সবাই বাণীকণ্ঠ গোস্বামীর বংশধর। পুরুষ ব্যতীত বংশের কোন মহিলা ঐ মন্দিরে প্রবেশ করার নিয়ম নেই। শুধু পুরোহিতদের স্ত্রী যিনি অন্য বংশ থেকে আগত তার প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে। পুরোহিতগণ যতবার মন্দিরে প্রবেশ করবেন ততবার তাকে নদীতে স্নান করে তারপর মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। মন্দিরে চার বেলা ভোগ হয়। ভোরবেলা মঙ্গলারতি, ফুল, লুচি ইত্যাদি। দুপুরে ফল, লুচিয়াদি। বৈকালী ভোগ এবং রাত্রি বেলায় ভোগ। ভোগের নিয়ম সোয়া পাঁচ সের, কিন্তু ভক্তবৃন্দের সহায়তায় মন মন চাউলের ভোগ হয় প্রতিদিন। পাঁচ শত বছর পুরনো মদনমোহন রাধামোহন মন্দির, জিউর বা আঙিনা।

**বিজয় বাবুর মন্দির :** রাজবাড়ী শহর থেকে হাইওয়ে ধরে গোয়ালন্দ বাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে ডান দিকে একটি মাটির রাস্তা নেমে গেছে। ছায়াঘেরা একটি গ্রাম। কেউ বলেন মঠবাড়িয়া আবার কেই বলেন বিজয় বাবুর পাড়া। দুটো নামেরই একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ এলাকার জমিদার ছিলেন বিজয় বাবু। যার পুরো নাম কেউ বলতে পারেন না। শোনা যায় বিজয় বাবু ছিলেন ব্রিটিশ আমলের ইঞ্জিনিয়ার। তিনি নিজেই এই মন্দিরের নক্শা করেন এবং নিজের অর্থ ব্যয় করে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা থেকে মিস্ত্রিরা এসে এ মন্দির তৈরি করেন। বিজয় বাবু ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং সংস্কৃতিমনা মানুষ। তার স্থাপত্য নিদর্শনেই ফুটে ওঠে তার রুচিবোধ। বিশাল মন্দিরটির ছাদ থেকে আকাশের দিকে ধাবিত হয়েছে মঠ আকৃতির একটি বুরুজ (Tower) যার উচ্চতা হবে আনুমানিক ১০০ ফুট। টওয়ারটি সম্পূর্ণ ছোট ছোট রঙিন পাথর দিয়ে কারুকাজ করা। টাওয়ারের শেষে মাথায় রয়েছে একটি ত্রিশূল। মন্দিরের ঠিক সামনে রয়েছে একটি প্রশস্ত নাট্যমঞ্চ। এখানে দুর্গাপূজাসহ সব ধরনের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের নাট্যমঞ্চ প্রমাণ করে, এখানে এক সময় জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতো যাত্রা, নাটক, জলসা ইত্যাদি। মন্দিরের উপরে টাওয়ারটি ভেঙে পড়েছে। অবস্থা বেশ বিপদজনক। রাজবাড়ী জেলার জন্য এমন স্থাপত্য নির্দশন বিরল।

**খোলাবাড়িয়া ডি কে সাহার মন্দির :** রাজবাড়ী জেলার পাঁচুরিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম খোলাবাড়িয়া। এলাকার জমিদার ছিলেন শ্রী দেবনাথ কুমার সাহা। এলাকাবাসীর কাছে যিনি ডি কে সাহা বলে পরিচিত। জমিদার বাড়ির বিশাল চওড়া সীমানা দেয়ালের কিছু কিছু অংশ এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরটি

www.pathagar.com

অত্যন্ত কারুকার্যমণ্ডিত। প্রতিটি স্তম্ভে রয়েছে রুচিশীল শিল্পীর হাতের নিপুণ ছোঁয়া। দেয়ালের পলেস্তরা খসে ইট বেরিয়ে থাকলেও এর সৌন্দর্য এতটুক ম্লান হয়নি। মন্দিরের সামনেই রয়েছে প্রশস্ত জায়গা। মন্দিরের সামনে ভাঙাচোরা দেয়াল দেখে বোঝা যায় এখানে ছিল সিংহ দুয়ার। এর ঠিক সামনেই রয়েছে বিরাট একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর। এ মন্দিরে এখন শুধু দুর্গা পূজা ছাড়া আর অন্য কোন পূজা হয় না। রাজবাড়ী অঞ্চলের সুন্দরতম স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে এটি একটি। এই মন্দিরটি প্রায় ২০০ শত বছরের পুরোনো।

**শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির :** বেলগাছীর পুরাতন বাজার এলাকায় রয়েছে একটি প্রাচীন মন্দির নাম তার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির। ১২০৯ বঙ্গাব্দে নাটোরের রাজা রামজীবন এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। রামজীবনের নামে এখনো এখানে মেলা বসে। মন্দিরের অভ্যন্তর সেই সময়ে নির্মিত। একটি ঘরের দেয়ালের ভগ্নাংশ এখানো বিদ্যমান। এখানে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোলমঞ্চ এবং সানমঞ্চ। ২০২ বছরের পুরাতন এই মন্দিরের সামনে বিশাল খোলা মাঠ, রয়েছে একটি বটগাছ। এই মন্দিরে ২টি কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূর্তি ছিল যা ১৯৯০ সালে চুরি হয়ে যায়।

**রাজ রাজেশ্বরের মন্দির :** কালুখালির গাঁদিমারা থেকে রামদিয়ার দিকে যেতে মদাপুর বাজারে রয়েছে একটি অতি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এলাকাবাসী তা কিছু বলতে পারেন না। জনশ্রুতি আছে প্রায় ৩ শত বছর আগে বটগাছসহ বন্যায় এই মন্দিরটি ভেসে আসে এবং এখানেই রয়ে যায়। স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের মতে এটি একটি জাগ্রত মন্দির। এখানে এসে মানুষের মানস কামনা পূর্ণ হয়।

বিলুপ্ত হয়ে গেছে জমিদারি প্রথা। রাজবাড়ী জেলার আনাচে কানাচে রয়েছে জমিদারীর স্মৃতিচিহ্ন। রাজবাড়ীর রাজা ছিলেন রাজা সূর্যকুমার। রাজবাড়ী শহরে পৌরসভা এলাকায় লক্ষ্মীকোল গ্রামে ছিল তার প্রাসাদোপম বাড়ি। আজও লক্ষ্মীকোল রাজার বাড়ি বলে ঐ এলাকা পরিচিত। দুঃখের বিষয় সেই বিখ্যাত রাজার বাড়ির একটি ইটের চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না যা আজ বইয়ের পাতায় ইতিহাস হয়ে আটকে আছে। ঐ সময়কালে (সম্ভবত ১৮৫২ থেকে ১৯০০ শতক) বানীবহের জমিদার ছিলেন বাবু গিরিজা শংকর মজুমদার। তার জমিদারি এলাকার মধ্যে ছিল রাজবাড়ী রেলওয়ে স্টেশন। বানীবহে তার কোন স্মৃতিচিহ্ন বর্তমানে নেই। ১৮৯২ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি হাই স্কুল, যার নাম ছিল 'দি গোয়ালন্দ মডেল হাই স্কুল'। একটি প্রাসাদোপম দোতলা অট্টলিকা তিনি তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীতে এই স্কুলটির নাম হয় 'দি রাজবাড়ী মডেল হাই স্কুল'। বর্তমানে এটা 'রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়'। স্কুলের পুরাতন ভবনটি জরাজীর্ণ অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হিসাবে। আরও একটি পুরাতন স্থাপত্য নির্দশন আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচুরিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত মুকুন্দিয়া গ্রামে। ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ১২ জ্যৈষ্ঠ জন্ম হয় তৎকালীন মুকুন্দিয়া এলাকার জমিদার দ্বারকানাথ সাহা চৌধুরীর। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন ঐ এলাকার জমিদার। তাঁর মৃত্যু হয় বাংলা ১৩২২ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ। দ্বারকানাথ সাহা চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রী সরোজেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি করেন মঠ। মঠটি নির্মিত হয় বাংলা ১৩২৩ সালে অর্থাৎ দ্বারকানাথ সাহা চৌধুরীর মৃত্যুর এক বছর পর। পাশেই রয়েছে আরেকটি মঠ যা দ্বারকানাথ সাহা চৌধুরীর স্ত্রী অর্থাৎ সরোজেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরীর মাতার স্মরণে নির্মিত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পরই সরোজেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরী কলকাতায় চলে যান। তাঁর কোনো বংশধরও এখানে নেই। সরোজন্দ্রেনাথ সাহা চৌধুরী প্রতি বছর তাঁর বাবা এবং মাতার মৃত্যু দিনে এখানে এসে পূজা করতেন। জানা যায় (এলাকাবাসীর মতে) কলকাতায় সরোজেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরীর মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠ আঙুল এনে তাঁর বাবার মঠের কাছে পোড়ানো হয়।

রাজবাড়ী জেলায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বি মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তারপরও রাজবাড়ী জেলায় রয়েছে দুইটি গির্জা। একটি রাজবাড়ী সরকারি কলেজ সংলগ্ন, 'রাজবাড়ী ব্যাপ্টিস্ট চার্চ' অপরটি গোয়ালন্দের মোড়ে ক্রিশ্চিয়ান হেলথ্ অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল সার্ভিস, (চাসা) আলাদীপুরে। এর মধ্যে আলাদীপুর চার্চটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব না থাকলেও বলা যায় রাজবাড়ীতে প্রথম কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা সেবা এরাই প্রর্বতন করেন। রাজবাড়ী ব্যাপ্টিস্ট চার্চের ইতিবৃত্ত সর্ম্পকে জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যীশুখ্রিস্টের প্রবর্তিত ধর্ম প্রচারের জন্য সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ধর্মপ্রাণ মিশনারিগণ এদেশে এসেছিলেন খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য। এদের মধ্যে রাজবাড়ীর মাণ্ডলিক ইতিহাসে যাদের নাম স্মরণীয় তাদের মধ্যে অন্যতম মিশনারি ড. সাইলাস মিড। চার্চ ফলকে যাকে অবহিত করা হয়েছে ফাদার অব অস্ট্রেলিয়ান মিশন ইন ইন্ডিয়া বলে। তিনি এবং যীশুতে নিবেদিত প্রাণ মিস্ এডিথ এল কিং এই দুই মিশনারি ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে রাজবাড়ী ব্যাপ্টিস্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ান মিশন তাদের মিশনগুলি আমেরিকান সাউদান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলে রাজবাড়ী সাউদান মিশন এ গুলি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেই সময় রাজবাড়ীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি খোঁজা হচ্ছিল। তৎকালীন গোয়ালন্দের মহকুমা প্রশাসক কাজী আজাহার আলীর প্রস্তাবে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপ্টিস্ট সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক স্যামসন এইচ চৌধুরীর মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ান মিশনের সমাপ্তি ঘটে এবং বর্তমান রাজবাড়ী সরকারি কলেজ স্থাপিত হয়। অবিকৃত থেকে যায় গির্জা এবং কবরের জায়গাটুকু। গির্জাটি এখনো বিদ্যামান। এখানে প্রতি রবিবার প্রার্থনা হয়।

## জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে, সংগ্রামে রাজবাড়ী জেলার রাজনীতিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ী জেলার রাজনীতিবিদবৃন্দ

www.pathagar.com

নতুন পরিস্থিতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। সন্ন্যাস ও ফকির বিদ্রোহের সময় ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, ফকির মজনু শাহ, রাজা দয়াশীল প্রমুখের নেতৃত্বে বেলগাছির রথখোলায় আস্থানা গড়ে তোলা হয়েছিল। এ জায়গাকে কেন্দ্র করেই তারা গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, সোনাপুর, সমাধিনগর প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণেরে সহযোগিতায় বিদ্রোহী চেতনা ছড়িয়ে দেন। ওহাবী মতবাদে দীক্ষিত হয়ে হাজী শরীয়তুল্লা ও তদীয় পুত্র পির মোহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলন পরিচালনা করেন। রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি ও সোনাপুরে এ আন্দোলনের প্রভাব অধিকমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। রাজবাড়ী জেলায় এ আন্দোলন বিস্তারে জজ সাহেব নামে খ্যাত তোফাজ্জেল হোসেনের ভূমিকা ছিল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রথমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চললেও অচিরেই তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার কারণে রাজবাড়ী জেলায় স্বদেশি আন্দোলনকারীদের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, খানখানাপুর, বেলগাছি, বালিয়াকান্দি, রামদিয়া, সমাধিনগর প্রভৃতি জায়গায় অনুশীলন ও যুগান্তর দলের শক্ত সংগঠন ছিল। প্রফুল্ল কর্মকার, শ্যামেন ভট্টাচার্য, অবনী লাহিড়ী, সমর সিংহ, আশু ভরদ্বাজ কর্তৃক এই অঞ্চলের অনুশীলন সমিতি পরিচালিত হতো। স্বদেশি আন্দোলনে বিদেশি পণ্য বর্জন করার যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল তাতে যোগ দিয়েছিলেন তখনকার খানখানাপুর সুরাজ মোহিনী মিডল ইংলিশ স্কুলের ছাত্র তমিজ উদ্দিন খান। স্বদেশি আন্দোলনের সময় পাংশা থেকে রওশন আলী চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কোহিনূর' প্রত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রওশন আলী চৌধুরী পাংশায় 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি গঠন করে এ আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে হিন্দু-মুসলমান এ আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। গান্ধীর অহিংস ব্রতে উৎসাহিত হয়ে তমিজ উদ্দিন খান অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ফরিদপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সরকার কংগ্রেসের অসহযোগ কার্যক্রমকে আইন বিরোধী কার্য হিসেবে ঘোষণা করায় তমিজ উদ্দিন খান গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। এয়াকুব আলী চৌধুরী এ সময় রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকতার চাকরি ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনের যোগ দেন। তাকেও কারাবন্দি করা হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্যকে একই কারণে রাজবাড়ী থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ছিল প্রতিনিধিত্বশীল এবং ভারতবর্ষকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এর পাশাপাশি পূর্ববাংলার কৃষকদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে গঠিত হয় প্রজা সমিতি, প্রজা পার্টি। ১৯২৯ সালে লিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হলে তমিজ উদ্দিন খান যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রজা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজবাড়ীর বেলগাছির জমিদার খান বাহাদুর আলীমুজ্জামান চৌধুরী। কৃষক প্রজা সমিতি রাজবাড়ী-পাংশা অঞ্চলে সংগঠিত করতে খোন্দকার নজির উদ্দিন আহম্মদ সম্পাদিত পত্রিকার ভূমিকা ছিল তাৎপর্যময়। তিনি ১৯২২ সালে পাংশার কমলাপ্রেস থেকে প্রকাশ করেন 'গুর্খা' পত্রিকা। পত্রিকাটির স্থায়িত্বকাল ছিল স্বল্প। কমলা প্রেস থেকেই তাঁরই সম্পাদনায় ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় 'কাঙ্গাল' পত্রিকা।

www.pathagar.com

এই পত্রিকাটিও বেশিদিন চালু ছিল না। তাঁরই সম্পাদনায় ১৯৩০ সালে কুমারখালীর মথুরানাথ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে পাংশা থেকে প্রকাশিত হতো সাপ্তাহিক 'রায়ত'। খোন্দকার নজির উদ্দিন আহম্মদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'খাতক' পত্রিকাটি ১৯৩৯ সালে পাংশার কমলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। 'খাতক' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, খান বাহাদুর ইউসুফ হোসেন চৌধুরী, তমিজ উদ্দিন খান। হিন্দু-মুসলিম গরিব কৃষক প্রজার প্রতি দরদের কারণে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে তিনি বলিষ্ঠ ব্যক্তি রূপে পরিচিতি লাভ করেন। সমাজসেবা ও গ্রামীণ সাংবাদিকতায় আপসহীন মনোভাবের কারণে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের পরেই তাঁর স্থান। রাজবাড়ী অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এবং প্রজা সমিতি সংগঠিত করতে আহম্মদ আলী মৃধার অবদান তুলনারহিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ও স্বরাজ আন্দোলনের সূত্রে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। রেল যোগাযোগের সুবিধার কারণে এ সময় রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দে স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের আগমন ঘটে। সূর্যনগরের হরিণধরার বৃন্দাবন দাস স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ আন্দোলনে যুক্ত হন মনোমোহন ভাদুরী, কুমার বাহাদুর, নারায়ণ চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুণ্ডু। রাজবাড়ীতে পূর্ব থেকেই অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সংগঠন ছিল। প্রবীণ ও তরুণ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গড়ে ওঠে। মনোমোহন ভাদুরী এই অঞ্চলের আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সুসংগঠিত করেন। 'নেতাজী সুবাস বসু' গ্রন্থের ক্যাপ্টেন ভাদুরী হলেন মনোমোহন ভাদুরী। রাজবাড়ীতে দেবেন সিং, কালু মজুমদারের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। রাজবাড়ী সদরের আজাদী ময়দানের নাম এ সময় থেকে শুরু হয়।

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমায় পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন তমিজ উদ্দিন খান, খান বাহাদুর ইউসুফ হোসেন চৌধুরী. আহম্মদ আলী মৃধা, ডা. এ কে এম আসজাদ, অধ্যক্ষ কেতাব উদ্দিন আহম্মদ, আব্দুল গনি, অ্যাডভোকেট আব্দুল মাজেদ. অ্যাডভোকেট আব্দুল জলিল, মো. হাবিবুর রহমান, আব্দুল গফুর, ফখরউদ্দিন আহমেদ, আব্দুর রহমান মৃধা, হানিফ মোল্লা প্রমুখ। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন সভার ফরিদপুর-২ আসনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন আহম্মদ আলী মৃধা। পাকিস্তানের প্রতি অনুরাগ থেকেই এ সময় কালুখালির অদূরে একটি হাটের নাম করা হয়েছিল 'পাকিস্তানের হাট'।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকদের মনোভাব ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের বদলে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবোধকে উৎসাহিত করে। ভাষা আন্দোলনে ঢাকায় রাজবাড়ী জেলার কয়েকজন শিক্ষক, ছাত্রনেতা ও সরকারি কর্মচারী যোগদান করেন। তাঁরা হলেন ড. কাজী মোতাহার হোসেন (শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আব্দুল গফুর (তমদ্দুন মজলিশ), আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী (ছাত্র), সামসুল আলম (ছাত্র), হামিদুল হক ভোলা মিয়া (ছাত্র), বদরুদ্দোজা টুকু মিয়া (ছাত্র), মুন্সি মো. তোফাজ্জল হোসেন (সামরিক বাহিনীর সদস্য)। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাংবিধানিক

www.pathagar.com

এসেম্বলীতে পূর্ব বাংলা-৪৩ আসন থেকে জয়ী হন তমিজউদ্দিন খান। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলিতে ফরিদপুর-২ আসনে আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী, ফরিদপুর-১৩ আসনে মো. আবদুর রহমান নির্বাচিত হন। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক গণপরিষদ বাতিলের প্রতিবাদে তমিজ উদ্দিন খান মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় সরকার পরাজিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশক্রমে ১৯৫৫ সালে নতুন গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন। আইয়ুব খানের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের সমর্থনকারী হিসেবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রন্ট গঠিত হয়। রাজবাড়ী কলেজে এনএসএফ সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করেন বাহারুল ইসলাম, সুব্রত সরকার। ১৯৬২ সাল থেকেই আইয়ুববিরোধী সংগ্রামে রাজবাড়ী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন চিত্তরঞ্জন গুহ, আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, নাজিবুর রহমান, মকসুদ আহমেদ রাজা, কাজী ইকবাল ফারুক, আনোয়ার হোসেন, ফকীর আব্দুল জব্বার, গণেশ নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। ছাত্রলীগের অতুলনীয় ভূমিকার কারণে রাজবাড়ী কলেজে এনএসএফ পেশীশক্তির প্রদর্শন করতে পারেনি। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেন ডা. ইয়াহিয়া, কাজী হেদায়েত হোসেন, ডা. জালিলুর রহমান, মরগুব আহমেদ। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ফরিদপুর-৩ আসনে তমিজ উদ্দিন খান, ফরিদপুর-৫ আসনে ইউসুফ হোসেন চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তানের এমএনএ নির্বাচিত হন।

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর-২ আসনে এ বি এম নুরুল ইসলাম পূর্ব পাকিস্তানের এমএনএ নির্বাচিত হন। ফরিদপুর-৯ আসনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন নিজাম উদ্দিন আহমেদ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু হয় তা রাজবাড়ী জেলায় ছড়িয়ে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী, কাজী হেদায়েত হোসেন, অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ডা. জালিলুর রহমান, ডা. এসএ মালেক, একেএম নুরুজ্জামান, মরগুব আহমেদ, বাদশা চৌধুরী, রোকন চৌধুরী, আব্দুল ওয়াহাব বিশ্বাস, মোসলেম উদ্দিন মৃধা, ডা. জয়নাল আবেদীন। ৬ দফার আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার আন্দোলন শুরু হলে রাজবাড়ী কলেজেও এর তরঙ্গ আসে। রাজবাড়ী কলেজে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দেন ফকীর আব্দুল জব্বার, গণেশনারায়ণ চৌধুরী, এমজি মোস্তফা, জিল্লুল হাকিম, আব্দুল মতিন, কাজী মতিন, রেজাউল হক, শহীদুন্নবী আলম। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নেতৃত্ব দেন আল্লা নেওয়াজ খায়রু। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) নেতৃত্ব দেন আব্দুস সাত্তার।

## ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ফরিদপুর-১ আসন থেকে এমএনএ নির্বাচিত হন এবিএম নুরুল ইসলাম। প্রাদেশিক পরিষদ পিই-২০২-ফরিদপুর-১ আসনে কাজী হেদায়েত হোসেন পিই-২০৩-ফরিদপুর-৩ আসনে মোসলেম উদ্দিন মৃধা নির্বাচিত হন। ২৫ মার্চের কালরাত্রির নির্মম অভিজ্ঞতা সারাদেশের মানুষের মতো রাজবাড়ীর সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষকে বিপন্ন করে তোলে। রাজনীতিক নেতৃত্ব ও জনসাধারণ ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় আজাদী ময়দানে মিলিত হয়ে নিম্নোক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠন করে।

**রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিষদ**

১. কাজী হেদায়েত হোসেন
২. মোসলেম উদ্দিন মৃধা

**প্রতিরক্ষা পরিষদ**

১. ডা. একেএম আসজাদ
২. ডা. এসএ মালেক
৩. এমএ মোমেন(বাচ্চু মাস্টার)
৪. এটিএম রফিক উদ্দিন
৫. কমলকৃষ্ণ গুহ

**জনসংযোগ**

১. ডা.জালিলুর রহমান

**প্রশাসনিক পরিষদ**

১. আব্দুল বারি মণ্ডল
২. আকরাম হোসেন
৩. শেখ জামায়েতুল্লাহ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাঙালি জাতি সেদিন থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে মুক্তির দিক-নির্দেশনা পেয়ে যায়।

ফলে উত্তাল মার্চে সারাদেশের মতো রাজবাড়ীর মানুষও আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিছিলে-স্লোগানে রাস্তায় নেমে আসে রাজবাড়ীর ছাত্র-জনতা। রাজবাড়ী জেলা কলেজের ছাত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, সর্বস্তরের মানুষ, রাস্তায় নেমে এসে প্রতিবাদে, স্লোগানে প্রকম্পিত করে তুলে। গোয়ালন্দ বাজার, রাজবাড়ী, পাংশা, বালিয়াকান্দি, বেলগাছি, কালুখালী, মাছপাড়া হরতালের সমর্থনে বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিটি এলাকায় যুবক, ছাত্র ও নানা বয়সী সচেতন ব্যক্তিগণ তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শ নিয়ে গ্রামে গ্রামে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভাসমাবেশ এবং করণীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন, অসহযোগ আন্দোলনে সকলে একত্রিত হন।

১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ২৪ দিন মার্চের উত্তাল রাজবাড়ী। রাজবাড়ীতে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে এক হয়ে তাদের নির্দেশ মতোই কাজকর্ম শুরু করে। রাজবাড়ীতে কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা শহরে, গোয়ালন্দ ঘাট, বরাট, কাটাখালি, পাঁচুরিয়া, খানখানাপুর,

www.pathagar.com

কল্যাণপুর, পাংশা বেলগাছী, সূর্বনগর কালুখালি, মাছপাড়া, বালিয়াকান্দিসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডামি রাইফেল ট্রেনিং শুরু হয় স্থানীয়ভাবে।

রাজবাড়ীর এস.ডি.ও রাজবাড়ী পুলিশের সহায়তায় রাজবাড়ী রেলওয়ের মাঠে, জেলা স্কুল, মোল্লাবাড়ি পানির ট্রেক্রের পিছনে গেরিলা ট্রেনিং শুরু হয়। রাজবাড়ীর এস.ডি.ও., পুলিশ কর্মকর্তা, আনসার অ্যাডভোকেট ও আওয়ামী লীগ নেতা কাজী হেদায়েত হোসেন (এম.পি.এ.), অ্যাড. আবুল ওয়াজেদ চৌধুরী (এম.পি.), ডা. এম. এ. মালেক, ডা. ইয়াহিয়া (বঙ্গবন্ধুর চাচাতো ভাই), অ্যাড. আকরাম, মো. খোরশেদ আলম (আনসার প্রশিক্ষক), মো. বারি মণ্ডল, মো. বকু চৌধুরী, বাচ্চু মাস্টার, কমলকৃষ্ণ, নাজিবর রহমান, বরাটের ফজলুল হক চৌধুরী, ডা. আমজাদ, প্রফেসর ওহাব, বাদশা চৌধুরী (বরাট) ছাত্র নেতাদের মধ্যে মো. জিল্লুর হাকিম (বর্তমান এম.পি.), আ. মতিন মিয়া (পরবর্তীকালে এম.পি.), আক্কাস আলি মিয়া (এম.পি.), মকসুদ আহম্মেদ (রাজা) ট্রেনিং শুরু করেন।

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চের পর থেকে এ অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাজবাড়ী জেলা (সাবেক গোয়ালন্দ মহকুমা) গোয়ালন্দ ঘাটকে কেন্দ্র করে রাজবাড়ী শহরে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী সকল মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব নেয়। এ লক্ষ্যে রাজবাড়ী গণ-মানুষের নেতা, সাবেক গণপরিষদ সদস্য, কাজী হেদায়েত হোসেনের নেতৃত্বে এস.ডি.ও শাহ মো. ফরিদ মহকুমা কর্মকর্তা হয়েও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে রাজবাড়ী গোয়ালন্দ ঘাট প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের ডাকে সর্বস্তরের মানুষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এগিয়ে আসে, পুলিশ, আনসার, ইপিআর, বাঙালি মিলিটারি। রাজবাড়ী শহরের রেলওয়ের মাঠে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক ট্রেনিং শুরু করা হয়। রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন নেত্রীবৃন্দকে স্ব-স্ব এলাকায় অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয়।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ঢাকা পতনের পর দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে প্রবেশপথ গোয়ালন্দ ঘাটে আরিচা ঘাট এসে নদী পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী প্রচারণা, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গণসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, রণসংগীত সম্মিলিত কণ্ঠে যুবক তরুণদের নিয়ে জাগরিত করে তোলার বিষয়টি ছিল উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে রণকৌশলগত প্রশিক্ষণ ঝাড় জঙ্গলে ১৪, ১৫, ২০ বছরের যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে।

গোয়ালন্দ থানা দূরবর্তী কাটাখালীতে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে স্থাপন করা হয় টেলিফোন যোগাযোগের তথ্যকেন্দ্র। ২১ এপ্রিল গোয়ালন্দ ঘাট পতনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তথ্যকেন্দ্রটি পুরাদমে চালু থাকে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এ

www.pathagar.com

অঞ্চলের প্রতিরোধকারী মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। বিভিন্ন যুব শিবির থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রথমে গেরিলাযুদ্ধ ও পরে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেয়।

মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ সেক্টরে ভাগ করা হয়। রাজবাড়ী ছিল ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন। রাজবাড়ী তখন বৃহত্তর ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৮ নম্বর সেক্টরকে ৭টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১৫ এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। আর ১৮ আগস্ট থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল এম. আবুল মঞ্জুর। রাজবাড়ীর গণমানুষের নেতা কাজী হেদায়েত হোসেন (এমপিএ)-এর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হয়েছিল।

এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো হলো : রাজবাড়ী থানা আক্রমণ, দেব গ্রাম ইউনিয়ন অফিসে পাহারারত রাজাকারদের ক্যাম্প আক্রমণ, গোয়ালন্দ ফেরি ঘাটে অপারেশন, গোয়ালন্দ রেলব্রিজ অপারেশন, গোয়ালন্দের মমিন খাঁর হাটে যুদ্ধ, আল্লাদিপুর ব্রিজ অপারেশন রাজবাড়ী সদর উপজেলায় কয়েকটি গেরিলা অপারেশন, খলিলপুরের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, মাছপাড়া রেল স্টেশন আক্রমণ, কালিকাপুর রেল ব্রিজ অপারেশন, গোয়ালন্দে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বোমারু বিমানের আক্রমণ, বালিয়াকান্দি থানার বহরপুর স্কুলে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা রোধ করার জন্যে পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তাদের বেশি করে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকে। আর এ সুযোগটা গ্রহণ করে গেরিলা বাহিনী। দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

ফলে পাকিস্তানি বাহিনী আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পাকিস্তানি বাহিনী ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে বসে। শুরু হয় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। এ অবস্থায় ভারতের মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে গঠিত হয় যৌথ বাহিনী। বিদ্যুৎ গতিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে যৌথ বাহিনী সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ এমনই জোরদার করে যে, পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্ত এলাকা ছেড়ে এমনকি প্রত্যেক জেলার থানা পর্যায়ের ক্যাম্প ছেড়ে জেলা পর্যায়ের ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নিতে থাকে। এ পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধারা থানা, মহকুমা ও জেলা শহরগুলো শত্রুমুক্ত করে দখলে নেয়।

### পাংশা যুদ্ধ ও বিজয়

পাংশা এলাকার মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী পাংশা থানা আক্রমণের একটি মহাপরিকল্পনা নিয়ে ৬ ডিসেম্বর আক্রমণের দিন ধার্য করেন। কিন্তু আক্রমণ করতে এসে দেখেন থানার বাঙালি পুলিশ ও রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে। পাংশা এলাকার মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনী থানায় অবস্থান নেয়। ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

www.pathagar.com

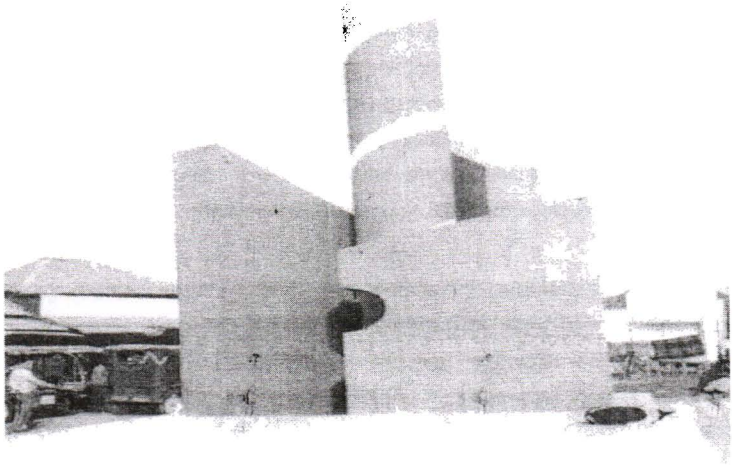

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ফলক : রাজবাড়ী রেলওয়ে গেট শহর

**বালিয়াকান্দি থানা ও কালুখালী দখল**

পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল কালুখালী রেলস্টেশনে। মুজিব বাহিনী ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এই ক্যাম্প আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজাকারদের রেখে আগের রাতে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরের দিন রাজাকারদের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক রাত গুলি বিনিময়ের পর রাজাকার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সমস্ত অস্ত্র চলে আসে।

বালিয়াকান্দি থানায় ছিল পুলিশ ও রাজাকারদের মজবুত ডিফেন্স। এখানে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করার মতো ছিল একটি বাংকার।

নভেম্বরের প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনী যৌথভাবে বালিয়াকান্দি থানা আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর পুলিশ ও রাজাকার বাহিনী ঘাবড়ে যায়। মাত্র ঘণ্টাখানেক গুলি বিনিময়ের পরপরই তারা আত্মসমর্পণ করে।

**বালিয়াকান্দি থানা আক্রমণ**

ডিসেম্বরে মুক্তিযোদ্ধারা বালিয়াকান্দি থানা আক্রমণ করে। চারদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিবর্ষণের ফলে পাকিস্তানি পুলিশ-রাজাকার বাহিনী আতঙ্কে পড়ে যায়। এক পর্যায়ে

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের প্রতি উত্তরে থানা থেকে প্রচুর গুলি ছুঁড়তে থাকে পুলিশ-রাজাকার বাহিনী। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি শেষ হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে শুরু করে কিন্তু না পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে রণকৌশল পরিবর্তন করে থানার নিকটবর্তী নদী পার হয়ে থানার নিকটে এসে সম্মিলিতভাবে গ্রুপ ফায়ার শুরু করে। আর মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা স্লোগানে থানার চারদিক ঘিরে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম গ্রুপ খুবই দ্রুত গতিতে এগুতে থাকলে হঠাৎ মুজিব বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার আ. ওহাব বিহারি পুলিশের গুলিতে আহত হয়। তারপরও দ্রুত বেগে জয় বাংলা স্লোগানে চৌদিক থেকে এগোতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। এর কিছুক্ষণপর বিহারি-পুলিশ, রাজাকার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র, গুলি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা ওড়ানো হয়।

### গোয়ালন্দ ঘাট বিজয়

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। গোয়ালন্দ ঘাট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ও জনতার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৫ ডিসেম্বর গভীর রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ফরিদপুরে দিকে পিছু হটতে থাকে। ফলে বিনা যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধারা গোয়ালন্দ ঘাট নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। ১৬ ডিসেম্বর ভোরে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ফরিদপুর নর্থ চেন্যাল মমিন খাঁর হাট সংলগ্ন বিহারিদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বিহারিদের বন্দি করে বিকেলের দিকে গোয়ালন্দ নিয়ে আসে। এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন কমান্ডার রফিকুল ইসলাম। সকাল ৮-৩০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

১৭ ডিসেম্বর ফরিদপুর চরম যুদ্ধের পর বিহারিদের শোচনীয় পরাজয় হয়। রাজবাড়ীতে বীর মুক্তিযোদ্ধারা চারিদিক থেকে আক্রমণের পর ১৮ ডিসেম্বর পরাজয় হয় বিহারিদের।

### গণহত্যা

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের মতো এ অঞ্চলেও পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। বিশেষ বিশেষ জায়দা নির্বাচন করে নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে নির্মম অত্যাচার শেষে হত্যা করেছে। এসব স্থান বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। পাংশায় মাছপাড়ায় সংঘটিত হয়েছে গণহত্যা।

এ অঞ্চলের ঘুমন্ত মানুষের উপর রাজবাড়ী শহর থেকে কুখ্যাত বিহারি প্রধান বিহারি সৈয়দ খামার-এর নির্দেশে স্পেশাল ট্রেন নিয়ে ভোরের দিকে রওনা হয়। তারা মাছপাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ি লুটপাটের উদ্দেশ্যে মথুরাপুর, কালিনগর রানকোল, বরুলিয়া গ্রাম বেছে নিয়ে হঠাৎ হামলা চালায়। তারা বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পাষণ্ড বিহারিরা একাধারে গুলি চালাতে চালাতে গণগত্যায় মেতে ওঠে। মাছপাড়া, রামকোল, মথুরাপুরের ২৩ জনকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

রামদিয়ায়ও সংগঠিত হয়েছিল গণহত্যা। ১৯৭১ সালের ২৩ মে (বালিয়াকান্দি) রামদিয়া বাজারে বিহারিরা ও পাকিস্তানি বাহিনী যৌথভাবে প্রবেশ করে। সাধারণ মানুষ বুঝে ওঠার পূর্বেই নরপশুরা একাধারে গুলি করতে শুরু করে। এক বিহারি ও পাকিস্তানি সেনা ঠাকুর নওপাড়া (শোল বরাট পাড়া) চলে যায়। রামদিয়া রেল ষ্টেশনে নেমেই আজমত আলী শেখকে গুলি করে, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট লুট শুরু করে। আর এক পর্যায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। লুটতরাজ শেষে বাজার এলাকায় শতাধিক নারী-পুরুষ, শিশু হত্যায় মেতে ওঠে। পাশবিক অত্যাচার, নির্যাতন করে। প্রত্যক্ষ দর্শীদের বর্ণনায় ১৩০ জন গণহত্যার শিকার হয়।

হানাদারদের গণহত্যা শুধু কয়েকটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ কারণে ১৯৭১ সাল ২১ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী গোয়ালন্দ ঘাট দখলে নেওয়ার পর গোটা রাজবাড়ী ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। রাজবাড়ী শহর, খানখানাপুর কল্যাণপুর, কালুখালি, সাংশা প্রভৃতি অঞ্চলে বিহারিরা যাদের রিফুজি বলা হতো তারও হানাদারদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

গোয়ালন্দ থানার শেষ সীমানা চর বালিয়াকান্দি মৌজা রাজবাড়ী সদর থানার শেষ সীমানা। হিন্দু অধ্যুষিত নিবিড় পল্লী অঞ্চল কুঠি পাঁচুরিয়া জমিদার বাড়ি নামে খ্যাত। ১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী, বিহারি, দেশীয় রাজাকার ও দালালরা গ্রাম-গঞ্জে লুটতরাজ শুরু করে। ট্রেন থেকে পাকিস্তানি ও বিহারিরা গুলি ছোড়ে। তারপর রঞ্জন রায়ের বাড়িতে (রাজবাড়ী) প্রবেশ করে। জমিদার বাবুদের আশ্রিত গোয়ালন্দ হাই স্কুলের পণ্ডিত শিক্ষক পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, মৃগেন্দ্রনাথ সাহা ও হরেকৃষ্ণ বৈরাগিসহ ২ জন অজ্ঞাত লোককে গুলি করে হত্যা করে। এক ঘণ্টা ধরে এই গ্রামে লুটপাট চলে। মোট ৫ জনকে হত্যা করা হয়। আবদুল আজিজ ও সোবহান মুন্সির উদ্যোগে এদেরকে কুঠিবাড়ির সংলগ্ন দেয়ালের পাশে সমাহিত করা হয়। শহিদদের গণ সমাধিটি অবহেলায় পড়ে আছে।

**খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা**

এ অঞ্চলের খেতাবপ্রাপ্ত দুইজন মুক্তিযোদ্ধা হলেন : খবিরুজ্জামান, বীর বিক্রম ও অলিক কুমার গুপ্ত, বীর প্রতীক। তিনি নৌ-কমান্ডো আক্রমণে একাত্তরের অক্টোবরের প্রথম দিকে মাদারীপুর জেলার টেকেরহাট যুদ্ধে শহিদ হন। আর অলিক কুমার গুপ্ত ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন বয়রা সাব-সেক্টরে সহকারী অধিনায়ক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

## ঞ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

রাজবাড়ী জেলার কয়েকজন কৃতীসন্তান রয়েছেন যাঁরা বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো। এক্ষেত্রে তথ্য নেওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমির লেখক অভিধান ও চরিতাবিধান থেকে।

www.pathagar.com

**মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী :** মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার পাংশা উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৪ সালে। তিনি সাংবাদিক ও লেখক। তাঁর পিতা এনায়েতুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার (দারোগা)। তিনি খ্যাতনামা গদ্যশিল্পী এয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় ভাই। তিনি পাংশা এম. ই. স্কুলে মাইনর ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। 'কোহিনূর' নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কীর্তি। ১৮৯৮-এ (১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে) এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক ও কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে রওশন আলী চৌধুরীর প্রায় দশ বছর (১৮৯৮-১৯০১, ১৯০৪-১৯০৬, ১৯১১-১৯১২ ও ১৯১৫) যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন। এ সময়কালের মধ্যে কোহিনূরের ৫৯টি সংখ্যা প্রকাশিত। প্রধানত মননশীল প্রবন্ধ ও সৃজনশীল কবিতা ও গল্প এতে প্রকাশিত হতো। বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এর লেখক ছিল। কলকাতা থেকে ইরানি ভাষায় প্রকাশিত 'হাব্‌লুল মতিন' (১৯১২) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা কর্মে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে সহায়তা করেন। 'সোলতান' (নবপর্যায়ে প্রকাশিত, ১৯২৩) নামক সাপ্তাহিকের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীর' (১৯০৮) বার্তা-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সারা জীবন কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে এ দলের প্রতিটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পাংশায় 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' (১৯০৫) গড়ে তুলে স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেরও (১৯২০-১৯২২) একজন সুপরিচিত নেতা। দেশাত্মবোধের জাগরণ ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যই পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা এবং লেখনি পরিচালনা করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

**মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী :** মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্ম. মাগুরাডাঙ্গা গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী, নভেম্বর ১৮৮৮ (১৮ কার্তিক ১২৯৫)। তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁর পিতা পুলিশ অফিসার (দারোগা) এনায়েতুল্লাহ চৌধুরী। পাংশা হাই স্কুল থেকে এম. ই. এবং রাজবাড়ী সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাস করে। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ায় কলেজ ত্যাগ করেন। এ সময়ে তাঁর অগ্রজ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কোহিনুর' (১৮৯৮-১৯০১-১৯০৪-১৯০৬-১৯১১-১৯১২ ও ১৯১৫) সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী রোগাক্রান্ত হলে উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৪-১৯১৫ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার জোরওয়ারগঞ্জ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর রাজবাড়ী সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯২০-১৯২১-এ পাংশা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান ও কারাবারণ। কারামুক্তির পর শিক্ষকতার চাকরি ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় গমন এবং মধ্যম ভ্রাতা আওলাদ আলী চৌধুরীর সঙ্গে সাংবাদিকতায় যোগদান। 'বঙ্গীয় মুসলমান

www.pathagar.com

সাহিত্য সমিতি' (৪ সেপ্টেম্বর ১৯১১) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। এ সমিতির সম্পাদক হিসেবেও কয়েক বছর দায়িত্ব পালন। সমিতির মাসিক পত্র 'সাহিত্যিক' (১৯২৬)-এর যুগ্ম-সম্পাদক। এয়াকুব আলী চৌধুরী ও কবি গোলাম মোস্তফার যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাটি এক বছর চলেছিল (১৯২৬)।

রওশন আলী চৌধুরী ও আওলাদ আলী চৌধুরীর অকালমৃত্যু ঘটায় তাঁদের পরিবারবর্গের দায়িত্ব গ্রহণ। তাঁর শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখময়। শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে ৪৭/৪৮ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। শেষ জীবনের ৪/৫ বছর জীবন্মৃত অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে বাস। মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক মাসিক পঁচিশ টাকা হিসেবে একটি সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর। বাংলা গদ্যের একজন শক্তিশালী শিল্পী। ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতি তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, ভাষার মাধুর্যে ও ভাবের গাম্ভীর্যে তাঁর রচনাবলি বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। চিরকুমার ছিলেন এবং সচ্চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এ বিতর্কে বাংলা ভাষার পক্ষাবলম্বন। সুবক্তা হিসেবেও খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধর্মের কাহিনী (১৯১৪), নূরনবী (১৯১৮), শান্তিধারা (১৯১৯), মানব মুকুট (১৯২২)। তিনি ১৯৪০ সালের ১৫ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

**কাজী আবদুল ওদুদ** : কাজী আবদুল ওদুদ রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে ২৬ এপ্রিল ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ। তাঁর পিতা কাজী সগীরউদ্দীন ছিলেন রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার। ১৯১৩-তে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৫-১৯১৭-তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে আই.এ. ও বি.এ. এবং ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে মাতুল-কন্যা জমিনা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ।

১৯২০-তে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা অধ্যাপক নিযুক্ত। দীর্ঘদিন অধ্যাপনার পর কলকাতায় বদলি এবং সেখানে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের অধীনে টেক্সট বুক্স কমিটির সম্পাদক পদে বৃত। এই পদ থেকেই অবসর গ্রহণ। ১৯৬৫-তে নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'তরুণ পত্র' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি নিযুক্ত। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকল্পে ১৯২৬-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। তিনি ছিলেন সমিতির অন্যতম স্তম্ভ ও নেতা। সাহিত্য সমাজের পত্রিকা 'শিখা'য় (১৯২৭) তাঁর মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লেখার জন্য ঢাকার নওয়াব পরিবার-কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে ঢাকা ত্যাগ ও স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস। রাজা রামমোহন রায়' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি গ্যেটেকে তাঁর জীবন-চেতনার আদর্শরূপে গ্রহণ। তাঁদের জীবনদর্শন ও সাহিত্য কর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অনুশীলন অনুসরণ এবং সেই সঙ্গে বঙ্গের পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে সাত্যিসাধনায় আত্মনিয়োগ।

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম ও তার প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি গভীরত আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস-নদীবক্ষে (১৯১৮); গল্প-মীর পরিবার (১৯১৮); গদ্য রচনা-রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (১৩৩৪), হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৯৩৬) কবিগুরু গ্যেটে (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং উভয় খণ্ড প্রকাশিত, ১৯৪৬), Tagore's Role in the Reconstruction of Indian Thought (১৯৬১), সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪), শ্বাশত বঙ্গ (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড, ১৩৬৯, ২য় খণ্ড, ১৩৭৬), নজরুল প্রতিভা (১৯৪৯)। ১৯৫৬-তে বিশ্বভারতী-তে প্রদত্ত বক্তৃতাবলি 'বাঙালার জাগরণ' নামে গ্রন্থিত হয়ে প্রকাশিত হয় ঐ বছরেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ১৯৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'শরৎচন্দ্র ও তারপর' ১৯৬১-তে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। জীবনের শেষপর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ 'মোহাম্মদ ও ইসলাম' (১৯৬৬) এবং পবিত্র কোরানের প্রাঞ্জল ও সুললিত বঙ্গানুবাদ। তাঁর সম্পাদিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' একখানি জনপ্রিয় বাংলা অভিধান। বিশ দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একজন সজাগ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও লেখক হিসেবে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় রেখেছিলেন। তাঁর গদ্যরচনা প্রাঞ্জল ও বিশেষণধর্মী। মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার ছাপ তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় বিদ্যমান। ন্যায়নিষ্ঠা, উদার ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য খ্যাত। তাঁর মৃত্যু ১৯ মে কলকাতায় ১৯৭০ সালে।

**কাজী মোতাহার হোসেন** (১৮৯৭-১৯৮১) : কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম মাতুলালয়, লক্ষ্মীপুর গ্রাম, কুমারখালী-কুষ্টিয়া, ৩০ জুলাই ১৮৯৭ সালে। পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর ফরিদপুরের বর্তমান রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। তিনি সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী। সেটেলমেন্টের আমিন কাজী গওহরউদ্দীন আহমদ তাঁর পিতা। কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯১৫), রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই, এসসি. (১৯১৭), ঢাকা কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ. (১৯১৯) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এ. (১৯২১) পাস। মেট্রিক পরীক্ষায় ১৫ টাকা, আই.এসসি. পরীক্ষায় ২০ টাকা ও বি.এ. পরীক্ষায় ৩০ টাকা করে মাসিক বৃত্তি লাভ। এম.এ. পড়ার সময়ে কলকাতার তালতলা নিবাসী মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমানের কন্যা সাজেদা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৯২১)। এম.এ. দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ডেমোনস্ট্রেটর নিযুক্ত (১৯২১)। ১৯২৩-এ সহকারী প্রভাষক পদ লাভ। ১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে এম.এ. পাস। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে 'গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগ' গঠিত হলে এর প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৫০-এ পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠি হলে এর রিডার ও বিভাগীয় প্রধানের পদ অলংকৃত। 'ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্টস' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৫০)। এ অভিসন্দর্ভে

www.pathagar.com

তৎকর্তৃক গবেষণা কর্মে এক নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন, যা 'Hussasn's Chain Rule' নামে অভিহিত। ১৯৫৩-তে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৬১-তে নিয়মিত অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর পরিসখ্যান বিভাগের 'সুপারনিউমারারি' অধ্যাপক পদে বৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব স্টাটিসটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর পরিচালক (১৯৬৪-১৯৬৬)। ১৯৬৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এমেরিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্তি দান। সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী হিসেবে খ্যাত। কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আবুল হুসেন প্রমুখের সঙ্গে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) প্রতিষ্ঠা। এর মুখপাত্র 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সম্পাদক। সাহিত্য সমাজের নেতৃত্বে পরিচালিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা। তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনায় সুস্থ মনন ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধের ঋজু পরিচয় উৎকীর্ণ। 'সঞ্চয়ন' (১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের সংকলন। 'নজরুল কাব্য পরিচিত' (১৯৫৫), 'সেই পথ লক্ষ্য করে' (১৯৫৮), 'সিম্পোজিয়াম' (১৯৬৫), 'গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস' (১৯৭০), 'আলোক বিজ্ঞান' (১৯৭৪) তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। অসাম্প্রাদায়িক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী এবং সেই আলোকে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত গড়ে তোলার জন্য লেখনি পরিচালনা। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদান ও শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালুর দাবিতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার একজন দৃঢ় পৃষ্ঠপোষক। বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে এ-সকল আন্দোলনে গতিদান। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তারও একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি-সংস্কৃতি খর্ব করার জন্য রেডিও-টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন (১৯৬৭)। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতার মুখে ঢাকায় রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী (১৯৬১) পালনে সাহসী ভূমিকা পালন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবা খেলোয়াড়। প্রবন্ধসাহিত্যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৬৬)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ (১৯৭৪)। 'জাতীয় অধ্যাপক' মর্যাদায় ভূষিত (১৯৭৫)। মৃত্যু ঢাকা, ৯ অক্টোবর ১৯৮১।

**রোকনুজ্জামান খান, দাদাভাই :** রোকনুজ্জামান খান, দাদাভাই-এর জন্ম, পাংশা, রাজবাড়ী, ৯ এপ্রিল ১৯২৫। তিনি ছিলেন সাংবাদিক, সংগঠক, শিশুসাহিত্যিক। তাঁর পিতা মোখাইরউদ্দিন খান। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। ১৯৪৮-এ আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার 'মিতালী মজলিস' নামের শিশুতোষ পৃষ্ঠা সম্পাদনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। এরপর 'শিশু সওগাত' পত্রিকায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫২-এ দৈনিক মিল্লাতের 'কিশোর দুনিয়া'র শিশু বিভাগের

www.pathagar.com

পরিচালক। ১৯৫৫-এ দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় তরুণ সাংবাদিক হিসেবে যোগদান এবং 'কচিকাঁচার আসর' বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত। আসরের পরিচালক হিসেবে নামকরণ হয় 'দাদাভাই'। ১৯৫৬-এ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিশু-কিশোর সংগঠন 'কচিকাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'হাট্টিমাটিম টিম', 'খোকন খোকন ডাক পাড়ি', 'আজব হলেও গুজব নয়' প্রভৃতি। সম্পাদনা : 'আমার প্রথম লেখা', 'ঝিকিমিকি', 'বার্ষিক কচি ও কাঁচা', 'ছোটদের আবৃত্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ। পুরস্কার : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৮), বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পুরস্কার (১৯৯৪), একুশে পদক ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (২০০০)। মৃত্যু ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

**সন্‌জীদা খাতুন :** বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও প্রসারে সন্‌জীদা খাতুনের ব্যপক ও বিস্তৃত দায়িত্বশীল ভূমিকা আছে। সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। লেখক ও গবেষক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। তাঁর পৈতৃক নিবাস রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বাহাদুর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর (কাজীপাড়া) গ্রাম। পিতা জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, মাতা সাজেদা খাতুনের গর্বিত সন্তান বরেণ্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অধ্যাপক ড. সন্‌জীদা খাতুন।

**ফাহমিদা খাতুন :** কাজী মোতাহার হোসেনের কন্যা জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ফাহমিদা খাতুন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ অবদান রাখেন।

কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী মোতাহার হোসেন

www.pathagar.com

রোকনুজ্জামান খান, দাদাভাই

সন্‌জীদা খাতুন

**কাজী আনোয়ার হোসেন :** কাজী মোতাহার হোসেনের পুত্র কাজী আনোয়ার হোসেন। এদেশে গোয়েন্দা কাহিনির রচনার পথিকৃত। মাসুদ রানা সিরিজ রচনায় তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

**চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাশেম :** বাঙালি মুসলমানের চিত্রকলার চর্চা ও বিকাশে কাজী আবুল কাশেম (১৯১৩-২০০৪) পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি 'দোপেঁয়াজা' নামে ছবি আঁকতেন। তাঁর দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষের চিত্র খুবই বিখ্যাত। তিনি 'সওগাত' পত্রিকায় কার্টুনের মাধ্যমে পরিচিতি পান। তাঁর বাড়ি রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার পারকুল গ্রামে।

**চিত্রশিল্পী রশিদ চৌধুরী :** রশিদ চৌধুরী (১৯৩২-১৯৮৬) রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার রতনদিয়া ইউনিয়নের রতনদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি চিত্রকলার শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিল্পী। বাংলাদেশে তিনি ট্যাপিস্ট্রি শিল্প মাধ্যমের প্রবর্তক। লোকসংস্কৃতি ও লোকগাঁথা তাঁর চিত্রকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে। দেশজ উপকরণে ট্যাপিস্ট্রি (তাপিশ্রী) তৈরির তিনি বাংলার হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন।

**চিত্রশিল্পী মনসুর উল করিম :** মনসুর উল করিম (১৯৫০-) রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি চিত্রকলার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন। দেশে ও বিদেশে তার চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

পুরস্কার পেয়েছেন। ৬ষ্ঠ এশিয়ান দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে পেয়েছেন গ্রান্ড অ্যাওয়ার্ড। চিত্রকলায় একুশে পদক পান। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

**ডা. আবুল হোসেন :** রাজবাড়ী জেলার একজন মানুষ তাঁর সমাজকর্মের জন্য এলাকায় কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হয়েছেন। অতি সরল সহজ, ধার্মিক ডা. আবুল হোসেন ষাটের দশকে এমবিবিএস পাস করে এলাকায় ডাক্তারি আরম্ভ করেন। উলেখ্য তিনি ভবদিয়া গ্রামে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক আলহাজ আব্দুল করিম মোল্লার একমাত্র সন্তান। সে সময় এলাকায় কলেরা, বসন্ত, দুর্ভিক্ষ অনাহারে জর্জরিত মানুষের দুঃখ দুর্দশা তার মনে রেখাপাত করে। ভাবেন এ সব মানুষের জন্য কিছু করা দরকার। কিন্তু তার জন্য চাই প্রচুর অর্থ। তিনি একদিন স্ত্রীসহ সুদূর ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। উদ্দেশ্য অনেক অর্থ উপার্জন। দীর্ঘ ৩০ বৎসর তিনি ও তার স্ত্রী কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর অর্থ জমান। এরপর তিনি এলাকার মানুষের উন্নয়নে সে অর্থ ব্যয় করার প্রয়াসী হন। তিনি ইতোমধ্যে ডা. আবুল হোসেন কলেজ, নিজ গ্রামে এতিমখানা, ভবদিয়া আব্দুল করিম এফতেদারী মাদ্রাসা, আলহাজ আব্দুল করিম একাডেমী, আব্দুল করিম মাদ্রাসা, আব্দুল করিম একাডেমীতে শহীদ মিনার স্পাপন করেছেন। এছাড়াও ডা. আবুল হোসেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য করেন।

## ট. বিখ্যাত গায়ক. শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা বর্তমান রাজবাড়ী জেলার শিল্পীদের অবদান আছে। এরা কেবল স্থানীয়ভাবেই জনপ্রিয় নয় সারাদেশেই তাদের খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে। রাজবাড়ী জেলার স্থানীয় পর্যায়ের কয়েকজন গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালসহ জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিমান অনেক শিল্পী রয়েছেন। নিম্নে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

**আক্কাছ আলী বয়াতি :** তিনি রাজবাড়ী জেলা সদরের ধুঞ্চি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত মুর্শিদী ও মারফতি গানের বিখ্যাত শিল্পী।

**অসীম দাস বাউল :** তিনি রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার রতনদিয়া ইউনিয়নের গঙ্গানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাউল সংগীত রচনা পরিবেশনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

**কাঙ্গালিনী সুফিয়া :** কাঙ্গালিনী সুফিয়া রাজবাড়ী জেলার বহরপুর ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করায় জীবন, গান ও জীবিকার তাগিদে তাকে বারংবার স্থানান্তরিত হতে হয়েছে। তিনি বাউল গানের সুপরিচিত শিল্পী। জীবনের অনেকটা সময় ঢাকার অদূরে সাভারে থাকে। টেলিভিশনে গান ও বিজ্ঞাপনচিত্রে অংশ নিয়ে সারাদেশে জনপ্রিয় হন।

www.pathagar.com

কাঙ্গালিনী সুফিয়া

**বামন দাস গুহ রায় :** বামন দাস গুহ রায় জলতরঙ্গ বাদক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। চারের দশকে তার জলতরঙ্গ আকাশবাণী কলকাতা ও দিল্লি থেকে প্রচার করা হতো। তাঁর জলতরঙ্গ গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়। কেবল জল তরঙ্গ বাদক হিসেবেই নয় রাজবাড়ীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সমৃদ্ধি ও বিকাশে তাঁর অবদান তুলনারহিত। তাঁর বাড়ি ছিল রাজবাড়ী শহরে।

রাজবাড়ী জেলার লোকসংগীত শিল্পীদের মধ্যে পরিচিত শিল্পীরা হলেন শেখম আলী, ইসমাইল সরকার, মাতাম শাহ, মেঘু বয়াতি, আব্দুর রহিম বয়াতি, রহমত আলী বয়াতি, রবীন্দ্রনাথ সরকার, মীর হাসমত আলী, দেবেন ক্ষ্যাপা।

www.pathagar.com

# লোকসাহিত্য

## ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা

গ্রামের সাধারণ মানুষের অবসরে গল্প বলার ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের। নারী ও পুরুষ উভয়েই পারদর্শী এক্ষেত্রে। অনেক সময় এমন কিছু গল্প বলা হয় যা খুবই প্রাসঙ্গিক। সাধারণত গ্রাম্য শালিস বিচার ইত্যাদিতে এসব শ্লোক কাহিনি বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন বয়স্ক লোক হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বলছে--

"ওরে দিন গেইল্যা,
এক আটি চিন্যা নিয়্যা চিত অয়া পইল্যা"
তখন আরেক জন তাকে বিদ্রূপ করে বলছে
'তুমি কবেই বা কি ছিল্যা।'

### ১. চিকন্যা জনের চিকন্যা ধর গবদা জনের দুইজন ধর

তিন ভাই ঢোল বাজায় আর গান গায়। একদিন ঢোল বাজায়া বাড়ি ফিরার সুমায় রাত্তির বেলা পথের মধ্যি ডাহাইতি ধইরলো। ডাহাইতরা ছিল দুইজন। একজন মোটা সোটা স্বাস্থ্যবান, আরাক জন চিকন চাকন। ওরা তিন ভাই ডাহাইত দেইহ্যা ভয় পাইলো। ঢোলওয়ালা এক ভাই চিন্তা কইরলো যে, এত কাল ঢোল বাজালাম, দেহি ঢোল আমার কোন বুদ্ধি দেয় নাকি।

চিন্তা কইর‍্যা ঢোলওয়ালা কইলো,"ডাহাইত ভাই, তোমরা তো আমাগার মাইর‍্যা ফ্যালাবার চাও তয় তার আগে আমরা একটু ঢোল বাজায়া নেই। ডাহাইতরা কয়, 'ঠিক আছে বাজাও ঢোল।' ঢোল বাজাব্যার নাইগলো। ঢোলওয়ালা বুইঝলো যে, ঢোলে কইত্যাছে,'চিকন্যা জনের চিকন্যা ধর,গবদা জনের দুইজন ধর।' তার মানে চিকন ডাকাইতকে একজন আর মোটা ডাকাইতকে দুইজন ধইর‍্যা কাবু কইর‍্যা ফ্যালাইলো। ঢোলওয়ালা তিন ভাই উদ্ধার পাইলো।

**শব্দার্থ** : ডাহাইতি-ডাকাত, দেইহ্যা-দেখে, আমাগার-আমাদের, ফ্যালাবার-ফেলতে, ইট্টু-একটু, চিকন্যা-চিকন, গবদা-মোটা।

### ২. জারে নোহা কোঁহো

এক লোক বশ্যি দ্যা মাছ ধইরত্যাছে। দুই দানব তর্ক বাধাইছে। একজন কয়, 'ওডা অইলো বশ্যি।' আরাকজন কয়, 'ওডার নাম ঠশ্যি।' বশ্যি আর ঠশ্যি নিয়্যা দুই দানব ঝগড়া নাগাইছে। মাছধরাওয়ালা দূর থ্যা দেইখত্যাছে যে, বশ্যি নিয়্যা দুই দানব ঝগড়া

www.pathagar.com

নাগাইছে। দানব দুইজন বশ্যিওয়ালার কাছে বিচার দিল। এক দানব কয় বশ্যি, এক দানব কয় ঠশ্যি। মাছধরাওয়ালা চিন্তা কইরলো, যদি আমি আসল নাম কয়া দেই। মানে, যদি কই ইডার আসল নাম বশ্যি তাহলে আমার আর নিস্তার নাই। ত হোন মাছ ধরাওয়ালা কইলো, "হোনো ভাই দানবরা, তোমরা বশ্যি আর ঠশ্যি যাই কও, ইডার নাম কোনো ডাই ন্যা। ইডা বশ্যিও না ঠশ্যিও না, ইডার নাম হই 'জারে নোহা কোঁহো।' দুই দানব আর ঝগড়া কইরলো না।

**শব্দার্থ :** বশ্যি-বড়শি, ওডা-ওটা, দূরথ্যা-দূর থেকে, ইডা-এটা, হোনো-শোন।

### ৩. যত কষে ততো ঘষে

এক বাওন চত্তির মাইস্যা রোদির মোদি রাস্তা দ্যা যাইতেছে। যাতি যাতি রাস্তায় এক মোটা আম গাছে ছেহায় বইসলো জির‍্যাব্যার জন্যি। গাছে এ্যালান দ্যা বইস্যা ঘোম আইস্যা গেল। এক দাঁড়াইস সাপ আইস্যা বাওনেরে গাছের হাতে প্যাঁচ দ্যা আটকাইতে। বাওন চ্যাতোন অয়া দ্যাহে দাঁড়াইস সাপ গাছের হাতে তারে প্যাঁচ দ্যা ধইরছে। বাওন কইরলো কি সাপের মাথা ডাইন আত দ্যা মুঠ কইর‍্যা ধইরলে সাপ তো বাওনেরে গাছের হাতে কইষপ্যার নাইগলো। আর বাওন সাপের মাথা ধইর‍্যা গাছের হাতে ঘইষপ্যার নাইগলো। এইভাবে সাপ বাওনেরে গাছের হাতে ততো ঘষে। এইভাবে যত কষে ততো কষে। যত কষে, ততো ঘষে। হ্যাসম্যাস সাপ বাওনেরে ছাইড়্যা দিল বাওন উইট্ট্যা পুইট্ট্যা দে দৌড়।

**শব্দার্থ :** বাওন-ব্রাহ্মণ, চত্তির-চৈত্র, যাতি যাতি-যেতে যেতে, ছোহা-ছায়া, এ্যালান-হেলান, দাড়াইস-দাড়াস সাপ, হাতে-সাথে, আত-হাত, নাইগলো-লাগলো, হ্যাসম্যাস-শেষমেস, উইট্ট্যা পুইট্ট্যা-উঠেপড়ে।

### ৪. ও দিক ত্যা আইল্যা কিছু হুইনল্যা টুইনল্যা না?

এক জোলা কাপড় বানানের জন্যি 'তাসন' কইরত্যাছে। তাসন করা মানে হুইত্যার সাথে ফ্যান দিত্যাছে। পাশের বাড়ির এক বাছুর আইস্যা বেবাকখানি ফ্যান খায়া ফেলাইলো। জোলা ফির‍্যা চায়া দ্যাহে খাদার মদি ইটুউ ফ্যান নাই। মেজাজ গেল খারাপ অয়া। রাগের চোটে মুগুর দ্যা বারি দ্যা বাছুরির মাথা ফাটায়া ফ্যালাইলো। বাছুর গেল মইর‍্যা। জোলা অইলো ভীতু মানুষ। ভয়তে তার দফা হারা। খালি এদিক ওদিক চায়। আর পথবারি পথবারি করে। ওহোন দ্যা লোক আসার আগেই পাশের খ্যাবের মাচার নিচি নিয়া মরা বাছুর থুইয়্যা দিল। একজন মানুষ আসে, আর জোলা হোইচ করে "ভাই ও দিক ত্যা আইল্যা, কিছু হুইনল্যা টুইনল্যা না"। লোকটা জোলোর ব্যাপার তো আর বোঝে না। কয়, "না তো ভাই কিছু তো হুনি নাই। ক্যা কি অইছে।" জোলা কয়, "না কিছুই অয় নাই তুমি যাও।" এই রহম যে যায় তার কাছেই হোইচ করে। কেওই তার কতা বোঝে না। এক লোক ছিল খুব ট্যাটোন। জোলা কইলো "এ্যাঁ

www.pathagar.com

ভাই, ও ওদিক ত্যা আইল্যা কিছু হুইনল্যা টুইনল্যা না?" ট্যাটোন লোকটা জোলার চোহি মুহির দিক চায়া ঠিক পায় যে, জোলা কি যিনি কইরছে। লোকটা কয়, "হুনলামই তো ক্যা কি অইছে, কি কইরছ্যাও?" জোলা আরও ভয় পায়া কইলো, "কি হুইনছ্যাও ভাই?" ট্যাটোন ধাপকি দিয়্যা কইলো" কোহনে কি কইরছ্যাও?" জোলা কইলো, "ফ্যান খাইলো তয় তুমি ওতা কইরল্যা ক্যা।" জোলা কয় "আমার আর ইয়্যা ছাড়া উপ্যায় ছিলো না ভাই রাগের চোটে মুগুর দ্যা বারি দিলাম আর মইর‍্যা গেল।" ট্যাটোন লোকটা আন্দাজ কইরলো যে নিশ্চয়ই জোলা খুন টুন কইরছে। আবার ধাপকি দ্যা কইলো, "তয় কোহনে থুইছ্যাও।" জোলা ভয়তে ভয়তে কইলো, "খ্যারের মাচার তলে।" ট্যাটোন আইগ্যায়া যায়া দ্যাহে যে বাছুর এ্যাটা মাইর‍্যা থুইছে। জোলার বোকামি জান্যি নিজেই ধরা খাইলো।

**শব্দার্থ :** জান্যি-জন্যে, তাসন-কাপড়ে মাড় দেওয়া, হুইত্যা-শোয়া, ফ্যান-ভাতের মাড়, খাদা-মালসা, সানকি, ইটুউ-একটুও, বারি-আঘাত, দফাহারা-দফাসারা, পথবারিপথবারি-পায়চারি, খ্যার-খড়কুটো/এইরকম-এরকম, হোইচ-জিজ্ঞাসা, ট্যাটোন-চালাক, চোহিমুহি-চোখেমুখে, ধাপকি-ধমক, ইয়্যা-ইহা, কোহনে-কোথায়,এ্যাটা-একটা।

## ৫. যেমন জোলার চাঙ তেমন জোলার গাঙ

এক জোলা খুব ট্যাটোন। তার বাড়ির কাছদ চোর ঘোরাঘুরি করে। জোলাও চোর ধরার জন্যি চিষ্টা করে জোলার ঘরে কোন চাং ছিল না। রাতির বেলা জোলা ঘরের এক কোনায় চোহির পর হুইয়্যা রইছে। চোর ঘরের পাশে সুইন্ধ্যা বেলায় আইন্যা চুপ কইর‍্যা খাড়ায়া রইছে। জোলা ঠিক পায়া এ্যলহা এ্যলহাই কইত্যাছে, "আইজ ঘরে নতুন পাটখড়ির চাং দিলাম। বেশি এ্যটা ভালো অইলো না। আল্লা তয় ইটু ঘোম পাড়ি।" চোর ম্যালা রাত্তিরি আইস্যা ঘরের উপ্যারে উইঠ্যা ঘরের চালা কাইট্যা ঘরের কাওনা ধইর‍্যা ঝুলুন দিয়্যা চাঙের পর নাইমব্যার চাইলো। কিন্তুক ঝুলুন দিয়্যা চাঙ নাগুল পাইলো না মনে কইরলো যে চাঙ বুঝি অল্প ইটু নিচি। তাই বাওনা ছাইড়্যা দিল। ছাইড়্যা দুয়ার সাথে সাথে ঢিব্বিস কইর‍্যা চোহির পর হুইয়্যা থাহা জোলার ঘাড়ের পর পইলো জোলা চোর চোর কয়া দিল দাবাড়। চোর দরজা খুইল্যা দিল দৌড়। জোলা পাছ পাছ দৌড়। জোছনা রাইত। সামনে ছোন ক্ষেত। ছোনের ফুল ফুইট্যা রইছে ধলা গাঙের পানির মতো দেহা যাইত্যাছে। জোলা পাছে থ্যা কইত্যাছে "ওই শালা, চোর সামনে কইল গাঙ ডুইব্যা মরবি কইল।" চোর মনে কইরলো গাঙে ঝাঁপ দ্যা ওপার চইল্যা যাবো আর ধরে কিডা? চোর জোরে লাফ দিয়্যা উপুড় অয়া ঝাঁপ দ্যা পইলো ছোন ক্ষেতের কাঁটা বিধলো বুহির মদি। তহোন মনে মনে কয়া উইঠলো" যেমন জোলার চাঙ তেমন জোলার গাঙ।" জোলা চোরটা ধইর‍্যা ফ্যালাইলো।

**শব্দার্থ :** চাং-সিলিং,চোহি-চৌকি,এ্যলহা-একলা,চালা-ঘরের মটকা,বাওনা-ঘরের চালের মোটাবাঁশ, নাইমব্যার-নামতে, কইল-বলল, বুহির মদি-বুকের মধ্যে।

www.pathagar.com

## খ. কিংবদন্তি

### ১. টাকার মাইট

রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলায় টাকার মাইটের গল্পকাহিনি শোনা যায়। শোনা যায় যে আগে গ্রামের ধনী মানুষের বড় বড় পুকুর ছিল। তারা কাঁচা টাকা কোলায় ভরে কোলায় শিকল দিয়ে গোপনে পুকুরে ডুবিয়ে রাখত। এসব টাকার কোলাকে স্থানীয় ভাষায় মাইট বলা হয়। কিছু দিন পানিতে থাকার পর টাকার মাইটটি ৭টি মাইটে পরিণত হতো এবং পুকুরে ভুর ভুর করে কখনও কখনও ভেসে উঠত। আবার অনেক ধনী টাকার মাইট ঘরের মাটির নিচে রেখে দিত এবং সেগুলো এক সময় পুকুরে ঐ সকল মাইটের সাথে মিশে যেত। এসব টাকার মাইট আবার অনেককে স্বপ্নে দেখা দিত। স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলত আমি অমুক পুকুরের চালায় ওঠে বসে থাকব। তুই শনি অথবা মঙ্গলবার এমন একটা দিন নিশি রাতে আমাকে নিয়ে যাবি। এরকম স্বপ্ন দেখে যারা সাহস করে মাইট নিয়ে আসত তারা ধনী হয়ে যেত। এখনও এলাকায় ধনী ব্যক্তিদের প্রতি নিরক্ষর মানুষ উক্তি করে সে টাকার মাইট পেয়েছে। আবার অনেকে বলে পুকুর কাটার সময় সে পুকুরে টাকার মাইট পেয়েছে। এরূপ ঘটনা শোলবাড়িয়া গ্রামে সোহরাব মণ্ডলের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে।

### ২. পাংশায় মালু ভাগ্যবানের পুকুর

পাংশা উপজেলা সদরে মালু ভাগ্যবানের পুকুর নামে ১৭/১৮ পাখি (১ পাখি= ২২/২৬ শতাংশ) জমি নিয়ে বিরাট পুকুর আছে। স্থানীয় লোকে একে মালু ভাগ্যবানের পুকুর বলে। মালুভাগ্যবানের পুকুরকে নিয়ে একটি কাহিনি এলাকায় বিশেষভাবে প্রচলিত। কথিত আছে মালু নামে একজন মানুষের বহু সহায় সম্পত্তি ছিল এবং সে ছিল প্রভাবশালী। লোকে তাকে মালু ভাগ্যবান বলে জানত। একবার সে এক মামলায় জড়িয়ে পড়ে। প্রভাবশালী মালু কোন কিছুতেই হারতে রাজি নয়। তা তার সহায় সম্পত্তি দিয়েই হোক আর জীবন দিয়েই হোক। মামলাটি মান সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মামলার শেষ বিচার বা রায়ের দিন কোর্টে যাওয়ার সময় সে পুকুরের ঘাটে বড় একটি নৌকা রাখে এবং পরিবারের সবাইকে বলে মালু যদি মামলায় হেরে যায় তাহলে সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে পরিবারের সকলে যেন নৌকায় ওঠে মাঝ পুকুরে আত্মবিসর্জন দেয়। এদিকে মালু দুটি কবুতর সাথে নেয় এবং সকলকে বলে যদি কবুতর দুটি তোমাদের নিকট ফিরে আসে তাহলে বুঝবা আমি মামলায় হেরে গেছি আর তখন তোমরা নৌকায় উঠে আত্মবিসর্জন দেবে। মালু এ কথা বলে কোর্টে চলে যায়। বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কবুতর দুটি ফিরে আসে। কবুতর দেখে পরিবারের সকলে নৌকায় ওঠে মাঝ পুকুরে আত্মবিসর্জন দেয়। আসলে মালু মামলায় জিতে যায় কিন্তু কে বা কারা কৌশলে মামলার রায়ের পূর্বে কবুতর দুটি ছেড়ে দেয়। মামলার রায় শোনার পর মালু জানতে পারে তার কবুতর দুটি ছাড়া পেয়ে বাড়ি চলে গেছে। মালু ভাবে এতক্ষণ যা হবার তা হয়ে গেছে। সে বাড়িতে ফিরে দেখে কেউ আর জীবিত নেই। শেষে মালু নিজেও পুকুরে ডুবে মারা যায়। সে থেকেই পুকুরটি মালু ভাগ্যবানের পুকুর।

www.pathagar.com

এর পরের আর একটি ঘটনা যা লেখক নিজে দেখেছেন। সেটা ১৯৬৫/৬৬ সালের কথা। মালু ভাগ্যবানের পুকুরে মাছ ধরার সময় মাঝ পুকুরে জাল আটকে যায়। অনেক চেষ্টার পরও জাল ছাড়াতে না পেরে জেলে পুকুরের অগাধ পানিতে ডুব দেয়। জেলে দেখতে পায় নিচে রেল ইঞ্জিনের মতো দেখতে এমন একটি জিনিসের সাথে জালটি আটকে আছে। জেলের কাছে এ কথা জানার পর তা এলাকায় মুখে মুখে ফিরতে থাকে। লোকে ভাবে পুকুরটি অলৌকিক শক্তি ধারণ করে আছে। মানুষ রোগ, বালাই, মছিবত হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুকুরের পানি সংগ্রহ করে দাওয়াই হিসেবে খেতে থাকে। এর জন্য পুকুরে ১ কেজি লবণ এবং আট আনা পয়সা দিতে হয়। বিষয়টি সমস্ত রাজবাড়ি জেলাসহ আশে পাশের জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষের সমাগম হতে থাকে মালু ভাগ্যবানের পুকুরকে কেন্দ্র করে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে রেল কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে দুইদিন বিশেষ ব্যবস্থা করে। এ অবস্থা প্রায় ৬/৭ মাস চলছিল।

### ৩. বানিবহে পুস্কুলাগা

রাজবাড়ী সদর উপজেলায় বানিবহ একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রায় ২৫০/৩০০ বৎসর পূর্বে বানিবহে একটি উন্নত জনপদ গড়ে উঠেছিল। গ্রামটি কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত যেমন বিদ্যাবাগীশ পাড়া, আচার্য পাড়া, সরখেল পাড়া, সেনহাটি পাড়া, নুনে পাড়া, পচা পাড়া নামে বানিবহ ছিল সাতশত ঘর রাঢ়ী-ব্রাহ্মণ, দুশ ঘর বৈদ্য আর অন্যান্য আড়াইশ ঘর। গ্রামটি এরকম জনবসতিপূর্ণ ছিল যে কারো কোন বহিরাঙ্গন এমনকি বারান্দাও ছিল না। এ গ্রামে ১২৩৩ বঙ্গাব্দে এক মহামারীতে গ্রামের প্রায় ৮০ ভাগ লোক মারা যায় এবং জীবিতরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এ ঘটনাকে নিয়ে এলাকায় একটি লোকসংস্কার গড়ে ওঠে। কথিত সংস্কারটি হল বানিবহে পুস্কুলাগা। লোকে বলে বানিবহে হঠাৎ একদিন রাতে পুস্কু নামে এক অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। কথিত আছে পুস্কু এক প্রকার মহামারী রোগের আবির্ভাব ঘটায় এবং এক রাতে সকল মানুষকে মেরে ফেলে। এসব মানুষ মরে গেলে পুস্কু তাদের দেহে ভর করে ঐ সকল মানুষের দেহধারী হয় এবং অলৌকিক আচরণ করতে থাকে। গ্রামের দূরের আত্মীয়রা এক রাতে কোন ঘটনাই জানত না। তাদের মধ্যে সকালে দু-একজন আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে আসলে পুস্কুলাগা লোকটি হাত লম্বা করতে করতে উঠান থেকে পিঁড়ি এনে দেয়, অন্য ঘর থেকে খাবার এনে দেয়। কথা বলার সময় দেখা যায় পুস্কুলাগা লোকটির হা দিয়ে আগুন বের হয়। হাঁটার সময় দেখা যায় ১০/১২ হাত দূরে দূরে পা ফেলেছে। বলাবাহুল্য এ গ্রামের পাশ দিয়ে মানুষ যাতায়াত করত না। বানিবহ অনেকদিন বিরান ভূমিতে পরিণত ছিল।

### ৪. চাঁদ সওদাগরের ঢিবি

মঙ্গল কাব্যের নায়ক চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগর ছিলেন উত্তরবঙ্গের সওদাগর। বগুড়ার করতোয়া, কালিদহের স্মৃতি আজও চাঁদ সওদাগরকে স্মরণ করায়। রাজবাড়ির

www.pathagar.com

অদূরে বেলগাছী ভবানীপুরে হড়াই নদীর একটি স্থানকে এলাকার মানুষ চাঁদ সওদাগরের ঢিবি বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। বিষয়টি বাংলা পিডিয়া ও রাজবাড়ী জেলার ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এলাকার মানুষ মুখে মুখে ছড়া কাটে–

সব নদী খান খান
হড়াই নদী সাবধান।

জানা যায় চাঁদ সওদাগর মালয়, শ্যাম দেশে সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজিয়ে এ পথে বাণিজ্য করতে যেতেন। তৎকালীন হড়াই নদী ছিল খুবই খরস্রোতা এবং এই নদীর বাঁকে তার কয়েকটি নৌকা ডুবে যায়। লোকমুখে জানা যায় মাটির নিচে চাপা পড়া সে সব ডিঙ্গার মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখা যেত এমন স্থানটিকে মানুষ চাঁদ সওদাগরের ঢিবি বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। এ ঢিবিটি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।

**৫. সেকারায় শাহ পাহলোয়ানের পূর্ব পশ্চিম মাজার**

ইতিহাসখ্যাত শাহ পাহলোয়ান ষোড়শ শতকে সুদূর আফগানিস্তান থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তিনি চন্দনা নদীর তীরে সেকাড়া গ্রামে আস্তানা গড়ে তোলেন। কিংবদন্তিতে রয়েছে তার ইচ্ছা মতো পূর্ব পশ্চিম কবর না দেওয়ায় রাতারাতি উত্তর দক্ষিণ কবরটি ঘুরে পূর্ব পশ্চিম হয়ে যায়। মাজারটি অনুরূপ অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ্য তিনি মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ব পুরুষ।

## গ. লোকছড়া

**খেলার ছড়া :** বৌছি খেলার সময় বিভিন্ন ছড়ার মাধ্যমে দম দেওয়া হয়। বৌছি খেলার পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। একজন বৌ-এর ভূমিকায় থাকে। বৌ এক কোট থেকে অন্য কোটে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে অন্য কোটে যাবে। বৌ এর পক্ষ থেকে একজন দম দিয়ে অন্য দলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চার পাঁচজন সবাইকে দম দেয়ার মাধ্যমে ছোঁয়ার উদ্দেশে তাড়া করবে এই ফাঁকে বৌ অন্য কোটে যাওয়া চেষ্টা করবে। এই খেলার দম এই অঞ্চলে হা-ডু-ডু খেলায়ও প্রচলিত। হাডু-ডু খেলায় ৬/৭ মিটার লম্বা ও ৩/৪ মিটার প্রস্থ কোট থাকে।

উভয় কোটে ৬/৭ জন করে খেলোয়াড় থাকে। একজন দম দিয়ে অন্য কোটের খেলোয়াড় ছুঁয়ে মারার চেষ্টা করে। সংশ্লিষ্ট কোটের খেলোয়াড়গণ তাকে ধরে রেখে দিতে পারলে সে মরা হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে খেলার কিছু সংগৃহীত ছড়া প্রকাশ করা হলো :

**সংগৃহীত খেলার ছড়া**

১.
টিক টিক টিয়ারা
কিরে ভাই মিয়ারা
গাছে উঠছ্যাস কিসির ডরে
বাঘের ডরে বাঘের ডরে
বাঘ কো
মাটির তলে

www.pathagar.com

মাটি কো
ওইত্তো
তোরা কয় ভাই
৭ ভাই
আমার এক ভাই দেস না
ছুঁইতে পারলে নেস না
নেস না নেস না নেস না.....

২.
ছি কুত কুত
তারে নারে
ঘুঘু ডাকে
বারে বারে
ঘুঘুর ডাক
তলোয়ার কাক।

৩.
এক ছি মালা
দুই ছি মালা
কানাই নাচে কদম তলা
কানাই নাচে কদম তলা
কানাই নাচে কদম তলা...।

৪.
ছি কুত কুত কুথানী
লাইলি আমার মামানি
মজনু আমার ভাই
শাহাবাজের ঘোড়ায় চইড়্যা
মক্কায় যাই, মক্কায় যাই, মক্কায় যাই...।

৫.
ওলো ছি তোর গালে কী
আলমডাঙ্গার কলসি
আলমডাঙ্গার কলসি
আলম ডাঙ্গার কলসি...।

www.pathagar.com

৬.
ছি কুত কুত তারে নারে
ঘু ঘু ডাকে বারে বারে
ঘুঘু ডাকে বারে বারে
ঘুঘু ডাকে বারে বারে... ।

উত্তারে গ্রুম গ্রুম
পশ্চিমে বান
পুঁটি মাছে ডিম পাড়ে
পাহাড়ের সমান
পাহাড়ের সমান
পাহাড়ের সমান... ।

৭.
ছি ছত্তরা বিন্দ্যাবন
ঘড়ি বাজে টন টন,
ঘড়ির কপালে ফোটা
বাঘ মারি গোটা গোটা
বাঘ মারি গোটা গোটা
বাঘ মারি গোটা গোটা... ।

৮.
ছি কুত কুত তাই নাই
তবলাকে পাই নাই
তবলা পয়ছা
লাল বাগিচা
লাল বাগিচা
লাল বাগিচা... ।

৯.
ছিলো ছি, করছি কি
ঘণ্টার আগে দৌড়্যাছি
ঘণ্টার আগ, বনের বাঘ
ফেঁইচ্যা মারি ঝাঁক ঝাঁক
ফেঁইচ্যা মারি ঝাঁক ঝাঁক
ফেঁইচ্যা মারি ঝাঁক ঝাঁক... ।

www.pathagar.com

১০.
আমার খেইল মারিলি
কোথায় নিয়্যা গাড়িলি
শিয়াল শকুনে খায়
গন্ধে গন্ধে পরাণ যায়
পরাণ যায়, পরাণ যায়, পরাণ যায়... ।

**১১. গামছা চুরি খেলার ছড়া**
অমুকের মাথায় কাইয়্যার ডিম
কে কে দিবি ছোঁয়া
বসলি সেন বিন্দ্যাবন, খাড়ালি সেন ছোঁয়া।

**১২. উপ্যানটি বাইস্কোপ খেলার ছড়া**
উপ্যানটি বাইস্কোপ
রাইটানা তেইস্কোপ
চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
এজবেস্তে সেতে
পান সুপারি খেতে
পানের আগালে মুড়ি বাঁটা
ইস্কুরুপি চাবি আটা
আমার নাম নিলুবালা
গলায় দিলাম ফুলির মালা ॥

**১৩. ডাংগুলি খেলার ছড়া**
এরি, দুরি, তিলিয়ার চম্পা
ঢেক, লঙ্কা।
অর্থাৎ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়।

**১৪. ছাগলগিরি খেলার ছড়া**
ছাগলগিরি, ছাগলগিরি
কেনরে ভাই লক্ষ্মীগিরি
তোর ছাগলে খাইছে ধান
খায়া থাহে বাইন্ধ্যা আন ॥

**১৫. লাটিম বুন বুন খেলার ছড়া**
লাটিম বুন বুন

www.pathagar.com

লাটিম বুন বুন
লাটিম নিল চোরে
ঢাকাই শহর আগুন লাইগছে
কে নিভাইতে পারে।

**মেয়েলি ছড়া**

১.
এ্যাটা ঘুঘু নাদে বাড়ে
আরাটা ঘুঘু খায়
আরাটা ঘুঘু নাচতি নাচতি
মার বাড়ি যায়।
মা দিল ত্যাল সিঁদুর
বাপে দিল শাড়ি
ভাইতি দিল লাঠির বারি
চললো মাগি ভাতার বারি।

২.
চালে ধরে চাল কুমড়্যা
ব্যাড়ায় ধরে চাল কুমড়্যা
ব্যাড়ায় ধরে ঝিঙ্যা
মিয়্যা ভাইর বিয়্যারমধি
ব্যাঙে বাজায় শিঙ্যা
মিয়্যা ভাই যাবি হোশুর বাড়ি
নীল্যা ঘোড়ায় চইড়্যা
আমরা যাবো পরের বাড়ি
ভাঙা লৌকায় চইড়্যা
ভাঙা লৌকা ব্যাতের বান্নন
বাইনদ্যা ওঠে পানি
আস্তে ধিরি চালাও লৌক্যা
মার কান্দন শুনি
মায় কাঁদে জনম জনম
বাপে কান্দে ঝি
সোনা বড়ুর বিয়্যা দিয়্যা করলাম কী।

৩.
মোল্লা বাড়ি তল্লা বাঁশ
বিল্যাই পাদে টাস টাস

www.pathagar.com

মোল্লার বউ গিন্নি
ছ্যাপ নাদে ছিন্নি।

**হাসি ও মজার ছড়া**

১.
আমার ঠুম্যাকি
ডাইল রান্ধিতে পারে ঠুম্যাকি
ডাইল রান্ধিতে পারে।
ছ্যাপ দিয়্যা ত্যালানি দিয়্যা
গুরমুড়্যা দ্যা ঘোঁটে
কি গুন গুন গুন।

হুঁক্কায় চুম চুমি
নাইরক্যালি বৈঠ্যাখানী সভাখানী গুণ।
নাগর আলি বিয়্যা করে
সাগর আলি বিয়্যা করে
সাগর আলির বুন।
বাককুম বাককুম করে মৈর‍্যামীর
বদনখানি লো ॥

২.
এ্যাটা কথা
ব্যাঙের মাথা
কী ব্যাঙ- সরু ব্যাঙ
কী সরু- বান গরু
কী বান- সুব্যারী বান
কী সুব্যারী- পাক্কা সুব্যারী
কী পাক্কা- খির‍্যাই চাক্কা
কী খির‍্যাই- পাত খির‍্যাই
কী পাত- ঘোড়া নাত
কী ঘোড়া- ছাওঘোড়া
কী ছাও- ঘু খাও।

৩.
ওয়ান টু, থ্রি
পালাম এ্যাটা বিড়ি

www.pathagar.com

বিড়িতে নাই আগুন
পালাম এ্যাটা বাগুন
বাগুনে নাই বীচি
পালাম এ্যাটা কেঁচি
কেঁচিতে নাই ধার
পালাম এ্যাটা হার
হারেতে নাই লকেট
পালাম এ্যাটা পকেট
পকেটে নাই টাকা
চইলা গেলাম ঢাকা
ঢাকায় নাই গাড়ি
চইলা আলাম বাড়ি
বাড়ি নাই ভাত
দিলাম এ্যাটা পাদ
পাদে নাই গন্ধ
হাই স্কুল বন্ধ ॥

**অন্যান্য ছড়া**

১.
ছি লো আইনজ্যা
পাতাল বাইন জ্যা
পাতাল নড়ে
দুমকা ছাড়ে, দুমকা ছাড়ে, দুমকা ছাড়ে... ।

২.
এক ঠ্যাং করাচি দিছি
ত্যানাপচা বান দিছি
তরোয়ালে শান দিছি
তোরে ধইর‍্যা টান দিছি
তোরে ধইর‍্যা টান দিছি
তোরে ধইর‍্যা টান দিছি... ।

৩.
উত্তারে গ্রুম গ্রুম
দক্ষিণে বিয়া
নাইরকোল ভাঙি যাঁতা দিয়া

www.pathagar.com

যাঁতার চোটে ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে
ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে, ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে...।

৪.
তিততিরি তিততিরি তিততিরি তি
সারা গায় মাখলাম নয় মন ঘি
নয় মন ঘি নয় মন ঘি, নয় মন ঘি...।

৫.
তাল পাতা তালসি, বৌ নিতে আইছি
বৌ তুমি যাইও, দুধভাত খাইও।
দুধ ভাত খাইও, দুধ ভাত খাইও, দুধ ভাত খাইও...।

৬.
আতালির পর থুলাম ডিব্যা
ডিব্যা নিলো কে
চুত মারানীর ছাওয়াল
আমার ডিব্যা আইন্যা দে
ডিব্যা আইন্যা দে, ডিব্যা আইন্যা দে...।

৭.
হুঁক্কায় গুড়গুড়ি মক্কায় টান
ছলেমান বিবি আগুন আন
আগুন আনতি পইলো ঠুসা
ঠুসার বড় বিষ
তোরা কেনি তোরা দিস তোরা
কেনি তোরা দিস তোরা কেনি তোরা দিস...।

৮.
হাইগব্যার বইছে কেরে
কাচি পোড়া দেরে
কাচি ওইলো গরম
গুয়াদ্যা বাইর‍্যায় শরম
গুয়াদ্যা বাইর‍্যায় শরম, গুয়াদ্যা বাইর‍্যায় শরম...।

৯.
এক গাছ টান দিলি ব্যাক গাছ নড়ে
কোকিলায় ডাক দিলি গুড়ুম গুড়ুম করে
গুড়ুম গুড়ুম করে, গুড়ুম গুড়ুম করে...।

www.pathagar.com

১০.
ছিয়া ছাই বশশি বাই
ভাঙ্গা বশশি টিপ তলাই
টিপ তলাইতে নাগরী
সোনা বাধা ঘাগরী
সোনা বাধা ঘাগরী.... ।

১১.
ছি কুত কুত রায়া
পবনের ম্যায়া
পবনেতে ছুইয়্যা দিছে
আতাফল খায়া, আতাফল খায়া... ।

১২.
ছিলো উই
নলের কুই
নলদ্যা বাজাই টাই টুই
টাই টুই, টাই টুই, টাই টুই ॥

১৩.
আহার মদি বিচ্যাকলা
বউ আরাইছে সকালবেলা
বাজানরে তোর পায়ে ধরি
বউ আইন্যা দেও তাড়াতাড়ি
তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি... ।

১৪.
ছি কুত কুত নন্দি
পাতালকে বন্দি,
পাতালকে বন্দি পাতালকে বন্দি... ।

১৫.
তাল খাওরে তাইল্যা ভাই
গাছের আগালে যায়া
আত্তি নাচে মইষ নাচে
তাল খায়া খায়া, তাল খায়া খায়া... ।

www.pathagar.com

১৬.
ওই পাতালে দেইহ্যা আলাম মেলা
খুরকু নাচন, ব্যাতের বান্নন
বউ টুক্যানীর খেলা, বউ টুক্যানীর খেলা...।

১৭.
বেশ কিছুদিন বৃষ্টিপাতের পর রাতে আকাশে যদি পরিষ্কার অনেক 'তারা' দেখা যায় তাহলে পরদিন রোদের প্রত্যাশায় সাধারণত এই অঞ্চলের মেয়েরা অথবা ছোটরা এই ছড়া কাটে।
এক তারা বান্নন (ধাঁধন)
দুই তারা বান্নন
তারারা সাত ভাই
বাঁইধ্যা ফেলালাম বড় ভাই
রাহাল মইলো ভাতে
গরু মইলো ঘাসে
কাইলক্যার রোইদি
পেরথম ফাটে।

১৮.
বাচ্চা ছেলেমেয়ে নাচানোর ছড়া
ত্যান ত্যানা ত্যান ত্যানা
তোর মার ভাইংছে ড্যানা
তোর বাপের গলায় ত্যানা
ত্যান ত্যানা ত্যান ত্যানা

১৯.
আকাশে বক ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেলে ছেলে মেয়েরা ছড়া কাটে–
আগের ডা পাছে যা,
মধ্যির ড্যা কাইট্যা যা।

২০.
কালো মেয়ে এবং ফর্সা মেয়ের মধ্যে কালোদের মূল্যায়ন করতে নিম্নোক্ত ছড়া–
ধলা ধুইতর‍্যার ফুল তার নাই এক পয়সার মূল
কালা কাজলের বাটি তার জন্যি ছয়মাস হাঁটি।

২১.
তিনজন হুঁকো খাচ্ছে এবং কলকিতে টিপছে ও ফুঁ দিচ্ছে–
এক ব্যাটা উঁহা খায় আরাক ব্যাটা টেপে

www.pathagar.com

আরাক ব্যাটা গুয়া থাপড়ায়
যদি উঁহা নেভে ॥

২২.
অতিথি এলে বা সাধারণত বেয়াই বেয়ান এ ধরনের অতিথি এলে মহিলারা মজা করে ছড়া কাটে–
আসুক কুটুম, বসুক ধেয়ানে
আইজক্যার নাশতা দেবো
কাইলক্যা ব্যায়ানে।

২৩.
ঠকানোর জন্যে অথবা পাল্টা ঠকানোর জন্যে ছড়া–
চাইল নাই, ডাইল নাই
আনলি পারে তয় সেন খাওয়া।
(আমিও) আইজ আছি, কাইল আছি
পরশু দিন সেন যাওয়া।

**২৪. ভাইবোনের ছড়া**
মিয়্যা ভাইরে যাইগগ্যা চ্যাটের বাল
ঘরে আছে কাঁসার থাল
হেই থাল বেইচ্যা
বউ আনবো বাইছ্যা।
বউ আনবো ডুলিতি
উঠ্যাবো তার কুলিতি
বউ নাখপো মাচায়
দেখবি আমার চাচায়।

**২৫. ক্ষেপানোর ছড়া**
(অমুক) বিবি, কলের চাবি,
কল ঘুর্‌য়ালী পয়সা পাবি
(অমুক) লো বিবি
মাছ কুইট্যা দিবি
এ্যাটা পয়সা পাবি
রুটি কিন্যা খাবি।

www.pathagar.com

# বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

## লোকশিল্প

রাজবাড়ী জেলা লোকশিল্প সমৃদ্ধশালী জেলা। এ অঞ্চলের লোকশিল্পগুলোর মধ্যে মৃৎশিল্প, বাঁশশিল্প, নকশি কাঁথা, ওয়ালমেট। নকশি শিকা, পাপোস, তাঁতশিল্প, বেতশিল্প, সূচি শিল্প প্রধান।

## ১. বাঁশজাত শিল্প

গ্রাম গঞ্জে বাঁশ ও বাঁশের বিশেষ কোনো পরিচর্যার দরকার হয় না। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বাঁশ ঝাড় রয়েছে। কাজের সময় বাড়ির লোকজন এই বাঁশ ব্যবহার করে। বাজবাড়ী অঞ্চলের অনেক জায়গার লোকজন বাঁশ দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে। এরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে। বাঁশ দিয়ে ঝাঁকা, (ঝুড়ি), ডালি, টুনা, ঘরের বেড়া, ডোল, বেড়ি (ধান রাখার), মাছ রাখার খালই, মাছ ধরার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন খাদুম, চারো, বানে, বানো ইত্যাদি তৈরি করে। কৃষি কাজে ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি চালুন, কুলা, ডালা, চাং (পিঁয়াজ, রসুন আলু রাখার), পাখা, সরপোস, বইয়ের তাক ইত্যাদি।

**ডোল**

উপকরণ : বাঁশ, সুতা বা দড়ি, গার।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে বাঁশ ঝাঁড় থেকে কেটে কিছু দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। যাতে ঘুণ বা কোনো পোকা নষ্ট না করে। পানি থেকে উঠানোর পর কিছুদিন রোদে শুকাতে হয়। যে কোনো বাঁশের জিনিস তৈরি করতে এগুলো করতে হয়। প্রয়োজন মতো সাইজ করে কেটে নিতে হয়। ডোল বানাতে বাঁশের সাইজ বড় রাখতে হয়। তল্লাবাঁশ দিয়ে ডোল বানানো হয়। প্রথমে বাঁশ থেকে বাতা উঠাতে হয়। পাতলা পাতলা করে বাতা উঠানো লাগে। একটি বাঁশ থেকে অনেকগুলো বাতা ওঠানো হয়। একটা মাঝারি ঢোল বা বেড়ি বানাতে ৩/৪টা বাঁশ লাগে। কিছু বাতা রং করে সুন্দর দেখার জন্য। সবুজ, লাল, ম্যাজান্ডা রং করা হয়। পানিতে রং গুলিয়ে জ্বাল করা হয়। তারপর বাতা ভিজিয়ে একদিন রাখতে হয়। পরে রোদে শুকাতে হয়। জোড় উঠানোর পর বাতা দিয়ে বেড়ি বানানো হয়। একটা বেড়ি বানাতে ৫/৬ দিন সময় লাগে। একটা ডোল বাজারে ৮০০/৯০০ টাকা করে বিক্রি হয়।

www.pathagar.com

**কুলা**

উপকরণ : বাঁশ, লোহা, রং, দাড়ি মোছ।

প্রস্তুত প্রণালী : এক দেড় হাত লম্বা করে বাঁশ কাটা হয়। তারপর মোটা মোটা বাতা উঠাতে হয়। বাতা দিয়ে কুলা বুনাতে হয়। বুনানো হয়ে গেলে মোটা শক্ত বাতা দিয়ে সেলাই করতে হয় যাতে খুলে না যায়। আবার লোহা দিয়ে আটকাতে হয়। দিনে কুলা ৩/৪টা বানানো যায়। বাজারে ১২০/১৫০ টাকা করে প্রতিটি কুলা বিক্রি করে।

ধান, চাল ঝাড়ার কাজে লাগে। কুলা রাজবাড়ী অঞ্চলের অতি পরিচিত নাম। প্রতিঘরে ঘরে এ কুলা দেখা যায়। সাংসারিক নানা কাজে কুলা ব্যবহৃত হয়। চাল, ধান, গম পরিষ্কার করতে কুলার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় রোদে কোনো কিছু শুকাতেও এর ব্যবহার হয়।

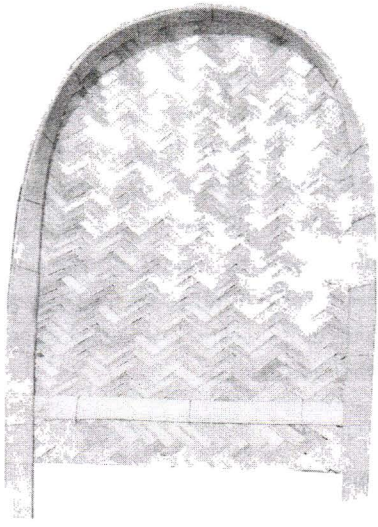

কুলা

**চালুন**

উপকরণ : বাঁশ, বেত, সুতা, রং, লোহা।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে বাঁশ সাইজ মতো কেটে নিতে হয়। তারপর শলা উঠাতে হয়। বাঁশের শলা দিয়ে চালুন বুনতে হয়। বোনা শেষে চারপাশে গোল মোটা বাতা দিতে হয়। বাতা দিয়ে বেত দিয়ে বাঁধতে হয়। আবার লোহা মারা হয় যাতে না খুলে যায়।

ঝাঁকা (ডালি) : ঝাঁকা বানানোর শলা মোটা করতে হয়। শলা তোলা হয়ে গেলে প্রথমে খাড়া করে জো তুলতে হয়। তারপর এর মধ্যে দিয়ে শলা একটা একটা করে ঘুরায়ে ঘুরায়ে বুনতে হয়। বুননের সময় মুখের দিকে ছড়িয়ে ধরতে হয় তাতে মুখের দিকে বড়

www.pathagar.com

হবে। এভাবে ঝাঁকার আকৃতি হলে তখন মোটা বাতা দিয়ে গোল করে চাকা বানিয়ে তলার সাথে বাঁধতে হবে। এভাবে দিনে ২/৩টা ঝাঁকা বানানো যায়। এই ঝাঁকাগুলো টেকসই হয়। পাকা বাঁশের তৈরি ঝাঁকা অনেক দিনে ব্যবহার করা যায়। কারণ পাকা বাঁশের তৈরি জিনিসে ঘুণ পোকা লাগে না। পচে যায় না।

চালুন দিয়ে ধান ও গমের খড় কুটা, পাথর পরিষ্কার করা হয়।

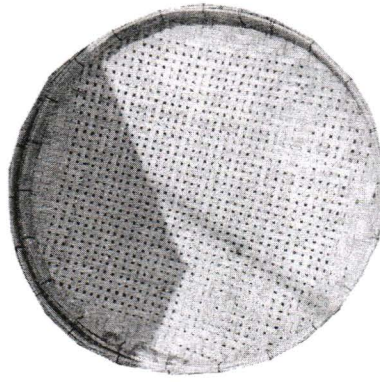

ধান ও চাল পোছার চালুন

## ২. বেতজাত শিল্প

রাজবাড়ী জেলার আনাচে কানাচে অযত্নে অবহেলায় বেত হয়ে থাকে। এই বেত দিয়ে নানা রকম প্রয়োজীয় দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করা অনেকের পেশা। বেতের কাজ করেই সংসার চালায় অনেকে। তবে যে পরিবারে বেতের কাজ হয় সে পরিবারের সকলে কম বেশি এ কাজের সাথে জড়িত থাকে। বেত দিয়ে ধামা, কাটা, আদলা, সের, চেয়ার, টেবিল, ঝুড়ি, ডালি ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

### ধামা

উপকরণ : বেত, লোহা, সুতা, গাব।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে বেত ঝাঁড় থেকে কেটে নিয়ে ধারালো দা দিয়ে বেতের গায়ে আবর্জনা কাঁটা পরিষ্কার করা হয়। তার পর ৪/৫ দিন রোদে শুকাতে হয়। ভালোভাবে না শুকালে ধামা তৈরি ভালো হয় না। ধামা তৈরিতে প্রথমে তলা বানাতে হয়। বেত হাতের ভেতর করে সমতল জায়গায় রেখে ঘুরায়ে ঘুরায়ে চাকা চাকা মতো করতে হয়। একটা ঘুরানোর পর বাতা দিয়ে বাঁধতে হয় আর মাঝে মাঝে ছোট লোহা দিয়ে আটকাতে হয়। দিনে একটা বানানো যায়। একটা ধামা বাজারে ৪০০/৪৪০ টাকা বিক্রি হয়।

ধান, চাল, গম বহন করতে ব্যবহৃত হয়। ফসলের মৌসুমে বেশি ব্যবহৃত হয়। একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে ধামা ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

### সোফা ও টি টেবিল

বেতের ধামা জাতীয় পাত্র ছাড়াও এ অঞ্চলে বেতজাত সোফা, টি টেবিল ও বইয়ের সেলফও তৈরি করা হয়। এ কাজে বিভিন্ন ধরনের নকশা ব্যবহৃত হয়।

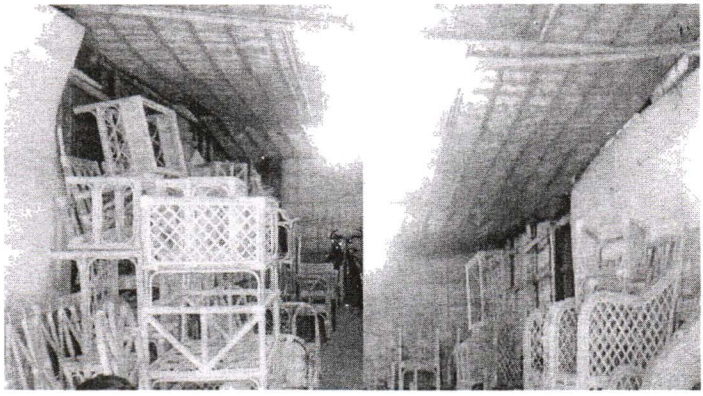

## ৩. পাটজাত শিল্প

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ পাট জন্মে। আর এই পাট দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরি করে রাজবাড়ী জেলার অনেক নারী পুরুষ জীবিকা নির্বাহ করে। এরা পাট দিয়ে পাপোশ, শিকা, ব্যাগ, কার্পেট, আয়না ও চিরুনিদানী প্রভৃতি বানায়।

### নকশি শিকা (শিহে)

উপকরণ : পাট, রং, বিভিন্ন রঙের কাপড়, সুতা।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে এক লাছি পাট থেকে কিছু পাট নিয়ে ঝুলিয়ে বা টান করে উঁচু জায়গায় বাঁধতে হয়। তারপর গোড়ায় দিয়ে গিঁট দিতে হবে। এখান থেকেই জো উঠাতে হয়। চুলের বেণীর মতো প্রথমে ৪/৫টা বেণী করতে হয়। এই বেণীগুলো থেকে আবার বেণী করতে হয়। এরপর একটা বেণীর সাথে আর একটা বেণী জোড়া দিয়ে আবার সেই বেণী একটু বানিয়ে আবার যেখান থেকে কয়েকটা বেণী করতে হয়। এভাবে শিকা বানানো চলতে থাকে।

প্রয়োজন মতো বানানো হলে আগায় গিঁট দিতে হবে। এর মাঝে মাঝে বিভিন্ন রঙের কাপড়েরর ছোট টুকরা দিতে হয়। তাহলে ফুল ফুল নকশা হয়। আবার পাট প্রথমে লাল, সবুজ রঙের করে নেয়। তাহলে শিকাটা বেশ দৃষ্টিনন্দন হয়। মেয়েরা সাধারণত কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিখা বানায়।

রাজবাড়ী জেলার আঞ্চলিক ভাষায় শিকাকে শিহে বলা হয়। পাট দিয়ে শিকা বানানো হয়। তবে এর মধ্যেই এরা অনেক নকশা করে থাকে। রাজবাড়ী জেলার মেয়েরা বিশেষ করে বয়স্ক নারীরা শিকা বানায়।

www.pathagar.com

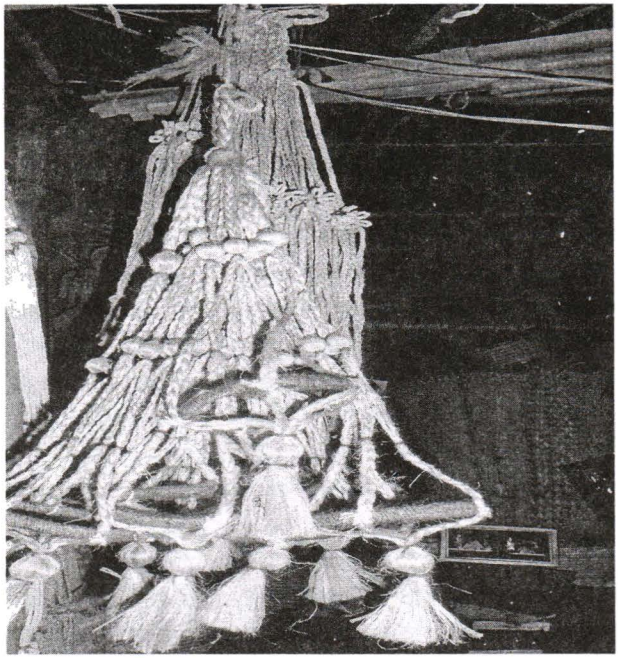

নকশি শিকা

**পাপোশ**

উপকরণ : পাট, রং, সুঁচ অথবা ছাতার লম্বা ছিক ২টা।

প্রস্তুত প্রণালী : পাট পাকায়ে দড়ি বানায়ে নেয়। দুটো দড়ির আল দুই হাতে নিয়ে শিকের ভেতর ঢুকিয়ে প্রথমে জো উঠাতে হয়। জো উঠানোর পর ডান হাতের শিক দিয়ে বাম হাতের শিকের ভেতর ঢুকিয়ে লং বানাতে হয়। একটা লং হয়ে গেলে আবার একটা চেন দিতে হয়। এভাবে একবার বাম হাতের আবার ডান হাতে কাজ হয়। হাতের প্যাঁচের মধ্যে গোলাপ ফুল, শাপলা ফুল, পাখির নকশা করা হয়। শিল্পীরা ইচ্ছামতো নকশা করে থাকে। একটানা সারা দিন কাজ করলে এক দিনেই একটা পাপোশ তৈরি করা যায়। বাজারে এই পাপোস ৮০/৯০ টাকা বিক্রি হয়।

## ৪. পাটি শিল্প

রাজবাড়ী অঞ্চলের মানুষ তাদের অতিথি আপ্যায়নের জন্য পাটি বা সপ পেতে বসতে দেয়। যদিও বর্তমানে চেয়ার, টুলের ব্যবহার বেড়েছে তারপরও পাটির ব্যবহার কমে যায়নি। আঞ্চলিক ভাষায় পাটিকে সপ বলে। খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, বলেঙ্গা (জলমুখা) হলো পাটি তৈরির কাঁচা মাল। খেজুর পাতার পাটির প্রচলন গ্রাম অঞ্চলে বেশি।

www.pathagar.com

**খেজুর পাতার পাটি**

উপকরণ : খেজুর গাছের পাতা, দড়ি, বাঁশ, সুই (বড় সুই)।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে গাছ থেকে খেজুর গাছের ডাল (বাইরো) কেটে নিতে হয়। এই ডাল বা বাইরো থেকে গোড়ার কাঁটা কেটে ফেলতে হয়। শীতকালে বেশি কাইরো বা ডাল কাটা হয়। কেননা তখন গাছ কেটে রস বের করতে হয়। এজন্য গাছ আগে ঝুরতে হয় বা ডাল কাটতে হয়। তবে এ সময় পাতাগুলো রোদে শুকিয়ে রাখা হয়। সময়মতো অবসর পেলে পাটি বানানো হয়।

গাছের ডাল বা কাইরোগুলো রোদে কয়েক দিন ধরে শুকাতে হয়। সবুজ পাতাগুলো শুকিয়ে সাদা হয়। সকালে রোদ উঠলে রোদে দিতে হয় আবার সন্ধায় ঘরে তুলে রাখতে হয়। নতুবা কুয়াশা বা বৃষ্টির পানি পড়লে পাতার উপর ছোট কালো কালো তিলের মতো পড়ে। এতে পাটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। বাইরোগুলো শুকনো হয়ে গেলে দা বা বটি দিয়ে ছোড়তে হয়। ছোড়নোর পর পাতার মাঝখানের শিরা ফেলে দিয়ে দুটো করতে হয়। এভাবে অনেকগুলো বাছা হয়ে গেলে পাটি জোড়ার জন্য বারট্া পাতা নিয়ে প্রতিটা প্াতার মাঝের শিরা ফেলতে হবে। পাতা গোড়ার দিক ফাড়তে হয় না।

এভাবে বারোটা করা হয়ে গেলে দুটো দুটো করে জোড়া করতে হয়। জোড়া হয়ে গেলে সকল জোড়া এক সঙ্গে করে ভাঙাতে হয় বা বুনতে হয়। বাম দিকে ফাড়া পাতা একটা লাগাতে হয়। এভাবে ৫ ইঞ্চি মতো ভাঙিয়ে ডান দিকে একটা পাতা লাগিয়ে বুনতে হয়। আবার বাম দিকে পাতা লাগিয়ে বুনতে হয়। এভাবে বুনতে বুনতে ১৪/১৫ হাত লম্বা করলে একটা ফাইল বানানো হয়।

গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে খেজুর পাতার পাটি রয়েছে। কাঁথা সেলাই করতে বসে, কেউ বাড়িতে এলে বসতে দেয়, খেতে বসার সময়, পড়ার সময় পাটি পেতে বসে।

আবার নতুন করে আর একটা ফাইল জুড়তে হয়। এভাবে বানানোর পর ১৪/১৫ ফাইল হলে সমতল জায়গায় ফাইলগুলো সোজা করে পাততে হয় বা বিছাতে হয়। বিছানো ভালো বা সোজা না হলে পাটি গাঁতা ভালো হয় না। বাঁকা হয়ে যায়। এর পর দড়ি বা খেজুর পাতার এক পাশে গিঁট দিয়ে একটার সাথে আরেকটা গাঁথতে হয়। সবগুলো গাঁথা হয়ে গেলে মুড়ো মারতে হয়। অর্থাৎ সামনের দিকে মাথা মেরে ভাঙে ভাঙে বাঁশ, সুই আর দড়ি দিয়ে সেলাই করতে হয়।

এভাবে খেজুর পাতার পাটি তৈরি করা হয়। এ পাটি মেয়েরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বানায়। পাটি বানানো উপযুক্ত সময় হলো বর্ষার সময়। বর্ষার দিনে ঘরের বাইরের কাজ থাকে না। মেয়েরা আপনমনে পাটি বানায়। রোদে ধান, চাল, গম, তেল বিশেষ করে ফসল শুকানোর জন্য যে পাটি তৈরি করে সেগুলো অনেক বড় হয়। বসার পাটি বা ঘুমানোর পাটি মাঝারি আকারের হয়। গরমের দিনে গ্রামের মানুষ গাছের নিচে বসতে বা মেঝেতে শুতে এ পাটি ব্যবহার করে। নামাজ পড়ার জন্য ছোট খেজুরের পাটি বানায়। অল্প আয়ের লোকেরা খাট, চৌকিতে বিছিয়ে থাকে। একটা পাটি ৪০/৫০ টাকা দরে বাজারে বিক্রি হয়।

www.pathagar.com

### নারকেল পাতার পাটি

খেজুর পাতার পাটির মতোই নারকেল পাতার পাটি বানানো হয়। নারকেল পাতার পাটি থেকে খেজুর পাতার পাটি টেকসই হয়। নারকেল গাছ ঝোরার পর বাইরো থেকে পাতা ছোড়ায়ে মাপ মতো চিকন করে নিতে হয়। নারকেল পাতা রোদে না শুকায়েই কাচা বানাতে হয়।

পাতা শুকানোর পর বানাতে গেলে পাতা ভেঙে যায়। বুনন পদ্ধতি সব কিছুই খেজুর পাতার মতো। নারকেল পাতার পাটি ভারী হয়। এক বাইরো থেকে মাঝারি আকারের পাটি দুটো হয়। নারকেল পাতার পাটি জোড়ার সময় গোড়ায় গিঁট দিয়ে নিতে হয়। নতুবা জো উঠানো যায় না। বাজারে ৪০/৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়। একটা পাটি তৈরি করতে ৫/৬ দিন সময় লাগে। এটি মেয়েরা তৈরি করে থাকে।

### বলেঙ্গার (পাটিমুখার) পাটি

বলেঙ্গার পাটি বেশ ব্যয়বহুল। অনেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বলেঙ্গার পাটি বোনা হয়। তবে বলেঙ্গার পাটিতে ঘুমানো বেশ আরামদায়ক। পানিতে জন্মে এ বলেঙ্গা। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসগুলোতে বলেঙ্গা সংগ্রহ করা হয়। কাসির বিল, সাস্তাপুরের বিলে, খামারের বিলে এবং রাজবাড়ী অনেক বিলে বলেঙ্গ জন্মে। পানি একটু কমলে দূরদূরান্ত থেকে লোকজন বলেঙ্গা কাটতে আসে।

বলেঙ্গা কাটতে ধারালো কাঁচি দরকার হয়। বলেঙ্গা গোড়ার একটু উপর থেকে কাটতে হয়। বলেঙ্গা বাড়িতে আনার পর ৪/৫ দিন রোদে শুকাতে হয়। শুকানোর পর পরিষ্কার করে পাটি বোনার উপযোগী করা হয়। খোলামেলা কোনো জায়গায় লম্বা দূরত্ব করে এক পাশে দুটো অন্য পাশে দুটো খুঁটি পুঁততে হয়। তারপর লম্বা করে দড়ি পাট টাকুরের ভেতর দিয়ে টান টান করে অনেকগুলো টানাতে হয়। এবার একটা একটা করে বলেঙ্গা এই দড়ির ভেতর দিয়ে উপর নিচে করে বুলতে হয়। একটা করে বলেঙ্গা বোনার পর কাঠের তৈরি পাটাল দিয়ে চাপ দিয়ে টাইট করতে হয়। এভাবে একটা পাটি বানাতে ৫/৬ দিন লাগে। এটি সাধারণত পুরুষেরা বানায়। একটি মাঝারি আকারের পাটি বানাতে ১০০/১৫০ বলেঙ্গা লাগে। আর দড়ি লাগে ৫০ টাকার। বলেঙ্গার পাটির চাহিদা খুব বেশি। তবে এটা বানাতে যে খরচ পরে সে রকম লাভ না হওয়ায় এর বুনন কমে গেছে। একটার দাম ৪০০/৪৪০ টাকা পড়ে।

## ৫. পাখা শিল্প

গ্রাম অঞ্চলে বিদ্যুৎ না থাকায় পাখার ব্যবহার প্রতি ঘরে ঘরে হয়। এমনকি বিদ্যুৎ থাকলেও এমন কোনো বাড়ি নেই যে পাখা নাই। এই পাখা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বাঁশের পাখা, তালপাতার পাখা, কাপড়ের পাখা ইত্যাদি। নকশি পাখাও দেখা যায়।

### তালপাতার পাখা

তালগাছের বাইরো কেটে কাঁচা অবস্থায় গোল করে কাটতে হয়। তারপর শলা দিয়ে মাঝে মাঝে বাঁধতে হয় যাতে মজবুত হয়। এবার মোটা শক্ত বাতা দিয়ে ডাটি দিতে

www.pathagar.com

হয়। পাখার উপর বিভিন্ন নকশা করা হয়। ফুল, ফল, গাছের, পাখির ছবির মোটিফ ফুটে ওঠে। পাখার উপর ছন্দও লেখা থাকে। যেমন :

তালের পাখা প্রাণের সখা
গ্রীষ্মকালের ধন, বাতাস লয়ে জুড়ায়
মোরা মোদের এ জীবন।

**বাঁশের পাখা**

বাঁশ থেকে ছোট ছোট শলা তুলে নিতে হয়। এক হাত লম্বা বাঁশ কেটে এ শলা তুলতে হয়। শলা তুলতে বেশ সতর্ক হতে হয়। কেননা শলাগুলো একরকম না হলে বোনানো ঠিক হয় না। বাঁশের পাখা বুনানোর সময় মাঝখান থেকে জো তুলতে হয়। এই জো থেকে শলা দিয়ে চারপাশে বুনতে হয়। পাখা গোল করা হয় আবার চার কোণা করা হয়। পরিমাপ মতো বুনানো হলে চারপাশে মোটা বাতা দিয়ে মুরো আটো দিতে হবে। এর পর ডাটি লাগাতে হয়। বাঁশের শলা বিভিন্ন রঙ করা হয়। যেমন সবুজ, লাল গোলাপি রঙ। শলা বানানো পর রঙ পানিতে গুলিয়ে জ্বাল করে নিতে হয়। এর মধ্যে শলা একদিন একরাত ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর রোদে শুকাতে হয়। পাখা বুননোর সময় এক এক বার এক এক রঙের শলা দেওয়া হয়। শিল্পীর হাতের মধ্যে এ নকশা হয়ে থাকে। কেননা এখানে আগে কোনো নকশা করা হয় না। বানানোর সময় নকশা হয়ে যায়। রাজবাড়ী জেলায় এ পাখার বেশ প্রচলন দেখা যায়।

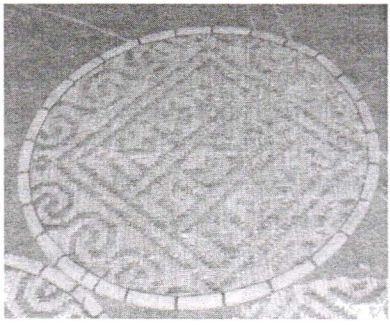

পাখা

**কাপড়ের নকশি পাখা**

নতুন এক রঙের কাপড়ের উপর মেয়েরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে হাতের কাজ করে। এক গজের একটু কম কাপড় নিয়ে ফ্রেমের ভেতর আটকিয়ে যাতে টান টান হয়। কাপড়ের উপর আগেই পেন্সিল বা চক দিয়ে নকশা করে নেয়। এই নকশা অনুযায়ী সেলাই করে। পাখার নকশায় এরা চেইন সেলাই কাঁথা সেলাই, ভরাট সেলাই, ডপল সেলাই দেয়। নকশা হিসেবে ছড়া/শ্লোক বিভিন্ন ধরনের ফুল, পাখি ইত্যাদি তোলা হয়। নতুন আত্মীয় স্বজন আসলে তখন এ পাখা দিয়ে তাদের বাতাস করা হয়। এই পাখাগুলো সখের বশে করা হয়। কেউ কেউ এখন বাড়তি আয় রোজগারের জন্য পাখা তৈরি করে।

www.pathagar.com

## ৬. তাঁত শিল্প

তাঁতশিল্প বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম শিল্প। দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই তাঁত শিল্প এবং তাঁতশিল্পের ধারক-বাহক তাঁতশিল্পীরা। রাজবাড়ী জেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাজবাড়ী সদর থানার মিজানপুর ইউনিয়নের বাগমারা পাংশা থানার যশাই ইউনিয়নের যশাই গ্রাম, কালুখালীর থানার মৃগী ইউনিয়নের নিয়ামতপুর গ্রামের তাঁতিরা এখনও এ পেশাকে আঁকড়ে ধরে আছে। এছাড়াও রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার কয়েকটি গ্রামসহ অনেক জায়গাতেই এখনও তাঁতের ওপর কিছু মানুষের জীবন চলে। তবে আগের তুলনায় বর্তমানে তাঁতশিল্পের শিল্পী কমই আছে। যেমন রাজবাড়ী জেলার মিজানপুর ইউনিয়নের বাগমারা গ্রামটিতে তাঁত শিল্পের আগে যে রমরমা ভাব ছিল বর্তমানে তা নেই। অতীতে এই গ্রামে ২০-২৫ ঘর তাঁতি ছিল। বর্তমানে ছয় ঘর তাঁতির বাস এই গ্রামে। পুঁজির অভাব ও সময় মতো বিক্রির অভাবে এরা বিলীন প্রায়। পূর্বে এ গ্রামে লুঙ্গি তৈরি হতো কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে তা বন্ধ হয়ে গেছে। রাজবাড়ী অঞ্চলে তাঁতশিল্পীদের বা তাঁত সম্প্রদায়ের লোকদের জোলা বলা হয়।

এই তাঁতিরা বেশিরভাগ সুতা কেনে রাজবাড়ী সদর থেকে। আবার কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকেও কিনে আনে। ভিন সুতা ৫$\frac{১}{২}$ পাউন্ড ১১০০ টাকা, সাদা সুতা ৫$\frac{১}{২}$ পাউন্ড ১১০০ টাকা দরে কিনে আনে এই শিল্পীরা। এই পরিমাণ সুতার ৩ $\frac{১}{২}$ হাত বহরের মোট ৫০০ পিছ গামছা তৈরি হয়। প্রতি পিছ গামছা ৪ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। এক দিনে মোটামুটি ১০-১২টি গামছা তৈরি করতে পারে।

### গামছা

উপকরণ : সুতি, মাক্কু, সানা, বাধন ফিকতে তুঁতে, ড্রাম, ফ্রেম, চিত্তরঞ্জন তাঁত, চাবি রঙ, ময়দা বা মাড় ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে বাজার থেকে সুতা কিনে এনে মার দিতে হয়। এই মার ময়দা দিয়ে ও তুঁতে দিয়ে তৈরি হয়। এরপর সুতা রোদে শুকিয়ে বুনন করতে হয়। তারপর ব করে ফ্রেমে সাজাতে হয়। ড্রামের সাহায্যে গোছাতে হয়। সানা থেকে চিত্তরঞ্জন তাঁতে নিয়ে শিল্পীর সুনিপুণ হাতে মাকুর সাহায্যে হরেক রঙের গামছা তৈরি হয়। তৈরির পর এ গামছাতে মার দিয়ে ফ্রেমে টানিয়ে রোদে শুকাতে হয়। শুকানোর পর গামছা বিক্রির জন্য তৈরি হয়। গামছা তৈরির পর একসাথে অনেক গামছা থাকে পরে তা কাটা হয়। কেটে গামছার সাইজ করে তা বাজারে বিক্রি করে।

### লুঙ্গি

পাংশা থানার যশাই ইউনিয়নের যশাই গ্রামের তাঁত শিল্পীরা লুঙ্গি তৈরি করেন। রাজবাড়ী সদর থানার বাগমারা গ্রামের তাঁতিদের থেকে এদের অবস্থা তুলনামূলক একটু ভালো। এরাও বংশপরম্পরায় একাজে নিয়োজিত। এ শিল্পীরা বেশিরভাগ নিরক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। কেউ কেউ অল্প কিছু পড়তে জানে। এই গ্রামে প্রায় ১০০ ঘর তাঁতি বাস করে। এরা সবাই লুঙ্গি তৈরি করে। লুঙ্গির ডিজাইনে কারিগর মনের মতো রঙ দিয়ে লুঙ্গি তৈরি করে।

www.pathagar.com

১৫ পাউন্ড সুতার দাম ৪২০০ টাকা। এই সুতায় ৮৪ পিছ লুঙ্গি তৈরিতে প্রায় ২১ দিন সময় লাগে। ১ গতো অর্থাৎ ৪ পিছ লুঙ্গির ১২৫০ টাকায় বিক্রি হয়। পিটালোম তাঁতে তৈরি হয় এসব লুঙ্গি। গ্রীষ্মের লুঙ্গি চাহিদা বেশি এবং শীতকালে একটু কম।

উপকরণসমূহ : সুতা, রঙ, পিটালোম, তাঁত, মাক্কু, সানা, ধাবন, চরকা, লাটাই, ফ্রেম, চারি, জাগ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী : সুতার মোকাম (কুমারখালী) থেকে সুতা কিনে রঙ করে মার দিয়ে শুকাতে হয়। তিন দিন শুকানোর পর লাটাই করতে হয়। এর পর ধাবন করে ড্রামে গোছাতে হয়। এরপর লরাজে পেঁচিয়ে ব এবং সানা করতে হয়। এই সানায় সাজানো সুতা দিয়ে পিটালোম তাঁতে বসে শিল্পী লুঙ্গি বুনেন। বুনোনো এগুলো বাজারজাত করতে হয়।

যে কোনো প্রকার কাপড় বোনার জন্য সাধারণত দুই ধরনের সুতার প্রয়োজন হয় টানা ও পোড়েলের জন্য। টানার সুতাতে মাড় লাগানোর প্রয়োজন হয়। মাড় দেয়া সুতাগুলোকে লাঠিমের বা কাঠের নলের আকৃতির বিমের গায়ে লাগানো বা জড়ানো হয়। বিমে সুতা জড়ানোর পর তা চিত্তরঞ্জন তাঁতের যন্ত্রে স্থাপন করলে তৈরি হয়ে যায় লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি, তোয়ালে বিছানার চাদর ইত্যাদি। চিত্তরঞ্জন থেকে তৈরি করার পর মাড় দিয়ে কড়া রোদে শুকানোর জন্য ফ্রেমে করে বেঁধে রোদে দেওয়া হয়। মাড় দেওয়া গামছা ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ভাজ করে গাইট আকারে বেঁধে রাখা হয়।

তাঁতে তৈরি গামছার মাড় দেওয়ার জন্য ময়দা ব্যবহৃত হয়। গামছা তৈরির প্রধান উপকরণ সুতা পাউন্ড হিসেবে কিনে আনে। বিভিন্ন রঙের সুতা পাওয়া যায়। সুতার দাম নির্ভর করে রঙের উপর। লাল, কালো ও নীল রঙের সুতার দাম বেশি।

পিটালোম তাঁত মাটির নিচে পুঁতে ব্যবহার বা কাজ করতে হয় বলে একে গেতো তাঁত বা সাইটা তাঁতও বলে। একটা সুতার বিম তৈরি করতে দুই দিন সময় লাগে। বিম তাঁতে ছোট করার পর তাতে সোম দেওয়া হয়। কারণ তাঁতে সোম দিলে সুতা পিচ্ছিল হয় এবং তাঁত মেশিনটি ভালো চলে। এক বিন থেকে ২০০টি লুঙ্গি হয়।

তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত তাঁত মেশিনের মধ্যে পিটালোম তাঁতের দাম বেশি। দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা দাম। রাজবাড়ী জেলার তাঁতিরা তাদের তৈরিকৃত লুঙ্গি গামছা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করে। এটি শুধু রাজবাড়ী জেলায় মানুষের চাহিদাই মেটায় না এরা বাইরে অন্যান্যদের চাহিদাও মেটায়। এ অঞ্চলের কাপড়ের মান বেশ ভালো বলেই পরিচিতি আছে। তবে আগের তুলনায় তাঁতেই বাজার খুবই মন্দা।

## ৭. মৃৎশিল্প

দৈনন্দিন জীবনে মাটির তৈরি জিনিসপত্র বাংলার ঘরে ঘরে এক সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতো। এদেশের মানুষ বিশেষ করে যারা গ্রামে বসবাস করে তাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার ছাড়া গ্রামীণ মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না। আগের দিনের গ্রামবাংলার মানুষ ভাত তরকারী রান্নার জন্য হাঁড়ি-পাতিল, পানি রাখার জন্য কলসি, পিঠা বানানোর জন্য খোলা, ছাঁচ ইত্যাদি ব্যবহার করত। বর্তমানে

www.pathagar.com

মাটির পাত্রের ব্যবহার একেবারে কমে যায়নি। রাজবাড়ী জেলার মৃৎশিল্পীরা কেবল হাঁড়ি, পাতিল ও কলসি তৈরি করেন না–তাঁরা পুতুল দেবদেবীর মূর্তি, নকশা করা পাতিল, ঘর সাজানোর উপকরণ, খেলনা পুতুল, রঙিন ফুলদানি এবং ছাইদানি তৈরি করেন। এর মাধ্যমে এসব শিল্পীর কারিগরী দক্ষতা ও শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ পায়।

মৃৎপাত্র তৈরির উপকরণসমূহ: কালো এঁটেল (আঠালু) মাটি শতাংশ হিসেবে ক্রয় করা হয়। এই মাটির দাম শতাংশ প্রতি ১২০০-১৫০০ টাকা। জমির উপরের স্তরের ৪-৫ ফুট মাটি কেটে সংগ্রহ করা হয়।

কাঠের চাক : (কাঠাল কাঠ নির্মিত), বাঁশ, নারকেলের আঁশ, নারকেলের রশি, একটি পাথরের উপর এই চাক বসিয়ে কাজ করতে হয়।

বইলান : বইলান, (এটি দ্বারা মাটির তৈরিকৃত জিনিসের তলা পিটিয়ে জোড়া দেওয়া হয়) কোদাল, ছাঁচ (বাঁশ বা টিনের হয়ে থাকে), বালি, পানি ইত্যাদি।

রাজবাড়ী জেলার কুমাররা যে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে মাটির কাজ করে তাকে কয়েকটি ভাগে তারা ভাগ করে নেন।

১. মাটি সংগ্রহ সংরক্ষণ

২. মাটিকে পাত্র তৈরির উপযুক্ত করা

৩. চাকের সাহায্যে অথবা হাতের সাহায্যে পাত্রের আকৃতি দেওয়া।

৪. রোদে শুকানো।

৫. আগুনে পোড়ানো।

প্রস্তুত প্রণালী : মাটি সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করতে হয়। এই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মাটি নিয়ে পানি দিয়ে নরম করে মাটি পা দিয়ে ছেনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্তূপ করে রাখা হয় এবং এই স্থান থেকে হাতের ছাঁচ দ্বারা মাটি কাটতে হয়। এই সময় মাটিতে ভিতর, ঝিল, শামুক, খের, ময়লা বাছাই করা হয়। মাটি বাছাই করার সময়ই অবশ্য আবর্জনা বাছাই করা হয়। এরপর রুটির তাওয়া করার মতো মাটি তাওয়া করতে হয়। মাটি তাওয়া করার পর এটিকে চাকে নিতে হয়। চাকে নেওয়ার পর শিল্পীর হাতের স্পর্শে এই তাওয়া হাড়ি, পাতিল, কলসী জলঘট, ফুলের টব, বড় কুলা (মটকা) ছোটঘট (পূজায় ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদিতে পরিণত হয়। কাঠের চাকাকে লাঠির সাহায্যে ঘুরিয়ে তৈরি করেন মাটির কলসিসহ নানা দ্রব্যসামগ্রী। চাকে তৈরির পর এটিকে প্রয়োজনে রোদে শুকাতে অল্প শক্ত করে তলা তৈরি করে জোড়া দিতে হয় বইলান দ্বারা। এরপর রোদে প্রয়োজন মতো শুকাতে হয়। রোদে এগুলোকে পুনশান বা ভাটায় সাজিয়ে পল বা খড় দিয়ে কাদামাটি দিয়ে ভালোভাবে লেপে দিতে হয়। পাত্রকে রোদে শুকিয়ে রঙ দেওয়া হয় এবং শুকানোর পর আবারও রং দেওয়া হয়। এরপর পুনশানে সাজিয়ে লাকড়ি বা খড়ি দিয়ে আগুন দেওয়া হয়। আগুন দেওয়ার পুটে সকল পালদের মতো রাজবাড়ী জেলার পালরাও কিছু সংস্কার পালন করা হয়। যেমন :

১. চুলায় আগুন দেওয়ার পূর্বে চুলার চার দিকে ধূপ দেওয়া।

২. সোনা রুপার পানি চুলায় ছিটিয়ে দেওয়া।

৩. চলার এককোপে ঝাড়ু বা পিছা রাখা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

আগুনে পোড়ানো হয়ে গেলে উপরের মাটির প্রলেপ সাবধানে ভেঙে মৃৎপাত্রগুলো বের করা হয়। পোড়ানো পাত্রগুলো সাধারণত ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। ঘরে সাজিয়ে রাখা মৃৎপাত্রগুলো ধীরে ধীরে বাজারে, হাটে প্রভৃতি জায়গাসহ বিভিন্ন মেলায় ফেরি করে বিক্রি করা হয়।

মৃৎশিল্প রোদে শুকানো হচ্ছে

মাটির তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ফলমূল পাখি, খেলনা, আম, কাঁঠাল, ঘর বাড়ি, দোয়েল, খেলনা, হাড়ি পাতিল, ঝাঝর, ছাবনা বাঘ, হরিণ, টিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মাটির খেলনা প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে মাটি সংগ্রহের পর তা থেকে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে রাখতে হয়। এ সময় কোদাল দিয়ে মাটি ছোট ছোট আকারে কাটতে হয় যাতে মাটি ভালোভাবে ভিজতে পারে। মাটি ভালো ভাবে ভিজে গেলে পা দিয়ে পাড়াতে হয়। মিহি হলে তখন কাজের উপযোগী হয়। এই মাটি ডাইসের মাটি দিয়ে কাছান প্রস্তুত করা হয়। এভাবে আম, আপেল বানানো হয়।

আবার পুতুল বানাতে চাইলে মাটি উপযোগী করে নেওয়ার পর হাতের মাধ্যমে পুতুলের ডিজাইন করা হয়। ছোট বড় নানা আকারের পুতুল বানানো হয়।

বাংলাদেশের মানুষ স্বল্প আয়ের তাই এই স্বল্প আয়ের মানুষেরা তাদের আয় থেকে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে। এই সঞ্চয় করার পদ্ধতি হিসেবে তারা বেছে নেয় মাটির তৈরি ছোট ব্যাংক। এই ব্যাংকে তারা এক টাকা দুই টাকা করে জমায়।

মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিস মেলা বা কোনো উৎসবে বেশি বিক্রি হয়। যেমন পহেলা বৈশাখ ঈদের দিনে চৈত্র সংক্রান্তি, পূজা, ইত্যাদি উৎসবে। এছাড়াও কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে এসব বিক্রি হয়।

মাটির কাজের মধ্যে স্প্রে রং ব্যবহার এর কাজ সবচেয়ে বেশি দামি। মাটির তৈরি পুতুল রোদে শুকিয়ে পোড়ানোর পর স্প্রে মেশিন দিয়ে মাটির পুতুলে রঙ ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

এই রঙ তৈরি করতে তেঁতুলের বিচি ঢেঁকিতে কুটে বা পার দিয়ে গুঁড়া করা হয়। তারপর জ্বাল করলে এক ধরনের আটার মতো রং হয়। যা ছোট পাত্রে ব্যবহার করা হয়।

প্রতিমা তৈরি : মৃৎশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কঠিন এবং লাভজনক কাজ হলো প্রতিমা তৈরি করা। এ কাজ করতে সবাই পারে না। কালুখালীর রতনদিয়ায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বড় মূর্তি তৈরি হয়। প্রতিমা তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। অত্যন্ত দক্ষ হাতে শিল্পী প্রতিমা তৈরি করে থাকেন। পূজা মৌসুমে এ কাজ করা হয়।

প্রথমে মূর্তি তৈরির ফ্রেম বানানো হয়। খেড় বা খড় দিয়ে ফ্রেম করা হয়। তারপর মাটি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এটা শুকালে আবার করেকদিন পর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এভাবে পুরু করা হয়। পরে মাথা মুখ দেওয়া হয়। মূর্তি হালকা রোদের সাথে বাতাসে শুকাতে হয়। পূজার আগে কাউকে মূর্তির মুখ দেখতে দেওয়া হয় না। মূর্তি তৈরির কারুকার্য মূলত একজন করে থাকেন। তবে অন্যরা যোগানদার হিসেবে কাজ করে। যেমন মাটি ছেনে দেওয়া, পানি আনা। মেয়েরা মাসিক হলে ও সময় মূর্তি তৈরির কাজে সাহায্যে করে না।

মাটির তৈরির কলস, গামলা (মালসা) চারি কুলা, কুইনো, ডাবল, ঝাঝর, ছাবনা খোলা, তাওয়া, ছাঁচ বানানো হয়।

মৃৎশিল্পীরা মৃৎশিল্প শেখার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যেতে হয় না। পরিবার থেকেই শিখেছে। বংশপরম্পরায় একাজ তাদের শেখা। বর্তমান আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে এ পেশা হারিয়ে যাচ্ছে। রাজবাড়ী জেলায় অনেক পরিবারে খবর নিয়ে জানা গেল তারা এখন আর এ কাজ করে না। অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হয়েছে। কেননা মৃৎশিল্পের কাজ করে কোনো আয় থাকে না।

## ৮. নকশি কাঁথা

রাজবাড়ী জেলার লোকজ ঐতিহ্যের মধ্যে নকশি কাঁথা উল্লেখযোগ্য। কেননা নকশি কাঁথার ব্যবহৃত লোকজ উপাদান যেমন নদ-নদী, পাখি, ফল, ফুল, নৌকা, ছাতা ইত্যাদি। নকশি কাঁথা সূচিশিল্পের মধ্যে পড়ে। এটি মেয়েলি শিল্পও। পল্লি বাংলার মহিলাদের প্রতিভা ও দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ এই নকশি কাঁথা।

নকশি কাঁথাকে রাজবাড়ী জেলার অঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় নকশা খেঁতা ফুলের খেঁতা, সাঁজের খেঁতা। কাঁথাকে কেউ খেঁতা, কেউ ক্যাঁথা বলে থাকেন।

উপকরণ : পুরাতন কাপড়, নতুন কাপড়. বিভিন্ন রঙের সুতা, কাটিমের সুতা, লোহা, খেজুরের কাটা, পাটি ইত্যাদি।

নকশি কাঁথার ব্যবহৃত সেলাই বা ফোঁড় : রাজবাড়ী জেলায় নকশি কাঁথার শিল্পীরা নকশি কাঁথায় কাঁথা সেলাই, ডাল সেলাই, ভরাট সেলাই, চেন সেলাই, ক্রস সেলাই, সোজনা সেলাই, পটল সেলাই, চেলা সেলাই ব্যবহার করে থাকেন।

প্রস্তুত প্রণালী : নকশি কাঁথা সেলাই করতে পুরাতন শাড়ি কাপড়, লেপের পুরাতন কাভার সুতির বড় ওড়না, বিছানার চাদর (পুরাতন) পুরাতন লুঙ্গি আধা পুরাতন শাড়ি কাপড়, গজ কাপড় নিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সমতল খোলামেলা জায়গায় পাটি পারে তার উপর আধা পুরাতন শাড়ি কাপড় বিছাতে হয়। বর্তমানে উপরের দু-পাশের কাপড় নতুন দেয়। গজ কাপড় কিনেও ব্যবহার করা হয়। এই কাপড়টা টান টান করে পারতে হয়, যাতে মাঝে কোনো ভাঁজ না থাকে। চার পাশে কোণায় ৮টা লোহা গাড়া হয়। লোহার পরিবর্তে অনেকেই খেজুর গাছের কাঁটা ব্যবহার করেন। এরপর ছেঁড়া, পুরাতন কাপড় অব্যবহার্য কাপড় আরেকটা দিতে হবে। এভাবে চারটা বা তিনটা দেওয়ার পর আধা পুরাতন বা নতুন কাপড় দিতে হয়। এভাবে ৪/৫ পত্ত বা পুরু করে লোহা দিয়ে টান করে চারপাশ মুড়ো মারতে হয়। তাপর ভেতরে জামিন দিতে হবে। জামিন দিতে হয় যাতে ভেতরে কাপড় ভাঁজ হয়ে না থাকে। বড় বড় ফোঁড় দিয়ে ফাঁকা ফাঁকা সেলাই দিতে হয়।

নকশি কাঁথাতে অনেকে আগেই নকশা আঁকিয়ে নেয়। নকশা হিসেবে থাকে জীবজন্তু, গাছপালা, জ্যামিতিক নকশা, প্রাত্যাহিক জীবনের চিত্রাবলি, পদ্ম, গোলাকার বা চক্রাকার বৃত্ত, ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির ফুল, পাতা, নদ, নদী, পাখি, সূর্য, চন্দ্র, তারা, নৌকা, ঢেঁকি, কুলা, পালতোলা নৌকা, গ্রামীণ জীবন যাপনের চিত্র ফুটে ওঠে পল্লি বধূর হাতের পরশে এই নকশি কাঁথায়। সুতা হিসেবে নকশি কাঁথাতে ব্যবহার করা হয় রেশমি সুতা, ওলের সুতা, বেনারশি সুতা, কাটিমের সুতা, গিঁটের সুতা। এই সুতাগুলো রাজবাড়ী সদর, কুমারখালী কুষ্টিয়া থেকে নেওয়া হয়। নকশি কাঁথার বিভিন্ন রঙের সুতা ব্যবহার করা হয়। যেমন লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপি, সবুজ, নীল, আকাশি, কালো, হালকা গোলাপি, ইত্যাদি। কাপড়ের রঙের সাথে সুতার রঙ ম্যাচিং করা হয়। তবে পাতার রং সব সময়ই সবুজ রঙের সুতা ব্যবহার করে। গোলাপ ফুলের পাপড়িতে গোলাপী রঙের সুতার ব্যবহার করে।

## ৯. ওয়ালমেট

বসত বাড়িতে বিভিন্ন সৌখিন আসবাবপত্রের পাশাপাশি দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে দেয়ালে ঝুলানো হয় বিভিন্ন ধরনের ওয়ালমেট। রাজবাড়ীর সৌন্দর্যপ্রিয় প্রত্যেক বাড়িতেই এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কাপরের তৈরি ওয়ালমেট, গমের ডাটা, সিগারেটের খোল, কটনবাট, দাঁত খিলানি, ডিমের খোসার ওয়ালমেট উল্লেখযোগ্য। গমের ডাটার তৈরি ওয়ালমেট: উপকরণ-গমের ডাটা, আটা, চুরি, কাপড়, কাট, লোহা।

প্রস্তুত প্রণালী : গমের ডাটা ধারানো ছুরি দিয়ে চাঁচতে হয়। চাঁচার ফলে মসৃণ হয়ে যায়। এগুলো সাইজ মতো কাটতে হয়। কাটার পরে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করতে হয়। এদিক কাঠের ৩/৪ হাত মাপের ফ্রেম বানাতে হয়। এই ফ্রেমের উপর এক রঙের কোনো নতুন পরিষ্কার কাপড় লোহা মেরে আটকাতে হয়। টান টান হতে হয়। তারপর গমের ঐ সাইজ করা ডাটা বসাতে হয়। আইকা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। আগে থেকেই কাপড়ে কোনো নকশা করা হয় না। বানানোর সময় ডিজাইন করা হয়। একটা ওয়ালমেট তৈরি করতে একদিনের মতো সময় লাগে। এক একটা ওয়ালমেট ৩০০/৩৫০ টাকা বিক্রি হয়। ডিজাইন হিসেবে নেওয়া হয় ফুল, গাছ, মসজিদ, মন্দির, তাজমহল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

### গিলিটর বা চুমকির তৈরি ওয়ালমেট

উপকরণ : চুমকি/গিলিটার, সুই-সুতা, কাপড়, লোহা, পেন্সিল/চক, ওয়াটার পেপার, কাঠ ইত্যাদি।

চুমকি বা গিলিটর দিয়ে ওয়ালমেট তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে কাঠের ফ্রেম বানিয়ে তারপর এক রঙের কাপড় লোহা দিয়ে আটকাতে হয়। এরপর পেন্সিল বা চক দিয়ে নকশা আঁকা হয়। আঁকা ডিজাইনের উপর চুমকি বসিয়ে সুই সুতা দিয়ে সেলাই করতে হয়। আর গিলিটার দিয়ে হলে ডিজাইনের উপর গিলিটার বসাতে হয়। রোদে শুকালে পাতলা ওয়াটার পেপার দিয়ে আবার মুরাতে হয়। ২/৩ দিন সময় লাগে একটা ওয়ালমেট তৈরি করতে। বাজারে ১৮০-২০০ টাকা এক একটা বিক্রি হয়।

### ডিমের খোসার ওয়ালমেট

উপকরণ-ডিমের খোসা, আটা, পেন্সিল/চক, ওয়াটার পেপার, কাপাড়, কাঠ, লোহা।

প্রস্তুত প্রণালী: ডিম ভাজি করলে ডিমের যে খোসা থাকে সেগুলো না ভেঙে পরিষ্কার করে রাখতে হয়। এভাবে ৮০/৯০ টা জমা হলে ছোট গোল গোল সাইজ মতো মাঝারি সাইজের টিপের মতো করে ভাঙতে হয়। এভাবে অনেকগুলো হয়ে গেলে তখন কাঠের ফ্রেম বানিয়ে তার উপর কাপড় দিতে হয়। এই কাপড় যাতে টান হয়ে থাকে সেজন্য লোহা মারতে হয় চার পাশে। এর পর ডিজাইন করতে হয়। এই ডিজাইনের উপর আঠার সাহায্যে ডিমের খোসা লাগাতে হয়। লাগানো শেষ হলে বাতাসে রেখে শুকাতে হয়। রোদে দিতে হয় না। এর পর ওয়াটার পেপার দিয়ে উপরটা আটকাতে হয়। যাতে কোনো আঘাতে খসে না পড়ে বা ধুলাবালি বা জমে। এই ওয়ালমেটে লোকজ চিত্র ফুটে ওঠে। এই ওয়ালমেট তৈরি করতে একটু বেশি সময় লাগে। কেননা ডিমের খোসা অনেক জমাতে হয়। সেগুলো পরিষ্কার করে শুকাতে হয়। ডিমের খোসা ভাঙার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। না হলে ছোট বড় হবে অথবা সব ভেঙে যাবে।

### দাঁত খিলানি দিয়ে তৈরি য়োলমেট

উপকরণ : দাঁত খিলানি, আঠা, দুই কোটা কাপড় কাঠ, লোহা, ওয়াটার পেপার।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে কাঠের ফ্রেম তৈরি করতে হবে। ফ্রেমের উপর এক রঙের কাপড় আটকাটে হবে। এটি কোনো ডিজাইন করতে হয় না। বানানোর সময় ডিজাইন করা হয়। কাঠি দিয়ে আঠা নিয়ে কাপড়ে লাগিয়ে সেখানে দাঁত খিলানি লাগায়। তাহলে লেগে থাকবে। এভাবে উপস্থিত ডিজাইনে এনে দাঁত খিলানি বসিয়ে করা হয়। ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যেই একটা ওয়ালমেট হয়ে যায়। বাতাসে শুকানোর পর ওয়াটার পেপার দিয়ে ঢেকে আটকাতে হয়। এই ওয়ালমেট ২৫০/৩০০ টাকায় বাজারে বিক্রি হয়।

### কটনবাটে তৈরি ওয়ালমেট

দাঁত খিলানি দিয়ে যেভাবে তৈরি করা হয় কটনবাট দিয়েও সেভাবে তৈরি হয়।

উপকরণ : কটনবাট, আঠা, কাপড় লোহা, কাঠ, ওয়াটার পেপার ইত্যাদি।

www.pathagar.com

প্রস্তুত প্রণালী : কাঠের ফ্রেম তৈরি করতে হয়। ফ্রেমের উপর এক রঙের কালো অথবা খয়েরি কাপড় হলে ভালো হয়। লোহার সাহায্যে ফ্রেমের উপর আটকিয়ে টান করতে হয়। এরপর আঠার সাহায্যে কটনবাট লাগাতে হয়। লাগানোর সময় ডিজাইন করা হয়। এই ওয়ালমেট তৈরিতে বেশি সময় লাগে না। দিনে ২/৩ টা ও তৈরি করা যায়। কটনবাট লাগানোর পর ওয়াটার পেপার দিয়ে মুড়াতে হয়। বাজারে ২৫০/২৮০ টাকা বিক্রি হয়।

**সুতার তৈরি ওয়ারমেট**

উপকরণ : সুতা, সুই, কাঠ, লোহা, ওয়াটার পেপার।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে এক রঙের কাপড়ের উপর কলম/পেন্সিল/চক দিয়ে ডিজাইন আঁকা হয়। ডিজাইন অনুযায়ী সুই সুতা দিয়ে সেলাই করতে হয়। ডিজাইন হিসেবে দুটো পাখি, টবের ভিতর ছোট গাছ গোলাপ, মসজিদ, মন্দির, তাজমহল বিভিন্ন ধরনের উক্তি/বাণী, শহিদ মিনার আঁকা হয়।

কাপড়ের রঙের সাথে মিল করে সুতার রং মিলানো হয়। তবে লাল সবুজ, গোলাপি, হলুদ, কালো, নীল রঙের সুতা বেশি ব্যবহার হয়। এই সুতাগুলো কাটিমের রেশমি, বেলারশি, উলের সুতা, পশমি সুতা, গিটের মুতা ব্যবহার করা হয়। সেলাই হিসেবে ভরাট গিঁটসুতা, চেন সেলাই কাথা ফোঁড়, ঢাল সেলাই ক্রস সেরাই, পটল সেলাই, চেলা সেলাই, সঁজনে সেলাই করে থাকে।

সেলাই হওয়ার পর কাঠের ফ্রেমে এই কাপড়টা লোহা দিয়ে টান করে আটকাতে হয়। তারপর ওয়াটার পেপার দিয়ে ঢাকতে হবে। একটা ওয়ালমেট তৈরি করতে ১০/১৫ দিন সময় লাগে। সুতার তৈরি ওয়ালমেট তৈরিতে যে সকল ছন্দ ব্যবহার করা হয়।

মায়ের দোয়া,
মরনের পর সকলি ভুলিবে,
ভুলিবে বন্ধু রায় সকলে ভুলিবে
ভুলিবে না শুধু মায়।
আমি যদি চলে যাই জীবনের তরে।
স্মৃতি রেখে দিও কোমারই অন্তরে।

www.pathagar.com

# লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদেরও পরিবর্তন এসেছে। তবে এমন এক সময় ছিল যখন পুরো দেশটাই ছিল গ্রাম। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু মুসলিম উভয়ের পরিধেয় বস্ত্র ছিল প্রায় একই ধরনের। সাধারণ মানুষেরা ধুতিই ব্যবহার করতেন। পাশাপাশি ব্যবহার করতেন লুঙ্গি। তবে বর্তমানে ধুতি কেবল হিন্দু সমাজেই প্রচলিত। তাও আবার বিশেষ দিন বা দিবস উপলক্ষে পরা হয়। কৃষক যখন মাঠে কাজ করেন তখন তাদের পরনে থাকে লুঙ্গি। আর কোমরে বা ঘাড়ে থাকে গামছা। কৃষক বধূরা সাধারণত শাড়িই পরে থাকেন।

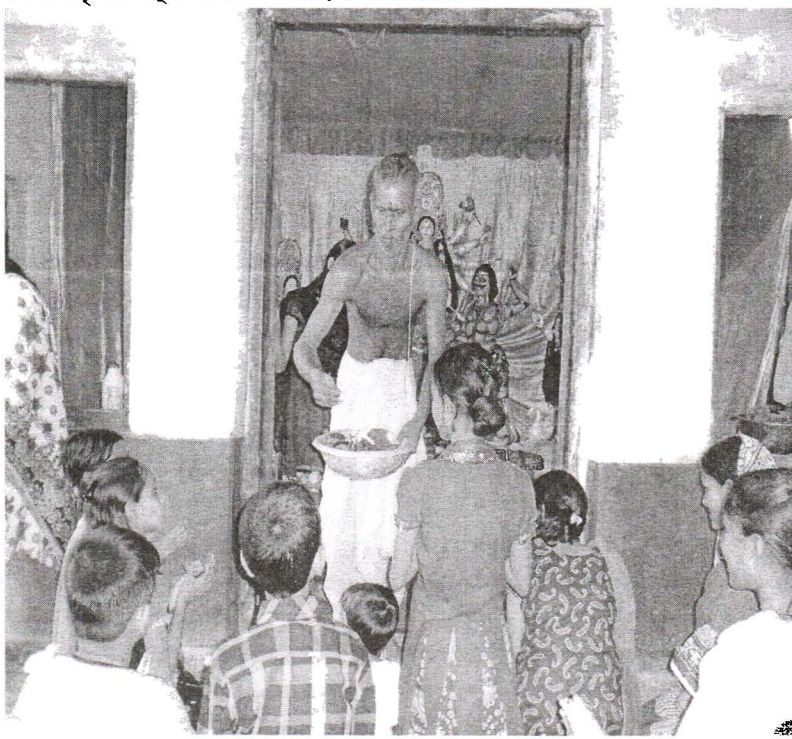

ধুতি পরিহিত পুরোহিত শিশুদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করছেন

www.pathagar.com

তবে নগরজীবনে লোকপোশাকের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। শাড়ির পাশাপাশি সালোয়ার কামিজের ব্যবহার বেড়েছে। শাহরিক জীবন যাপনের ছোঁয়ায় গ্রামীণ জীবনেও পরিলক্ষিত। তাই গ্রামের সাধারণ মেয়েরাও ব্যবহার করছে সেলোয়ার কামিজ।

ঈদ উৎসব ও অন্যান্য উৎসবে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পাজামা-পাঞ্জাবি ব্যবহার করেন। আচার উৎসব পালনকালে পুরোহিত ঠাকুররা ধুতি ব্যবহার করেন। তাদের গা তখন খালি থাকে। কোনো আচার অনুষ্ঠান ছাড়াই গ্রামের ছেলেরা বর্তমানে শার্ট ও টি-শার্ট পরায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। চেক শার্ট, চেক শাড়ির প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ এখনও প্রবল।

www.pathagar.com

# লোকস্থাপত্য

## ১. চারচালা/দোচালা ঘর

বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের বিশেষ করে রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলায় বেশিরভাগ ঘর টিন, কাঠ ও বাঁশ প্রভৃতির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। ঘরগুলো সাধারণত চৌচালা (চার চালা) ও দো-চালা করে করা হয়। ঘরের ভিত্তি মাটি দিয়ে নির্মাণ করা হয়। তবে বর্তমানে বেশিরভাগই চারপাশের ডোয়াগুলো ও মেঝে ইট দিয়ে পাকা করা হয়ে থাকে। বাঁশ, কাঠ, তালগাছ এবং আরসিসি খুঁটি ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও পাকা দেয়ালের উপর টিনের চাল তৈরি করা হয়। ঘরে আড়া, পাইড়, দোড়, বাটাম প্রভৃতি মূলত কাঠ, স্থান বিশেষে বাঁশ বা লোহার পাতও ব্যবহার করা হয়। টিন বা মূলিবাঁশের তৈরি বেড়া ব্যবহার করা হয়। দরজা, জানালার পাল্লা টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। জানালায় লোহার শিক ও গ্রিল ব্যবহার করা হয়। ঘর একতলা ও দো-তলা বিশিষ্ট হয়। পাকা ডোয়ার উপর লোহার ক্লামের সাথে খুঁটি সংযুক্ত করা হয়। আবার কখনও মাটিতে পুঁতে দাঁড় করানো হয়।

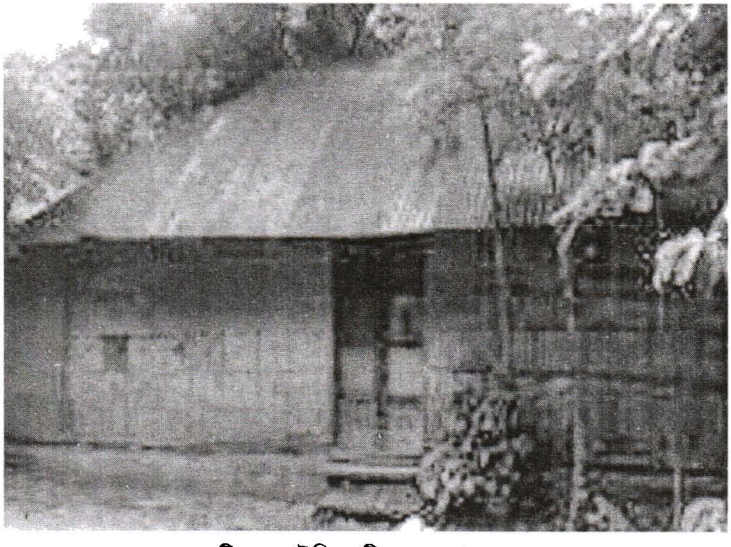

টিনের ছাউনি ও টিনের বেড়ার ঘর

www.pathagar.com

## ২. খড়/ছনের ঘর

রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন এলাকায় খড় বা ছনের তৈরি ঘর দেখা যায়। মাটি দিয়ে ডোয়া ও মেঝে তৈরি করা হয়। বাঁশের খুঁটির উপর বাঁশের রুয়া, ফুরসি ও আঠন দিয়ে প্রথমে চালের কাঠামো নির্মাণ করা হয়। পরে স্তরে স্তরে ছন দিয়ে চাল আবৃত করে দেয়া হয় ছনগুলো। ছনগুলো লম্বা বাঁশের চটি দিয়ে চিকন পাটের বা নারিকেলের সুতলির সাহায্যে চাপা বেঁধে দেয়া হয়। এই চটিগুলোকে ছাটন বলা হয়। চালের উপর এক বা দুজন ছনগুলোকে বিন্যস্ত করে ছাঁটন দিয়ে বাঁধে। চালের নিচ থেকে অন্য একজন সহযোগি 'শামাজি' দ্বারা সুতলিগুলো চাল ভেদ করে নিচ থেকে উপরের লোকদের হাতে পৌঁছে দেয়। 'শামাজি' বাঁশের তৈরি এক ধরনের 'চটা' যার মাথায় একটি ছোট ছিদ্র থাকে এবং মাথাটি বল্লম বা শরকির মত সরু। উক্ত ছিদ্রর ভেতর চালের উপরে অবস্থানরত দুজনের একজন সুতলি ঢুকিয়ে দেয়।

যারা ঘর তৈরির কাজ করেন তাদের ঘরামি বলা হয়। অনেক সময় সৌখিন ব্যক্তিরা চালের উপর খেজুরের পাতার নকশি পাটি বিছিয়ে তার উপর ছন দিয়ে চাল তৈরি করেন। ছনের তৈরি ঘরগুলি দো-চালা ও চৌ-চালাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। একই পদ্ধতিতে ছনের পরিবর্তে পাটকাঠি বা আখের পাতা ব্যবহার করা হয়।

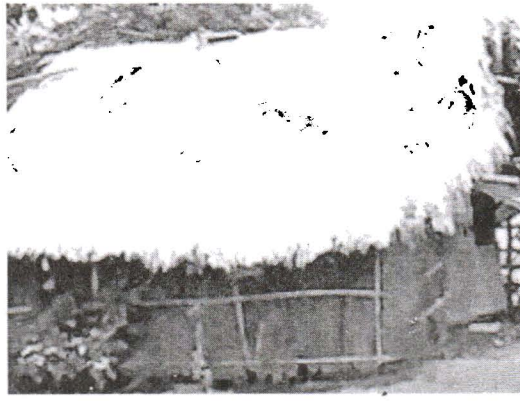

খড়ের ঘর

www.pathagar.com

# লোকসংগীত

রাজবাড়ী জেলাধীন প্রায় সব কটি উপজেলা তথা এতদ্‌অঞ্চলের প্রধান প্রধান লোকসংগীত বা আঞ্চলিক সংগীতগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। যে গানগুলোর পরিবেশনা এখন আর নেই বললেই চলে। চল্লিশ পঞ্চাশ বা তারও পূর্ব থেকে অর্থাৎ বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে এসব গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যা ঊনবিংশ শতাব্দির ষাট বা সত্তরের দশক থেকে বিলীন হবার পথে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবর্তনের ফলে এসব গান আর তার পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে পারছে না। তবে এখনো সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি।

এসব গানের মধ্যে রয়েছে জাগ গান, বারাসে গান, ধুয়া গান, অষ্টক গান, মুর্শিদি গান বা গাছা ওঠার গান, নৌকা বাইচের গান বা সারি গান, মেয়েলি গীত ইত্যাদি। অষ্টক গান, জাগগান, মুর্শিদি বা গাছা ওঠার গানগুলো পরিবেশনার ক্ষেত্রে সামান্য বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা বা আনুষ্ঠানিকতা পরিলক্ষিত হয়। বাদবাকি গানগুলো পরিবেশনের তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এসব গান মানুষের মুখে মুখে হরহামেশাই শোনা যায়।

বর্তমানে এসব গান ব্যাপকভাবে খুব একটা বেশি শোনা যায় না। এসব গান বিলীনের পথে। এসব গান সংগ্রহ করা বড়ই দুঃসাধ্য। এত বিপত্তির মধ্যেও কিছু গান সংগ্রহ করা গেছে।

## ১. জাগ গান

জাগ গান গাওয়া হয় সাধারণত পৌষ মাসে। মাসব্যাপী রাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জাগ গানের আট দশজনের দল পরিবেশন করে 'পুষুরার ছিন্ন' করার জন্যে চাল ডাল তোলা হয়। জাগ গানগুলো ছোট বড় নানারূপ সাধারণ ঘটনা বা প্রেম কাহিনি সম্বলিত। সত্য ঘটনা এবং রূপকথার কাহিনি নিয়ে রচিত গানগুলো। যার কোনো রচয়িতার নাম নেই। তাছাড়া এ গান পরিবেশনে কোনো বিশেষ পোশাক বা বাদ্যযন্ত্র লাগে না।

**ক. সোনাহারের কিচ্ছা : (রূপকথার কাহিনি)**

এক দিবসে সোনাহার নল কাটিবার যায়
নল কাটিবার যায়া সোনাহার ডানি বাঁয়ে চায়
ওরে ডানি বাঁয়ে চায়া সোনাহার শুয়্যা নিদ্রা যায়
হারে দেবপুরীর এক কন্যা আইস্যা বাও দিল তার গায়।

www.pathagar.com

ওরে একদিন তার বাও দিতে হয়াছিল ভুল
ওরে তোমার আমার হবে বিয়া লাগবি একটা ফুল
হারে যাও যাও যাও যাওরে মালি ফুলের লাগিয়া
হারে আইনলো ওরে গ্যাঁদা ফুল ডালা না ভরিয়া
ওরে সেও ফুলেতে হইলো নারে সোনাহারের বিয়া
ওরে যাও যাও যাও যাওরে মালি ফ লের লাগিয়া
হারে আইনলো ওরে কুসুম ফুল সাজি ভরিয়া
ওরে সেও ফুলেতে হইলো নারে সোনাহারের বিয়া।
হারে যাও যাও যাও যাওরে মালি ফুলের লাগিয়া
ওরে আইনলো ওরে জবা ফুল কুলা ভরিয়া
ওরে সেও ফুলেতে হইলো নারে সোনাহারের বিয়া।
ওরে রাখালগণে আইনলো ফুল নড়ির আগাল দিয়া
ওরে সেই ফুলেতে হয়া গেল সোনাহারের বিয়া
ওরে সোনাহার বিয়া কইরলো ব্যাবার পাইলো কী
হারে থালা পাইছি ঘটি পাইছি আর পাবো কী
ওরে দশ নম্বইর‍্যা ফাইন ধুতি ব্যাবার পায়াছি।
ওরে শোন শোন দোহারগণ কারবা পানে চাও
হারে এই বাড়িথ্যা মাঙন নিয়্যা আরাক বাড়ি যাও।

**খ. নন্দ ঘোষ ও গোপালের কিচ্ছা**

রে মা দয়া নাইরে তোর
মা হইয়া বেটার কেনে বল লনী চোর।
নন্দ যায় বাতানে মায়ে যশোদা যায় ঘাটে
শূন্য গৃহ পায়া গোপাল সকল লনী লোটে ॥
ছড়ি হাতে নন্দরানি যায় গোপালের পিছে
লাফ দিয়া উঠিল গোপাল কদম্বেরই গাছে।
পাতায় পাতায় ফেরে গোপাল ডালে না দেয় পাও
তাই দেখিয়া নন্দরানির ডরে কাঁপে গাও।
নামো নামো ওরে গোপাল পাইড়্যা দিতে ফুল
ডাল ভাঙ্গিয়া পইড়্যা গোপাল হারাবি দুই কূল ॥
এক সত্য কর মারে দুইও সত্য কর
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো
ঐ কথা কি হয়রে গোপাল এ কথা কি হয়
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা সর্বলোকে কয়
ফাঁকি ঝুকি দিয়া মায়ে গোপালকে নামাইল
গাই বাঁধা রশি দিয়া গোপালকে বাঁধিল
কিবা বান্নন বাঁধিলিরে মা, বান্নন পইরলো মোড়া

www.pathagar.com

বান্ননের তাপে আমার ছুইটলো হাড়ের জোড়া ॥
কিবা বান্নন বাঁধিলিরে মা বান্নন পইরলো কইযে
বান্ননের তাপে মাগো লহু চইল্লো ভেইসে।
ঐ কথা শুনিয়া রানির দয়া হইল মনে
গাভী বাঁধা রশি খুলে গোপাল নিল কোলে ॥
আমি তো খাই নাই মা ননী পখাইছে বলাই দাদা
আমি যদি খাতাম ননী থাকতো আধা আধা ॥
আসুক আগে নন্দ বাড়ি বেইচ্যা ফেলাই ধেনু
নগরে মাগিয়া খাবো কোলে নিয়্যা কানু ॥
নগরে মাগিয়া খাইলে জাইত তো যাবে না
নগরের লোকে বলে ওলো কানাইর মা।

**গ. মহিন বাবুর কিচ্ছা**

পূব্বকালে মহিন বাবুর বাহডোংকা ছিল
ওরে বিধব্যা লোকের ছেলে মাইর‍্যা ঘরে কপাট দিল।
মহিন বাবু ছান করে সানবান্ধা ঘাটে
অচুম্বিতি দুই ছর রাশি রশি দিল হাতে।
হাতে লাগায় হাত কড়া পায় লাগালো বেড়ি
মহিন বাবুর নয়া চইল্লো ফইর‍্যাতপুরীর বাড়ি।
ফল্যাতপুরীর বাড়ি নারে হাইকোটের কাচারি।
মহিন বাবুর মায় কান্দে হাতে নিয়া লোটা
আর বুঝি আইলো নারে আমার ভাজন বেটা।
মহিন বাবুর বউ কান্দে পইড়্যা পাটের শাড়ি
আর বুঝি আইলনা স্বামী পাথর বাঁধা বাড়ি।
মহিন বাবু বুন কান্দে হাতে নিয়া রাই
আর বুঝি আইলনারে আমার জোরের ভাই
মহিন বাবুর ছেলে কান্দে ইস্কুলে বসিয়া
আর বুঝি আইলনা বাবা দোয়াত কলম লিয়া
মায় কান্দে মাইল্যানী কান্দে কান্দে পাড়ার লোক
মহিন বাবুর বিছনায় কান্দে দোনালা বন্দুক।
মহিন বাবু কাইন্দা বলে ললিত বাবু ভাই
গাড়ি ভইর‍্যা আনো টাকা খালাস হয়া যাই।
গাড়ি ভইর‍্যা আইনলো টাকা বইগ্‌ন্যা ভইর‍্যা দিল
সেও টাকায় মহিন বাবুর খালাস নারে হইল।
খোপে কান্দে খোপ কইত্যারী পানিতে কান্দে হাঁস
আইজ বুঝি হইয়া গেল মহিন বাবুর ফাঁস।

www.pathagar.com

## ২. বারমাসি গান বা বারাসে গান বা রাখালি

বারমাসী গান বা বারাসে গান সাধারণত ফসলের মাঠে গাওয়া হয়। এর আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ক্ষেত নিড়ানো, ধান, পাট কাটার সময় রাজবাড়ীর ক্ষেতে খামারে গাওয়া হয়। কৃষকেরা একসাথে সমস্বরে এই গান গেয়ে থাকেন।

ক.

ও তুই কি ন্যা জুঞ্জাল করলি
বনের বাওইরে।
ও বনের বাওইরে–
ধান খায়াচ্ছো পান খায়াচ্ছো
দাঁত কইর‍্যাছো সোলা
ওরে দাঁতের উপ্যারে মানিক জ্বলেরে
গলায় মোহন মালা
বনের বাওইরে।
ও বনের বাওইরে–
ওপারকার পরাঙ্গি ধান
টিক্যায় কাইট্যা নিল
প্রাণ বন্ধুর আগে কইও খবর
আমার যৈবন বয়া গেল
বনের বাওইরে।

ও বনের বাওইরে
ঝাঁকে ওড়ে ঝাঁকের পড়ে
তারে বলে ছড়া
মুই নারী গাইরেস্তের বউরে
পিরিতিরই মরা
বনের বাওইরে ॥

খ.

বক ধলা বোগিলা ধলারে
ধলা বগার পাখা
তাহার চাইতে অধিকরে ধলা
ওইনা রাধার হস্তের শাখারে
নাগর বন্ধু হে ॥

মেঘ কালো ভোমরা কালোরে
কালো চোখের মনি

www.pathagar.com

তাহার চাইতে অধিক কালোরে
নাগর বন্ধু হে ॥

রাইও চিকন সইরষা চিকনরে
আরও চিকনরে বালি
তাহার চাইতে অধিক চিকনরে
ওইনা রাধার পরনের শাড়িরে
নাগর বন্ধু হে ॥

নিমও তিতা মিস্‌না তিতারে
তিতা পানের খর
তাহার চাইতে অধিক তিতারে
ওইনা দুই সতীনের ঘররে
নাগর বন্ধু হে ॥

দইও মিঠা দুগ্ধ মিঠারে
আরও মিঠারে ঘোল
তাহার চাইতে অধিক মিঠারে
ওইনা যুবক নারীর কোলরে
নাগর বন্ধু হে ॥

গ.
জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসেতে
ইন্দ্র বহেরে ধারে
পড়িল হস্তের কলম
হরে মাধব তুলে দেও মোর হস্তেরে ॥

একবারও তুমি কলমরে দুইও বারও হইল
তিনও বারও কালেরে মালা
ওরে মালা সত্য করাল কর ॥

কিবা সত্য মানুষ আমিরে
কিবা সত্যরে জানি
এইনা সত্য কররে মালা
ওরে মালা আমি তুমার স্বামী ॥

ঘ.
ফাল্গুন মাসে রইদের জ্বালা
চৈত্র মাসে শরীল কালারে
বৈশাখ মাসও গেলনি নারীর বৈশাখে হারে বৈশাখে ॥

www.pathagar.com

জৈষ্ঠ্য মাসে মিষ্ট ফল আষাঢ় মাসে নতুন জলরে
ও গেলরে নায়ারে নায়ারে হারে নায়ারে।
ভদ্দর মাসে তালের পিঠ্যা
আশ্বিন মাসে শসা মিঠ্যারে
কার্তিক মাসও গেল নারীর কাতরে কাতরে হারে কাতরে ॥

অগ্রাণ মাসে নতুন ফানা
পৌষও মাসে নায়ার মানারে
মাঘও মাসও গেল নারীর শীতবুকে শীতবুকে হারে শীতবুকে ॥

ঙ.
কুহু কুহু সুর ধরিয়া
আর ডাকিস না কোকিলরে
তোর ডাকে প্রাণ রয় না ঘরে
প্রাণে ধৈর্য মানে না ॥

বিয়্যার রাইতে মোমের বাতি
মদিনাতেই নিভিল
বলরে কোকিল প্রাণ পতি মোর
কীভাবে প্রাণ তেজিল ॥

আগে যদি জানতাম আমি
নারীর জনম লইতাম না
বিয়্যার রাইতে পতি মইল
স্বামীর মুখ আর দেখলাম না ॥

চ.
বন্ধু দিল ঘষা পয়সাহে
ও পয়সা হাট বাজারে চলে না
কী হালে দিন যাবে আমার
ভাবনাতে গুম আসে না ॥
পোটল ভাজা খাইতে না মজা হে
ও বন্ধু শাক ভাজা আর খাইলা না
বিদেশেতে রইলা প্রাণের বন্ধু
দ্যাশে তো আর আইলা না ॥

বন্ধুর বাড়ি দালান না কোঠা হে
আমার বাড়ি খেইড়্যা ঘর
স্বামীরে তোর পায়ে ধরি
আমার বন্ধুর মতো দালান কর ॥

www.pathagar.com

টাকা লাগুক পয়সানা লাগুক হে
আমার বন্ধুর কাছথ্যা কর্জ কর
আইন দেইখ্যা খত লেখির
আমি হবো খতের জামিনদার ॥

ছ.
নীল্যা নীল্যা বাতাস খানিরে
ধুল্যায় ওড়েরে বাও
আইজ বড় সংকট দেহিরে
ফিল্যা যাও ও ঘরেরে নাগর বন্ধুহে ॥

আইজ যদি যাইও ফিল্যারে
না আসিবরে আর
তোর সনে যে কয়ও কথারে
গাধা হয় তার বাপওরে নাগর বন্ধুহে ॥

ঘুমায় ঘুমায় কোলের ছেলেরে
চাদর দেবে তোর গায়
বিদ্যাশি পরানের বন্ধুরে
আইজ বেজার হইয়া যায় ওরে নাগর বন্ধুহে ॥

পুরুষের জাইত নিষ্ঠুর জাইত ওরে
কথার বোঝেরে আধা
কিনা ছাতার মধুর জন্যেরে
বাপের বানায় গাধারে নাগর বন্ধুহে ॥
গারু (বদনা) হাতে গামছা মাথেরে
বিন্দে কদম তলেরে যায়
কোথায় রইলা প্রাণের বন্ধুরে
মধু খাও আসিয়ারে নাগর বন্ধুহে ॥

আস্তে ধীরে খাইও মধুরে
মস্তক না হয়রে খালি
তোমার দ্যাশের শোকে বলবে রে
পুরুষ বধি নারীতে নাগর বন্ধুহে ॥

জ.
বেলা গেল সন্ধ্যা হলোরে
গৃহে লাগওরে বাতি
রান্ধিয়া বাড়িয়ারে অন্ন

www.pathagar.com

জাগবো কত রাতিরে
রাইত তুই যারে পোহাইয়ে ॥

রাইত হইল একও পহররে
বেড়ানে দিছ্যাওরে মন
আমি নারী অভাগিনী
জাগবো কতক্ষণ ওরে
রাইত তুই যারে পোহাইয়ে ॥

রাইত হইল দুইও পহররে
ডালে ডাকেরে চুয়্যা
ফুল শয্যায় বসিয়া রাধে
কাটে চেকন গুয়্যারে ॥

রাইত হইল তিন পহররে
ঘামে সর্বরে গাও
কুইলে দেও মন্দিরের কপাটরে
লাগুক শীতল বাওরে ॥

রাইত হইল চাইর পহররে
পুবে উদয়রে ভানু
রাধিকারও অঞ্চল ধইরে
বিদায় মাঙ্গে কানুরে ॥

ঝ.
নীল্যা না বন্ধুরে
ও নারে নীল্যা নতুন ছোপের কোরলরে।
নীল্যার ধোপ কাপড়ে লাইগলো
কালির মইন্যামরে ॥

সেইন্যা কালির মইল্যামরে
ও নারে নীল্যা সাবানে যে ওঠেরে
নীল্যার মনের কালী না ওঠে সাবানেরে ॥

ছোপের বাঁশ কাটিয়ারে
ওনারে সাধু গাঙে দিছ্যাত বানাবে
তুমি আরও ছয় মাস থাকো নীল্যা নীল্যা
নীল্যা মন্দির ঘরেরে ॥

ষোলো ডিঙা পানসিরে
ওনারে নীল্যা ঘাটে বান্ধা রইলরে

www.pathagar.com

আমার দাড়ি মাল্লা বইস্যা
বইস্যা ধরমা (টাকা) নেয়ওরে ॥

আমার ছোট বোনওরে
ওনারে নীল্যা তোমার হয় ননদীরে
তারে লয়ে থাকো মন্দির ঘরেরে ॥

তোমার ছোট বোনওরে
ওনারে সাধু আমার হয় ননদীরে
আমি তারে লয়ে কেমনে
কেমনে থাকবো ঘরেরে ॥

আমার ছোট ভাইওরে ওনারে নীল্যা তোমার হয় দাওররে
তুমি তারে লয়ে থাকো থাকো মন্দির ঘরেরে
তোমার ছোট ভাই ওরে ওনারে সাধু
আমার হয় দেওর ওরে
ওসে দেওর হয়ে খাবে– খাবে নীলার বাটার পানওরে ॥

ঞ.
কোঁড়া শিক্যারী বিহ্যাদরে
মাইরো না মাইরো না বিহ্যাদরে
ওরে বাসায় আছে দুগ্ধের বাচ্চারে
ওরে কি হবে তার উপ্যায়রে
বিহ্যাদ মাইরো না ॥

আর আগে যদি জানতামরে বিহ্যাদ
শর চালাবি ডালে
ওরে টের পাইলে উড়্যালরে দিতাম
না বসতাম আর ডালেরে
বিহ্যাদ মাইরো না ॥

মাছে চেনে গভীর জলরে
পক্ষী চেনেরে ডাল
মায়জানে সেন বিটারে দরদ
যার বুকের ধন ওরে
বিহ্যাদ মাইরো নারে ॥

এপার নদী ওপাররে নদী
মধ্যে বালুর চর
ওরে মায় জানে সেন বিটারে দরদ

www.pathagar.com

যার বুকেরই ধন ওরে
বিহ্যাদ মাইরো নারে ॥

ট.

সুন্দার কানাইরে
কি ক্ষ্যান্তে বাড়ালাম পাও
খেওয়া ঘাটে আমার নাইকো নাও
ঘাটের পাটুনিরে খাইছেরে বনের বাঘে
কি সুন্দার কানাইরে ॥

সুন্দার কানাইরে
পার কইর‍্যা দেও কংস নদী
নষ্ট হইল আমার ঘৃত দধি
ওরে মথুরার বাজার গেল বয়া
কি সুন্দার কানাইরে ॥

সুন্দার কানাইরে
যে মোরে করিবে পার
তারে দেব আমার গলার হার
সাধের এরূপ যৈবন তারে করব দান
কি সুন্দার কানাইরে ॥

ঠ.

সুন্দার কানাইরে
আম্বু গাছে জাম্বু ফল
গুয়্যা গাছে নারক্যাল
তাল গাছে শুঁয়া পাখি ডাকেরে
সুন্দার কানাইরে ॥

পাড়না পড়শী কয়
মনের দুঃখে মইর‍্যা যাই
কার কাছে পাঠাবো পান গুয়্যা
কি সুন্দার কানাইরে ॥

সুন্দার কানাইরে
পুষ্কুনীর পাড় দিয়া
গান কইর‍্যা যায়
ঘরে আছে ননদিনি শাম
বাইরাম বাইরাম করে আমার প্রাণ
কি সুন্দার কানাইরে ॥

www.pathagar.com

এহেতে নাগরি
পড়নে তার ঘাগরি
পিত্যালা কলসীর ভরে
হালকা মাঞ্জা হেলিয়া পড়ে
ছোকড়া বন্ধু খাড়ায়া দ্যাখে
কি সুন্দার কানাইরে ॥

এক বন্ধু হাইল্যা
আরক বন্ধু জাইল্যা
আরাক বন্ধু দমের বৈঠ্যা বায়
তিন ভায়রা এক যুক্তি কইর‍্যা
উঠলো একই নায়
কি সুন্দার কানাইরে ॥

ড.
দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াওরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ দেখি চন্দ্র মুখ
ওরে তোমার চন্দ্র মুখও দেইখ্যারে
ও আমার দূরে রাখি দুখরে
কৃষ্ণ দাঁড়াও–দাঁড়াও হে ॥

ওপারকার কদমের গাছটিরে
লম্বা ছাড়ে কুশি
আমি খালাম না ছুলাম না হলাম
মিছ্যা দোষের দুষিরে
কৃষ্ণ দাঁড়াও– দাঁড়াও হে ॥

ওপার বইস্যা বাজাওরে বাঁশি
এপার বইস্যা শুনি
ওরে কেমন কইর‍্যা হবো পাররে
ও আমার কোলে যাদু মনিরে
কৃষ্ণ দাঁড়াও– দাঁড়াও হে ॥

ওপারকার নারক্যাল গাছটিরে
নারক্যাল পাইক্যা হইল ঝুইন্যা
ওই না সোনা মুহে দিতে চুইম্যারে
আমার ভাইংলো নথের গুইন্যারে
কৃষ্ণ দাঁড়াও- দাঁড়াও হে ॥

www.pathagar.com

ঢ.
ও বন্ধু বন্ধুরে
বন্ধু আমার বাচা মাছের ঠোঁট
ওরে ছয়মাস ধইর‍্যা গিছে বন্ধুরে
বন্ধুর নাই খবররে
ও বন্ধু বন্ধুরে ॥

ও সাধের হুক্কা হুক্কারে
তোর নইচ্যা কেনে বেঁকা
ছোকড়া বন্ধু খায় তামুকরে
কইলক্যার নাই ছ্যাঁদা
ও বন্ধু বন্ধুরে ॥

ও দালান কুঠা লাইখ্যায়া ভাঙবো
আমার বন্ধুর বাড়ির কুইড়্যা
ওই আমার ভালো।

ও পাটের শাড়ি
দুই হস্তে ছিঁড়িব
আমার বন্ধুর বাড়ির ছিঁড়া ত্যানারে
ওই আমার ভালো
ও বন্ধু বন্ধুরে ॥

ও থালি বাসনরে
তোরে যমুনায় ডুব্যাবো
আমার বন্ধুর বাড়ির মাইট্যা খুরারে
ওই আমার ভাল
ও বন্ধু বন্ধুরে ॥

## ৩. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত সাধারণত বিয়ে অনুষ্ঠান, সুন্নতে খাতনা, গায়ে হলুদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। গ্রাম্য নারীরা দল বেঁধে গোল হয়ে বসে সুর করে গীত পরিবেশন করেন। এতে কোনো সা গোজ বা বাদ্যবাজনা থাকে না।

ক.
কুটিক ভাত নাদোলো চলন্ত বালি লো
ও আমি খায়া যাবো হাটে নারে
ও আমি খায়া যাবো মাঠে নারে ॥

www.pathagar.com

ভাত নাইদব্যার পারবো না মনোহরি রাজারে
তুমি কর দোষর বিয়া নারে
তুমি কর দোষর শাদী নারে ॥
একো থালের ভাতলো চলন্ত বালি লো
তোমার হবে দুইও থালো নারে
একো মাথার তেল ওলো চলন্ত বালি লো
তোমার হবে দুইও মাথা নারে।
একো পরনের কাপড়লো চলন্ত বালি লো
তোমার হবে দুইও পরনে নারে
একো হাতের চুড়িলো চলন্ত বালি লো
তোমার হবে দুইও হাতও কি নারে।
একো গলার হারওলো চলন্ত বালি লো
তোমার হবে দুইও গলা নারে।
একো ঘরের বিছনালো চলন্ত বালি লো
তোমার হবে দুইও বিছনা নারে।
একো সোয়ামীর সোহাগলো চলন্ত বালি লো
তোমার হবে দুইও সোহাগ নারে ॥

খ.
পৌষ মাইস্যা শিভ্যালী
মাঘ মাইস্যা শিঙ্যালী
কত পানি ঢালো যাদুর গায়
কত পানি ঢালো সাধুর গায় ॥

বাইর হ লো সাধুর মা
সাধুর তবোন নয়া না লো
বাইর হ লো সাধুর বুন
সাধুর গামছা নয়া না লো।
বাইর হ লো সাধুর মামী
সাধুর গুঞ্জি নয়া না লো ॥

বাইর হলো সাধুর চাচি
সাধুর জামা নয়া না লো।
বাইর হ লো সাধুর খালা
সাধুর টুপি নয়া না লো ॥

বাইর হলো সাধুর নানি
সাধুর জুইত্যা নয়া না লো।

www.pathagar.com

বাইর হ লো সাধুর দাদি
সাধুর রুমাল নয়া না লো ॥

গ.
খাটো খাটো বাগুনির গাছটি লো
চেরন চেরন ধারের পাতা রে
তারির তলে গোছল না করেরে
চ্যাংড়া–চ্যাংড়া বয়েসের দামাদ রে।
দামাদ যাবি বিয়া না কইরব্যার রে
নাইকো–নাইকো দামাদের জামারে।
দামাদের হাসুরীর বন্ধক না থুইয়্যা
কেনবো–কেনবো দামাদের জামা নারে ॥
দামাদ যাবি বিয়া না কইরব্যাররে
নাইকো দামাদের জুইত্যারে
দামাদের খালা হাসুরীর বন্ধক না থুইয়্যা
কেনবো–কেনবো দামাদের জুইত্যা নারে ॥
দামাদ যাবি বিয়া না কইরব্যাররে
নাইকো দামাদের টুপিরে
দামাদের মামি হাসুরীর বন্ধক না থুইয়্যা
কেনবো–কেনবো দামাদের টুপি নারে ॥
দামাদ যাবি বিয়া কইরব্যার
নাইকো দামাদের ঘড়ি রে
দামাদের চাচি হাসুবীর বন্ধক না থুইয়্যা
কেনবো-কেনবো দামাদের ঘড়ি নারে ॥

ঘ.
ষোলো ধারের পানসি মইর‍্যাম লো
মইর‍্যাম ঘাটে রইছে বাঁধারে
ওঠো ওঠো ওঠো মইর‍্যামরে
মইর‍্যাম ওঠো পানসির মাঝে নারে ॥

আরও ইট্টু সবুর কর সাধুরে
সাধু আমি মাজান বইল্যা আসিনারে
সাধু আমি বাপজান বইল্যা আসিনারে ॥

অতই যদি পোড়ে মইর‍্যাম লো
মইর‍্যাম মাজান সাথে নিয়্যা চলোনারে
মইর‍্যাম বাপজান সাথে নিয়্যা চলোনারে ॥

www.pathagar.com

তোমার দ্যাশের লোকে বলবি সাধুরে
মইর‍্যাম দাসী আইনছে সাথেরে
মইর‍্যাম চাকর আইনছে সাথেরে
তোমার মায়ের কথা সাধুরে
উব্‌দ্যা মরিচের ঝালরে
আমার মায়ের কথা মইর‍্যামলো
মধুর চাইতি মিষ্টি নারে ॥

ঙ.
দ্যাওয়া নামে টাপের কি টুপের মইর‍্যাম
পিছ্‌ল্যা হইল ঘাটরে
এত সুন্দার মইর‍্যাম না মইর‍্যাম তুমি
একলা আইছ্যাও ঘাটেরে।
মাও নাইকো বুনও নাইকো রাজা
কারে আনবো সাথেরে।
এত সুন্দার মইর‍্যাম না মইর‍্যাম তোমার
সিঁনথ্যা রইছে খালিরে
আমার সাথে কইলে কথা মইর‍্যাম
দেব সিঁন্‌থ্যার সিঁদুর রে।
তোমার সাথে কইলে কথা রাজারে
আমার বাপের সম্মান যাবিরে
তোমার বাপের সম্মান আমি
লক্ষ ছালাম দিয়া রাখবোরে
তোমার মায়ের সম্মান আমি
লক্ষ ছালাম দিয়া রাখবোরে ॥

চ.
কপাট খোল খোলো লো চিন্ত্যালো মনি
কি ন্যা কপাট খোলবো রে চন্দরে রাজা
আমার সিঁন্‌থ্যা রইছে খালি নারে।
তোমার সিঁনথ্যার জুন্নিলো চিন্ত্যালো মনি
আমি সোনারু বসাইছি বাড়ি কি নারে
আমি রুপ্যারু বসাইছি বাড়ি কি নারে।
কপাট খোল খোলো লো চিন্ত্যালো মনি
তোমার সাধু আইছে বাড়ি কি নারে
তোমার সাধু আইছে বাড়ি কি নারে
তোমার সাধু আইছে দেশে কি নারে।

www.pathagar.com

কি ন্যা কপাট খোলবো রে চন্দরে রাজা
আমার নাক রইছে খালি কি নারে
আমার কান রইছে খালি কি নারে
তোমার জুন্নি চিন্ত্যালো মনি
আমি সোনারু বসাইছি বাড়ি কি নারে
আমি রুপ্যারু বসাইছি বাড়ি কি নারে।

ছ.
এত দিনও ছিল্যারে কুইল্যা
বুইন্যাজির দুকানে
আইজ ক্যানে আইল্যারে কুইল্যা
বিবির বরনে নারে
এত দিনও ছিল্যারে দুবল্যা আলানে পালানে
আইজ ক্যানে আইন্যারে দুবল্যা
বিবির বরণে নারে।
এত দিনও ছিল্যারে মেন্দি গাছের ডালেতে
আইজ ক্যানে আইন্যারে মেন্দি
কন্যার বরনে নারে।
এত দিনও ছিল্যারে ধান গিরস্তের ডোলেতে
আইজ ক্যানে আইল্যারে ধান
বিবির বরনে নারে।

জ.
ও তুমি শোন–শোন আমার কালাচাঁদরে
কালাচাঁদ গেল বাইন্যজি কইরব্যার
আমায় থুইয়্যা ঘরেরে ॥
আরও ছয় মাস ভইর্যারে কালাচাঁদ
চাইল ডাইল কেনে নারে
তুমি শোন–শোন আমার কালাচাঁদরে
আরও ছয় মাস ভইর্যারে কালাচাঁদ
খাসি গরু কেনেরে
তুমি শোন–শোন আমার কালাচাঁদরে
আরও ছয় মাস ভইর্যারে কালাচাঁদ
ইষ্টি কুটুম ভুল্যায়রে
আপন সাধের বওনাই না হলি
হয় না বিয়ার শোভারে ॥

www.pathagar.com

আপন সাধের বুনও না হলি
হয়না বিয়ার শোভারে
তুমি শোন–শোন আমার কালাচাঁদরে ॥

ঝ.
কোকিল ডাকে ডালে ডালে
আমার পরান কান্দেরে
বাপজান যদি আপন হয়
আমার জিনি নারোর নেয়রে।
সেইন্যা পরান জুড়্যাবো
আমার মাজানের কাছে নারে।
সেই ন্যা পরান জুড়্যাবো
আমার ভাই বুনির কাছে নারে।
কোকিল ডাকে ডালে ডালে
আমার পরান কান্দেরে
ভাইজান যদি নায়োর নেয়রে
সেই ন্যা পরান জুড়্যাবো
আমার ভাবিজানের কাছে নারে।
বাপজান যদি নায়োর নেয়রে
সেই ন্যা পরান জুড়্যাবো
আমার সখি সোনার সাথে নারে ॥

ঞ.
দিঘি কাটলাম গোসল দিব্যার ভালোবাসে
মাধব রাজারে
সেই ন্যা দিঘিতি বিবির সিঁথ্যার সিঁদুর ভাবে
মাধব রাজারে।
সেই ন্যা সিঁদুর যে নাকি তুইল্যা দিব্যার পারে
মাধব রাজারে
তেই সেন দেবো সুধের বেলহারীর বিয়া নারে
দিঘি কাটলাম গোসল দিব্যার ভালোবাসে
মাধব রাজারে
সেই ন্যা দিঘিতি বিবির নাকের নাকফুল ভাসে
মাধব রাজারে
সেই ন্যা নাকফুল যে নাকি তুইল্যা দিব্যার পারে
মাধব রাজারে

www.pathagar.com

তেই সেন দেবো বেলোহারীর বিয়া নারে।
সেই ন্যা দিঘিতি বিবির কানের দুল ভাসেরে
সেই ন্যা নাকফুল যে নাকি তুইল্যা দিব্যার পারে
মাধব রাজারে--
তেই সেন দেবো সাধের বেলোহারীর বিয়া নারে।
সেই ন্যা দিঘিতি বিবির হাতের চুড়ি ভাসেরে
সেই ন্যা চুড়ি যে নাকি তুইল্যা দিব্যার পারেরে।
তেই সেন দেবো সোনার বেলোহারীর বিয়া নারে ॥

ট.
উঁইচ্যা ঘরে নিচ্যারে ভওয়া
আবে ছ্যানা মাটি
সেই খানেতে খাইছেরে আছাড়
জমিদারের বিটি।
খাইছে আছাড় ভাইঙছে হাতের চুড়ি
ভাইঙছে ভাইঙছে হাতের চুড়ি
আবার গড়ায়া দেবো।
খাইছে আছাড় ভাইঙছে নাকের ফুল
ভাইঙছে ভাইঙছে নাকের ফুল
আবার গড়ায়া দেবো।
খাইছে আছাড় ভাইঙছে কানের দুল
ভাইঙছে ভাইঙছে কানের দুল
আবার গড়ায়া দেবো।
খাইছে আছাড় ভাইঙছে মাজার বিছ্যাহার
ভাইঙছে ভাইঙছে মাজার বিছ্যাহার
আবার গড়ায়া দেবো ॥

ঠ.
আমীর সওদাগর যায়রে বিয়া না কইরব্যার
ওসমান সওদাগরের বাড়ি
তাই ন্যা দেইখ্যা ওসমান সওদাগর
বড়ই খুশি হয়ও কি নারে।
হাতে ছিল সোনার আংটি
জামাইর কইরলো ভালা দানও কি নারে।
তবু জামাই গোস্বা না করেরে ভালো
আপুন সাওরীর নেবো সাথেরে ॥

www.pathagar.com

তবু জামাই গোস্বা না করেরে ভালো
দাদী সাওরীর নেবো সাথেরে
হাতে ছিল হাত ঘড়ি জামাইর কইরলো দানরে
তবু জামাই গোস্বা না করে ভালো
নানি সাওরীর নেব সাথেরে।
গায়ে ছিল ফুলফুইল্যা জামা
জামাইর কইরলো দান ওরে
তবু জামাই গোস্বা না করে ভালো
খালা সাওরীর নেবো সাথেরে ॥

ড.
কলা গাছে কলা না ধরে
কলার ভারে হেলিয়া পড়ে
আমার শাম ঘামিয়া পইরলো উজ্যান চরেরে
সাধু যদি থাইকতোরে দ্যাশে
কলা খাইতো রুটির সাথেরে ॥

আম গাছে আম ধরে
আমের বারে হেলিয়া পড়ে
আমার শাম ঘামিয়া পইরলো উজ্যান চরেরে
সাধু যদি থাইকতোরে দ্যাশে
আম খাইতো উরুমেরই সাথেরে ॥

জাম গাছে জাম ধরে
জামের ভারে হেলিয়া পড়ে
আমার শাম ঘামিয়া পইরলো উজ্যান চরেরে
সাধু যদি থাইকতো দ্যাশে
জাম খাইতো কাসুন্দি সাথেরে ॥

ঢ.
ঝাঁহে ওড়ে ঝাঁহে পড়ে সাধুরে
উয়্যারি বোগলে কী ওড়েরে
নীল্যা উয়্যারি বোগলে ওড়ে বাওইরে ॥
ইটু হুকুম দেও সাধুরে
আমি নায়ার কইর‍্যা আসি।
কিসির নায়ারে যাইব্যা শীল্যা তোমার
জননী নাই ওরে।
আছে আছে সাধু আমার বড় ভাই ওরে

www.pathagar.com

তারি দেইখপ্যার যাবো আমিরে ॥
তোমার ভাই বৌ থুইয়া দিছেরে
বারো বছইর‍্যা খুদরে
সেই ন্যা খুদ খাইলিরে শীল্যা
তোমার প্যাটে অসুখ হবিরে।
তোমার ভাই বৌ থুইয়্যা দিছেরে
বারো বছইর‍্যা দুইয়্যারে
সেই ন্যা দুইয়্যার সুইরব্যার গেলিরে শীল্যা
তোমার হাতে ঠুসা পড়বিরে।
তোমার ভাই বৌ থুইয়া দিছেরে
বারো বছইর‍্যা ঘরের মাইঝ্যারে
সেই ন্যা ঘরের মাইঝ্যা নেইপ্‌প্যার গেলিরে শীল্যা
তোমার মাজা হবি ব্যথারে।

ণ.
কাচারি ঘরের দুইয়্যারে ভাবীরে
কিসির কুটুম ঘোরে
তাও কি তুমি জানো না দেওরারে
তোমার বিয়ার কুটুমরে
সত্যি যদি হইতো ভাবী
তোমার নিতাম সাথেরে
তোমার পালকি ঘেরবো ভাবীরে
আমের পাতা দিয়ারে
তোমার পালকি ঘেরবো ভাবীরে
আমার বিবির শাড়ি দিয়ারে।
তোমার পালকি ঘেরবো ভাবীরে
আমার বিচির ছায়া দিয়ারে।
তোমার পালকি ঘেরবো ভাবীরে
আমার বিবির ব্লাউজ দিয়ারে।
তোমার পালকি ঘেরবো ভাবিরে
কলার পাতা দিয়ারে ॥

ত.
আম্মু গাছে জাম্মু ফলরে
খাজোর ভালো শোভে দামাদরে
ময়দানেতে বসে দামাদ উকিল ভালো পাঠায়রে
দেখে আইস উকিল ভাই, দেখে আইস ঘটক ভাই

www.pathagar.com

সেই না বিবির কিনা সুরতরে
দেখে আইলাম দামাদরে
যেইসা মিঞা, তেইসা বিবিরে
পাঁচ টাকার সিঁদুর হলি বিবির ভালো শোভরে
দশ টাকার শাড়ি হলি বিবির ভালো শোভরে
শও টাকার শাড়ি হলি বিবির ভালো শোভরে
হাজার টাকার গয়না হলি বিবির ভালো শোভরে।

থ

নারিকেল লাগালাম সারি সারি
ও সারিরে সদাগর
আমার ডাগুরি ঘিরিল বাড়ি।
আস্তে আস্তে বওরে সদাগর
ও পাংসীরে সদাগর–
আমি মাজানের কান্দন শুনি।
আমার মাজান কাঁদে
ও কাঁদেরে সদাগর-
যেমন গাঙের তুফোন ওঠে
আমার বাবাজান কাঁদে
যেমন বিরিক্ষিত পাতা ঝরে॥

দ.

পাঁচ কাপড়া পড়িয়া নীলে ঘোড়ায় চড়িয়া
যায়রে ছাওয়াল রহিমগঞ্জের হাটে
সেইখানেতে আছে এক ভাবের মালিনীরে
থাপা দিয়ে ধরে ঘোড়ার বাগর !!
ছাইড়ে দেও মোর কালিনী : ছাইড়ে দেও মোর মালিনী
আমার চলন ঘোড়ার বাগররে।
আবার ফিরে আসিব আবার ফিরে বসিব
খায়া যাব তোমার বাটার পানরে !!
শব্দার্থ : কাপড়া- কাপড়। নীলে-নীল। ছাওয়াল- ছেলে। বাগর- ঘোড়ার লাগাম।

ধ.

হরিণেতে ধান খায়, রাজার বেটা ডেকে কয়–
বিবি, বাহির হইয়া হরিণ খেদাইয়া দাও
বিবি, বাহির হইয়া হরিণ দাবড়াইয়া দাও !!
ঐ না হরিণ খেদাতি, ঐ না হরিণ দাবড়াতি

www.pathagar.com

আমার ছুটে পলো চিকনা সিথির সিঁদুর
ঐ না হরিণ খেদাতি, ঐ না হরিণ দাবড়াতি
আমার ছুটে পলো চিকনা নাকের ফুল!!
কালি সেন সকালে বানিয়া বুলাইব
তোমার তুলে দেব চিকনা সিথির সিঁদুর
কালি সেন সকালে কামার বুলাইব
তোমার ঝাইলা দেব চিকনা নাকের ফুল
তুমি না করিও মান বিবিরে !!

## ৪. ধুয়া গান

ধুয়া গান রাজবাড়ী অঞ্চলের বিশেষ ঐতিহ্য। ধুয়া গানের সুরের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ছোট ঘটনা বা কোনো রটনা নিয়ে তৎকালীন সময়ে গায়কেরা ধুয়া গান রচনা করতেন। সে সব গান মুখে মুখে প্রচার হতো। একসময় ধুয়াগান মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। একটা বিশেষ বিষয়ে ধুয়া তোলার জন্যেই সম্ভবত 'ধুয়া' গানের আবির্ভাব। ধুয়া গান বিশেষত কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো না। তবে 'রাখালী' বা 'বারাসিয়া' গানের মতো কৃষকের ধান, পাট কাটা বা ক্ষেত নিড়ানোর সময় সমবেত কণ্ঠে এ গান পরিবেশন করে থাকেন।

**ধুয়া গানের কিছু নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হলো**

**ক.**

দানেজ বলে শোনরে ময়না তুই আশিকের পাখি
কত রত্নভাবে যত্ন কইরা ময়না পালন কইরাছি
কোনো দিন যাইবা ময়না ছাইড়া আমায় দিয়া ফাঁকি ॥

পানি খাইব্যার চাইল্যা ময়না তুমি ধরো খাও পানি
ওরে আখেরে কী জবাব দিব্যা ময়না তাই বল শুনি
কী জব দিব্যা মহাজনের হিস্যাবের দিন ॥

পানি খাইব্যার চায়ারে ময়না তুমি পানি খাইল্যা না
কত খাট পালঙ্ক পইড়্যা রইলোরে ময়না ফলের বিছানা
সাতও রোজো অনাহারে, কেউ বলে না মা ॥

**খ.**

ইব্রাহিম কয় আফাজদ্দি ভেবে দেখ দেলে
নতুন গান পইড়াছে মনে
কত ঘরে ঘরে কৃষ্ণ নীলা হয় রাত্র দিনে

www.pathagar.com

করিতে কত আইল কত গেল কত রইল লোকের মনে
আবার বরিশালের গুনাই বিবি
মন আমার–আমার মন পাগল হইল ঐ গুনাইর গানে।
যদি শোনে ওয়াজ নছিহত হবে বরাট বাজারে
সেখানে যাইতে না পারে
যদি শোনে গুনাই গান হবে অমুক শহরে
কত লোক হাসি খুশি মন উল্লাসী
পান বিড়ি খায় চেয়ারে বসে
আবার মনে মনে চিন্তা করে
মন আমার গুনাইর গান বাঁধবো কেমনে।
বাড়ি যায়া চুরি করে বৌর গায়ের গহ না
মাঞ্জার বিছ্যা বেইছা কেনে হারমোনি বাজনা
বসের বউ রাইত দুফ্যারে একলা ঘরে
ডাকিলে বউ কথা কয়না
আবার বাইর‍্যাখালীর পুর‍্যান শাড়ি
মন আমার এই ঠেলায় কিছুই রইল না।
ইটু ইটু ছেমরীর‍্যা ভাই শেখে গুনাইর গান
তারা জল আনিতে ঘাটে যায়া
গানে মারে টান
মরুক বাঁচুক বুইড়্যা বুড়ি
দেখে আমি চোকরা নাচান
ইব্রাহিম কয় মন আমার
এ ঠেলায় রইল না আর মান ॥

গ.
সন ১২শ শ্রাবণ মাসের ৭ সালে
ইন্দ্র বাবুর দুঃখের কথা বলি প্রকাশ করে
ও সে রবিবার দিন রাত্র করে ইন্দ্রবাবু যাত্রা করে
কইলকাতা যাবেন বলে
বিধি তাহার বৈমুখ হইল রাস্তার মাঝারে
গাড়ি জাম হইল চুয়াডাঙ্গা
কত মারা গেল হঠাতে ॥
গাড়ি হইল পতন খবর আইল রাজবাড়ী
লাল মিয়া মিনিস্টার ছিল
শুনতে পাইলেন তিনি
টেলিগ্রাম করা কইলকাতা

www.pathagar.com

ইন্দ্রবাবুর ছেলে কোথা
তালাশ কর তাড়াতাড়ি।
তোমার উইঠ্যা গিছে ১২ ডার মেলে এই ট্রেনে
ওসে আছে কিবা মিরতু হইয়াছে
খুঁজে দেখ আছে সে কোনো গাড়িতে ॥

লাশ গোপন করবে বলে সাজাইল মাল গাড়ি
লাল মিয়া উপস্থিত ছিল সেই দিল আড়ি
আমি দেবো না লাশ ফেলে দিতে
যা হয় কর বিধিমতে গরমেন্টের আইনভারী
চিক্ক্যার দিয়া কাইন্দা ওঠে পরি সুমতি
বজ্রঘাত মাথায় পইলো
আমাগার কইরা গেইলা ডাকাতি ॥

কান্দে পুত্র পরিবারে আমাগারে ছাইড়া গেলে
দাঁড়াব্যার আর লক্ষ্য নাই
নারান বাবু কাইন্দা বলে হায়রে জোরের ভাই
আমি ভাই শোকে পাগল হব
বল দাদার তালাশে কোথায় যাই ॥

ঘ.
আচ্ছা বিধাতার কি হাল
আমি হাল দেইখা হলাম বেহাল
বইসে ভাবি সকাল আর বিকাল
তাতে ১৩৪৯ সালে পইড়ে গেল দারুণ আকাল
বিধির চক্রে ক্ষেত খোলা সব
হইয়া গেল পাখাল
তাতে জীবের প্রতি বড় দুর্গতি
দিন গেলে কার ভাগ্যে মেলে না অন্নজল ॥

গরিবের কষ্ট দেইখে প্রাণ তো বাঁচে না
তাতে ধান চালির বাজার চড়া
আট টাকা হয় কাপড়ের জোড়া
তাতে কাপড় বিনে ভারতের লোক হয়ে গেল পাগল পাড়া
দুঃখিনীরা অন্ন বিনে হয়েছেন মরা
কচুর খাটা খেয়ে জান বাঁচায়ে
কত লোক ঝোর জঙ্গলে দেখি ফাঁসের মরা ॥

www.pathagar.com

অধীন ইব্রাহিম কয় ওরে আমার মন
তুমি কেন রইয়াছ অচেতন
মায়া রসে ভুইল না কখন
দিন থাকিতে সাধক সিদ্ধি সমন জ্বালা কর দমন
পাঁচ মানিক ৩০ মতি
সংগের সারথী কর দেহের পাঞ্জাতন ॥

ঙ.
নিত্যি নতুন আইন জারি ভারতে
শান্তি নাই আর জগতে
দেখলাম তাই বলে যাইরে ভাই সকল
মালামাল কন্টোলে নিয়াছে
ভারতবাসীর কপাল গেছে পুড়ে
মানুষ মইলে পায় না কাপড়
ওরে ভাই পুরান কাপড় দিছে ॥

গেল তালমাতে বড় ডাক্তার
লক্ষণদার মজুমদার
ফুলতলারই দেবেন সরকার রে ভাই সকল
ফর‍্যাতপুরীর উকি মুক্তার যত
আইড়্যা কাঁদির গেল কেদার দত্ত
মালদার জিলায় চইল্যা গেল
ওরে ভাই আর বলিব কত ॥

চ.
মেছের বলে ও সাধের কুষ্ঠা
তোরে বুইন্যা হলাম আবোস্তা
আগে জান্‌লি কুষ্ঠা বুনতাম না
তোরে একদিন কাটি তিন দিন
টাইন্যা হয় গাও গতর ব্যথা
হাঁটুর ব্যথায় গায়ের ব্যথায়রে
আইজ আমার ধইরাছে মাথা ॥

ঘর রমনী কাইন্দ্যা কাইট্যা কয়
আমার প্রাণপতির দিক চাওয়া না যায়
রাইত পোহাইলে কুষ্ঠার ক্ষেতে যায়
ওরে সোনার বরণ পতি আমার
রোদ্রে পুড়ে কালা হয়

www.pathagar.com

আবার জলপোকার কামড়ের জ্বালারে
ও জ্বালা সওয়া নারে যায়।
হবার কার কুষ্ঠার টাকা মজুত রাখিব
আমার প্রাণ পতিরে বুঝাইবো
গলার হাঁসলি গড়ায়া নেব
আমি গলে নেব গজমতি
মাঞ্জায় বিছা হার নেব
প্রাণ পতিরে সামনে রাইখারে আমি ঘুইরা বেড়াবো ॥

ছ.
পাচুর‍্যাতে আজব রঙ
গোয়ালন্দের দক্ষিণে ভাই ফুলতার বন্দর
সেই কিন্যা মন্তর শিখেছে
পানি পইড়্যা ডাঙায় থুইয়ারে
নইদ্যা কুম্যার হইয়াছে ॥

নইদ্যার মা কাইন্দা কয়
এমন কুজাইত্যা মন্তর নইদ্যা শিখছিলি কোথায়
ও তুই শিখলি মন্তর করলি ভালরে
ও তুই কেনে মন্তর খাটালি
পানি ভইর‍্যা ডাঙায় থুইয়্যা
নইদ্যা তুই কুম্যার হইলি ॥

নইদ্যার বউ কাইন্দ্যা কয়
সোনার বরণ পতি আমার গাঙে ভাইস্যা যায়
আমি যৌবন কালে হইল্যাম নারীরে
আমার ডানির কপাল গিছে বাঁয়
আমার পতি রইল পাচুইর‍্যার গাঙেরে
আমি যাই কোথায় ॥

জ.
একটি ডিম্বর পাঁচটি কুসুম
বার মছলায় তাই শুনি
পাগলা কানাইর বান্ধা ধুইয়ার
মানে বল ওভাই বয়াতি ॥

কোনো দিন জন্ম চন্দ্র সুরযুর
কোনো দিন জরমো মা খাকির

www.pathagar.com

কোনো দিন জরমো হইছে রাত্রদিন ॥
মাটির তলা আছেরে মানুষ
সেই মানুষের নামটি কী
সেই মানুষ মরিয়া গেলে
বল তার উপায় হবে কী ॥

ঝ.
রিষ্যান বলে শোনেন ভাই সকল
বলবো গাড়ি ধুয়্যার ধপ ছত্তল
দেহ গাড়ির নাইক্যা গণ্ডগোল
ও গাড়ি আট কুটুরি নয় দরজা
১৪ পোয়ার গাড়ির গড়ন।

৩ তারা যার যার কোঠায় সেই সেই থাকে
যার যার বুলি সেই সেই কয়
একজন নুবনীহরে মালা জপ করে
তারে কি পাগল বলা যায় ॥

কোথা হইতে আইল সেই গাড়ি
আমি মোকামের নাম প্রকাশ করি
নদীয়ার জেলা বাংলাতে শুনি
আবার গাড়ি থুইয়্যা
ড্রাইভারই পলায়

সেদিন যাত্রী চলিলেন মথুরায়
দোকান থুইয়্যা বেপারি পলায়
এমন সাধের গাড়ি পইড়্যা
শশ্মান ঘাটের মাঝখানায়
ও গাড়ির কল ঘোরে না ধুম্যা ছাড়ে না
চেরকলে গাড়ি দাবড়ায়
মাটির গাড়ি মাটি হয়া যায়
সে কথা রিষ্যান বয়াতি কয় ॥

ঞ.
গাজি যায়রে সোনাপুর দ্যাশে
শুইয়্যা থাহে পালঙ্কে
পরির‍্যা সব বাতাস দিত্যাছে ॥

www.pathagar.com

সকল পরি যুক্তি করে, নিয়্যা গেল তার নগরে
নিয়্যা গেল চাম্পার মন্দিরে।
চাম্পা বলে ও মন চোরা তুমি এ দ্যাশে আইলা কেমনে ॥

চুকড়ারে তুই বড় ডাঙ্গাবাজ
না মানলি পাহাড়াদার
ধরা পইলে প্রাণে বাঁচা ভার
ওরে দক্ষিণ্যার হাতে পইলে কাটা যাবে তোমার গর্দান
তুমি সত্যি করে দেওগো পরিচয়
ছোকড়ার বাড়ি কোনো মোকাম ॥

বাড়ি আমার বৈরাট নগর
বাপের নামটি ছেকেন্দার
মায়ের নামটি অজুফা সুন্দর
ওরে মুসলমানের জাতি আমরা ভাই গিছে পাতাল নগর
সত্যি করে দিলাম পরিচয়
চম্পা বুইঝা নেও এখন ॥

ট.

ছিলামালেকুম আলেকুমছেলাম, চাই দশের চরণ ধুলি
ছিলামালেকুম দিলাম আমি ও ভাই বয়াতি।
ইবার চান সভাতে আল্লা বল
তমিজদ্দি সভায় আইলোরে
দোয়া করবেন সকলে ॥

গতবার আশ্বিন মাসে ছিলাম কাহিলি
মায় কান্দে পাশে বইস্যা
কোনো দ্যাশে ছাইড়্যা চল্‌লি নীলমনি ॥

ওরে এ দনিয়ার আবের ছায়া পলকে সব মিথ্যা হয়
পদ্ম পাতার পানি যেমন পড়ে ঠোগ্‌ড়ার গায়
হইলাম কাম রসেতে মাতোয়ারা
পাছ বাড়ি তোর নাইরে বেড়া
সামোলে সাজ কেবলই দেহায়
সাধনে মুর্শিদ ভজলে আগুন নিভ্যা পানি হয়
একদিন কানতে হবে সম্বল বিহনে
আহারে বইস্যা খোরমার গাছ তলায় ॥

www.pathagar.com

ঠ.

পণ্ডিত আলী কয় ও মন রসনা
আমি সভায় করি বর্ণনা
কেহই মাইনবে কেহই মাইনবে না ॥

গভর্নমেন্টের জাগায় থাইক্যা
ফৌজদারি কেউ কইরো না
ফৌজদারিতে বেষম যন্ত্রণা ॥

আমি কইরাছিলাম এক ফৌজদারি কেস ভাই
পলায়া রলাম মাসেক তিন চারি
কার্তিক মাসের ৮ই তারিখ
রাইত কইর‍্যা আলাম বাড়ি
বাড়ির কাছে ফইর‍্যাদি জনচারি
তারা ৩৪ জন যুক্তি কইর‍্যা
রাইত কইর‍্যা ঘিরলো বাড়ি ॥

আমি ধরা পড়লাম পুলিশির হাতে
আমায় নিয়্যা গেল ঢাকাতে
হাজির কইরলো হাকিমির কাছে
আমি গেলাম উকিলির কাছে
নারান বাবু উকিল ভালো
তানার নিলাম সঙ্গেতে ॥

ড.

বলি ভাইরে ভাই
কষ্ট কইর‍্যা পুত্র সন্তান পালে বাপও মায়
ছেলে বড় হইলে করায় বিয়া
বইস্যা খাবো তার কামাই
সেই ছেলেরা বড় হইলে কিবা করে কাম
তারা করে ভিন্ন বাড়ি সুখে করে গাইরেস্তালি
বউতে বলে স্বামীরে
পড়লাম না নীলাম্বর শাড়ি এই না বয়সকালে ॥

মায় কাইন্দা কয় ছেলের হুজুরে
আমি বলবো বৌর কাহিনি
আমি বৌরে বলি কামের কথা

www.pathagar.com

বউ কয় আমার ধইরছে মাথা
যায়া শোয় গায় দ্যা ক্যাঁথা
তুই থাকতে আমি দুঃখিনি ॥

ছেলে কয় মায়ের হুজুরে কী বলবো তোর কাহিনি
তুমি তিন বেলা খাও গরম খানা
লোকের কাছে কও বউ ভালো না
লোকে কয় বউ মন্দ না
আইজ তারে কোনো দোষে মারি ॥

ঢ.
ওরে আয়কে যাবি রাজার রাজবাড়ী
আয় সবে তাড়াতাড়ি, পুষুর্‌য়া পাবন বয়া যায় ভারি ॥

ওরে পৌষ মাইস্যা বাসি পিঠ্যায়
মিশ্যায়া খাজোইর পাটালী
নাইরক্যাল মিশ্যায়া তাতে
তাইল্যা দেয় গরুর পাতে
পুষুইর্‌য়ার ভোর বেলাতে গরু দাবড়াবি ॥

ওরে কইলক্যার সাথে লাল রং মাখায়া
গরুর গায়ে লাগায়া কি বাহারে কইলক্যার দাগ লাগায়।
ওরে 'নুছির' মাঠের দাবড়ায় গরু
চায়া থাহে ফ্যালার মায়
দাবড়ায় গরু বাজনা বাজে
বেড়ার ফাঁকদ্যা চায়া থাহে
আসে মানুষ ঝাঁহে ঝাঁহে
বাহারে দেহা খায় ॥

ওরে নুছির মাঠে মিল্যাছে আড়ং
কি বাহারে রং বেরং, নানান মানুষ
নানান রঙের ঢং।
ওরে রাজার বাড়ি বাজার মিলছে
পৌষ মাইস্যা পুষ পাবন
আয়রে তোরা আয়কে খাবি
গেলিপারে দেখতে পারি
পুষুইর্‌য়ার ছিন্নি খাবি মনের মতন ॥

www.pathagar.com

## ৫. মুর্শিদি গান

মুর্শিদি গান রাজবাড়ী এলাকার এক অনবদ্য সৃষ্টি। আগের দিনের মুর্শিদি গানের আসর বসতো পল্লী অঞ্চলের যে কোনো এক বাড়িতে। উদ্দেশ্য কোনো রোগের উপশম কামনা। ভবিষ্যৎ কিছু জানার বিশ্বাসে অথবা খরাপীড়িত অঞ্চলে বৃষ্টি নামানোর আশায় মুর্শিদি গানের আসর বসত।

মুর্শিদি গানের তালে তালে ফকির কিসিমের একজন 'গাছা' উঠতো। তার মুখ দিয়ে নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সবাই তৃপ্ত হতো। ফকিরের ঘাড়ে 'সক্‌সো' নামক কোনো অদৃশ্য আত্মার আছর হলে তিনি গাছা উঠতেন। আসরের সবাই তার নিকট প্রশ্ন করে উত্তর পেতেন। এই আসরে মহিলা পুরুষ সবাই উপস্থিত থাকতো। এসব অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য থাকতো না।

ছোট খাটো কোনো খঞ্জনি অথবা মাটির পাতিল পেটের সাথে লাগিয়ে বাজানো হতো। গাছা ওঠা ফকিরের কোমরে বাঁধা থাকতো গামছা। গাছা উঠলে শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগে, তাই শক্ত করে বেধে নেয়া হতো গামছা। আসরের সামনে থাকতো ধূপের ধুপতি। ধূপের কমতি হলে মোটেই মুর্শিদি গানের আসর জমতো না। নিম্নে মুর্শিদি গানের কিছু সংগৃহীত নিদর্শন দেয়া হলো। মুর্শিদি গানের অনুষ্ঠান এখনো এতদ্‌অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

**ক.**

জাগো জাগো অবলার মনরে মনরে মায়া রসের ভোলা
পিছের দিকে চায়া দেখ ডুইবা আইল বেলা
ও মন জাগরে ॥

জাগিতে জাগিতে মনরে শরীল কইরল্যা হিম
কাজল কোঠার ঘরে বইস্যে চোরায় কাইটল সিঁদ
ও মন জাগরে ॥

সিঁদও না কাটিয়ারে চোরা চাচ্ছো ডানি বাঁয়
ঘরের ব্যাসাদ ঘরে থুইয়্যা মালিক ছাইড়্যা যায়।
ও মন জাগরে ॥

চাইর আঙুইল্যা রশিরে দিয়া বান্নন বাঁইধলো কইস্যা
আহারে দরদের মা বাপ কাইদলো তফাৎ বইস্যা
ও মন জাগরে ॥

মায় কাঁদে ব্যাটারে ব্যাটা বুনি কাঁদে ভাই
ঘরেরও রমনী কাঁদে আমার আর তো লক্ষ্য নাই
ও মন জাগরে ॥

www.pathagar.com

খ.

চলো আমরা দুই ভাই বনে যাই
এই দেশে দরদি নাইরে ভাই ॥
এক দরদি দয়াল আল্লা তাহার চরণ ভজলে পাই।
এই দেশে দরদি নাইরে ভাই।
এক দরদি দয়াল নবী তাহার চরণ ভজলে পাই
এই দেশে দরদি নাইরে ভাই ॥

এক দরদি হযরত আলী তাহার চরণ ভজলে পাই ॥
এক দরদি মা ফাতেমা তাহার চরণ ভজলে পাই ॥
এক দরদি ইমাম যুগল তাহার চরণ ভজলে পাই ॥
এক দরদি দমের মাদার তাহার চরণ ভজলে পাই ॥
এক দরদি বড় পির তাহার চরণ ভজলে পাই ॥
এক দরদি খোয়াজ খিজির তাহার চরণ ভজলে পাই ॥

গ.

ও আল্লা ও আল্লা ও আল্লা
ও মালেক আল্লারে।
হরে মালেক আল্লারে ও হাকিম আল্লারে
তোর শরীলে দয়া আছে ও মালেক আল্লারে
হক লাই লাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ॥

প্রথমে জানালামরে ছালাম
দয়াল আল্লা তোমার চরণ বন্দিলাম
তারপরে বন্দিলাম আমি রাসুলের চরণ করিলাম সার।
আমি বন্দি আমার দয়াল আল্লার চরণ করিলাম সার।

তারপরে বন্দি আমি হরযত আলী
তোমার চরণ করিলাম সার
আমি বন্দি আল্লাজির চরণ আজ বারে বার।
তারপর বন্দি আমি ফাতেমার চরণ বারে বার ॥
তারপরে বন্দিলাম আমি ইমাম হাহাসান হোসেনের চরণ
বারে বার ॥

তারপরে বন্দিলাম আমি উস্তাদের চরণ বারে বার।
তারপরে বন্দিলাম আমার মা বাবার চরণ বারে বার।
তারপরে বন্দিলাম আমার আসরের দশজনের চরণ বারে বার ॥

www.pathagar.com

ঘ.
ও আল্লা ও আল্লা ও আল্লা
মনা ঘরের ভাবনা তোর কী আছে
ঘরের কাজলা আটন ফুস্যিরে ছাটন
জোড়ায় জোড়ায় ঘরের মিল দিছে ॥
ঘরের আট কুঠুরি নয় দরজা
আঠার মোকাম আছে ॥

আমার মুর্শিদ ধন কাণ্ডারী ভালো
ঐ না ঘরের মধ্যে লুকাইছে ॥

**ঙ. বায়াল নাচার গান (চিতেন খাদ্)**
মা তোর খাট নড়ে পালঙ্ক নড়ে
মারে নড়ে সিংহাসন কি ওমা ওমা দুর্গারে ॥

মা তোর পঞ্চদাসী সঙ্গে লয়ে
মারে আইসো আসরে কী ॥
মা তোর ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে লয়ে
মারে আইসো এই আসরে কী ॥

মা তোর কার্তিক গণেশ সঙ্গে লয়ে
মারে আইসো এই আসরে কী ॥
মা তোর মহাদেব সঙ্গে লয়ে
মারে আইসো এই আসরে ॥

চ.
ও আল্লা ও আল্লা ও আল্লারে
ও মালেক আল্লারে ॥
ও দয়াল আল্লারে আমায় ভাসাইও না সাগরে।
আমি কোনো বা দেশে যাবরে
আমার দয়াল আল্লার তালাশে
ও আমি যাবরে ॥

আমি কোনো বা দেশে যাবরে
আমার রাসুলের তালাশে
ও দীনের রাসুলরে আমায় ভাসাইও না সাগরে
আমি কোনো বা দেশে যাবরে
আমার হরযত আলীর তালাশে
ও আমি যাবরে
ও আমার আল্লারে আমায় ভাসাইও না সাগরে ॥

www.pathagar.com

আমি কোনো বা দেশে যাবোরে
আমার বড় পীরের তালাশে
ও আমি যাবোরে
ও আমার আল্লারে আমায় ভাসাইও না সাগরে ॥

ছ.
ও আল্লা ও আল্লা ও আল্লারে
আমি এক মাথায় দুই বোঝা নিয়্যা
কেমনে দেব গাঙ পাড়ি
লৌকার যত্ন করল্যানা ভাই মাঝি।
মনা ও সময় কেন্ ঘুমাইলি
লৌকার যত্ন করলি না ভাই মাঝি।

আমি কোথায় পাব হাতুর বাটাল
কোথায় পাবো মিস্তরি ॥

আমি নতুন লৌকা গইড়্যা সাইর‍্যা
না দিলাম গাব কালি ॥

আমি কোথায় পাব দাড়ি মাল্লা
কোথায় পাবো আমার মন মাঝি ॥

আগা লৌকায় ঝামুররে ঝুমুর
মধ্যি নায়রে ছই–
ওরে তারই মধ্যি বইসা আছে
আমার মুর্শিদ ধন কাণ্ডারী ॥

জ.
ও আল্লা ও আল্লা ও আল্লা
ও দয়াল আল্লারে
হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ
দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও
কাণ্ডারী কইল হইও ও দয়াল আল্লারে আমার
ইরে বেটা এই নিদানের কালেরে ॥

কাণ্ডারী কইল হইও ও দয়াল নবীরে আমার
ইরে বাবা এই নিদানের কালেরে ॥

কাণ্ডারী কইল হইও ও হযরত আলীরে
ইরে বাবা এই নিদানের কালেরে ॥

www.pathagar.com

কাণ্ডারী কইল হইও ওমা ফাতেমা আমার
ইরে মা এই নিদানের কালেরে ॥

কাণ্ডারী কইল হইও ও দুই ইমামরে আমার
ইরে বাবা এই নিদানের কালেরে ॥

কাণ্ডারী কইল হইও ও দমের মাদাররে আমার
ইরে বাবা এই নিদানের কালেরে
দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও ॥

## ৬. সারি গান

বর্ষাকালের শেষ দিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকা বাইচের ধুম পড়ে যেতো। এই ঐতিহ্যটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো বিদ্যমান। অতীতকালে এলাকার বড় বড় বিল অঞ্চলে নৌকা বাইচ হতো। এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নামিদামি বাইচের নৌকা আসত। তার মধ্যে আরশাদ মিয়া, মোজা মাতুব্বার, হোচেন সরদার–এদের বাইচের নৌকা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষ নৌকা বানানোর কৌশল আয়ত্ত করে। গ্রামীণ মানুষ এক সময় তাদেরই দৈনন্দিন জীবনের বিষয় নিয়ে নানারূপ খেলায় মেতে ওঠে। নৌকাবাইচ তাদের প্রিয় খেলা। নদী, বিল, হাওড় রাজবাড়ী জেলার মানুষ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত। বর্ষার দিনে পদ্মা, গড়াই, তেতালা, পাঁচুরিয়া বিলে অনুষ্ঠিত হয় নৌকাবাইচ। নৌকাবাইচের সময় এরূপ গান গাওয়া হয়। নৌকা বাইচের গান এখন আর হয় না। নৌকা বাইচের গানকে সারি গান বলা হয়। নৌকা দু-পাশের বৈঠাধারী 'বাইছা' গান সারি গানের তালে তালে বৈঠা মারতেন। মাঝখানে বয়াতি সারি গান গাইতেন। এই সারি গানই এই অঞ্চলে ইতোপূর্বে বড় বড় দালান কোঠা তৈরিতে ছাদের ওপরে বসে শ্রমিকেরা ছাদ পেটাতেন এবং একজন বয়াতি ঠিক নৌকা বাইছের অনুরূপ সারি গান গাইতেন আর শ্রমিকেরা তালে তালে দোহার ধরতেন। এখন আর দালানে ছাদ পেটানোর প্রয়োজন হয় না। তাই সারি গানও বিলুপ্তির পথে। বয়াতি হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে নেচে নেচে নৌকা বা ছাদে সারি গান গাইতেন। তিনি তাঁর ইচ্ছেমত সাজগোজ করতেন। যার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই।

ক.
কাইল তোরে চড়াবো বাইছের নায়
মোর বিয়ানলো কাইল তোরে চড়াবো বাইছের নায়।
ছোট খাটো বিয়ান আমার
নাকখান দেহি খালি

www.pathagar.com

নাকের নাকফুল গড়ায়া দেবো
আমার সাথে গেলি– মোর বিয়ানলো।
চিকন চাকন বিয়ান আমার মাঞ্জা দেহি খালি
মাঞ্জার বিছ্যা গড়ায়া দেব
আমার সাথে গেলি– মোর বিয়ানলো।

নাদুস নুদুস বিয়ান আমার
কান দেহি খালি
কানের দুল গড়ায়া দেবো
আমার সাথে গেলি– মোর বিয়ানলো।

আলুথালু বিয়ান আমার
হাত দুইখান খালি
হাতের চুড়ি গড়ায়া দেব আমার সাথে গেলে
মোর বিয়ান লো– কাইল তোরে চড়াবো
বাইছের নায় ॥

খ.
ওলো ঝিয়্যারী
তাওই ছাড়ে না ঘরবাড়ি।
ঝিয়্যারী যে রান্ধে বাড়ে
চাল দ্যা ওঠে ধুম্যা।
এমন ভ্যাজাইল্যা তাওই গালে খাইল চুম্যা ॥
ওলো ঝিয়্যারি–

তাওই নাচে মাওই নাচে ঘুইর‍্যা নাচে প্যাঁচা
মাগীর কাপড় মিন্‌স্যা পড়ে
আঁইট্যা মারে কাছা ॥
ওলো ঝিয়্যারী–

তাওইর তাপেতে ঝিয়্যারী উঠলো কদম গাছে
এমন ভ্যাজাইল্যা তাওই
উঠলো পাছে পাছে ॥
ওলো ঝিয়্যারী–

শোন শোন বাইছ্যাগণ কারবা পানে চাও
জোরে জোরে বৈঠ্যা মারো
আগে চইল্যা যাও ॥
ওলো ঝিয়্যারী– ।

www.pathagar.com

গ.

ও ভাব নিম্যাই চাঁদ
প্রভাতে গাও তুলে কোথায় গেলি
সোনার পালঙ্ক রইল খালি ॥
একও মাসের কালেরে নিম্যাই নবগঙ্গার জল ॥ ওভাব...
দুই মাসের কালে নিম্যাই করে টলোমল ॥ ওভাব...
তিনও মাসের কালে নিম্যাই রক্তেরই হয় গোলা ॥ ওভাব...
চাইরো মাসের কালে নিম্যাই হাড়ে মাংসে জোড়া ॥ ওভাব...
পাঁচও মাসের কালে নিম্যাই পঞ্চফুল ফোটে ॥ ওভাব নিম্যাই ...
ছয়ও মাসের কালে নিম্যাই মস্তকে চুল ওঠে ॥ ওভাব নিম্যাই ...
সাতও মাসের কালে নিম্যাই সাত শরীল কায় ॥ ওভাব...
আটও মাসের কালে নিম্যাই মায়ের পানে চায় ॥ ওভাব...
নয় মাসের কালে নিম্যাই নয় নবস্থিতি ॥ ওভাব...
দশ মাসের কালে নিম্যাই দুনিয়ায় বসতি ॥ ওভাব...
নিমাই যখন জন্ম নিল লেবু গাছের তলে ॥ ওভাব...
হইয়া যদি মরতি নিমাই না লইতাম কোলে ॥ ওভাব...
আগে যদি জানতাম নিমাই এই ছিল তোর মনে ॥ ওভাব...
আঁতুর ঘরে মারতাম তোরে লবণ গালে দিয়ে ॥ ওভাব...
দেখো দেখো নগরের লোক দেখরে চাহিয়া ॥ ওভাব...
নিম্যাই চাঁদ সন্ন্যাসী হইল জননী ছাড়িয়া ॥ ওভাব...
ঘরে বধূ বিষ্ণু প্রিয়া জলন্ত অগিনি ॥ ওভাব...
আর কতকাল রাখবো তারে দিয়া মুখের বাণী ॥
ওভাব নিম্যাই চাঁদ, প্রভাতে গাও তুলে কোথায় গেলি ॥

ঘ.

বাইচা টান দেরে
বাড়ির ঘাটে যাই
পরপারে আইছে চিঠি
সময় আর নাই
বাইচা টান দেরে।
উজান বাইয়া গেলাম নৌকা
ভাটির খবর নাই
ভাটির খবর আইলেও আর
থাকার সময় নাই।

www.pathagar.com

ঙ.
জোড়ে টান
হেঁইও
আরো জোড়ে
হেঁইও
বৈঠা মার
হেঁইও
যাব হাটে
হেঁইও
হাটের বুড়ি
হেঁইও
পৌনে কুড়ি
হেঁইও

## ৭. ভাইফোঁটার গান

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাইফোঁটা বলে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয় কথার সুরে গান করে।

**গান**
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা
ভাই আমার হোক গ্রামের মাথা
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা
ভাই বোঝে বোনের ব্যথা
ভাই যাও না যথা তথা
ভুলো না ভাই বোনের কথা
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা

## ৮. নবান্নের গান

কৃষিনির্ভর রাজবাড়ী জেলার মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য এক সময় ছিল নিত্যসঙ্গী। আউশ আর আমন ধানই ছিল একমাত্র ফসল এবং তা বছরে একবারই জন্মাত। কখনও খড়া কখনও বৃষ্টি বন্যায় ফসল ধ্বংস হয়ে যেত। এর পরেও কৃষককুল নবান্নে নতুন ধানের আশায় বুক বেঁধে কাজ করত। নতুন ধান ঘরে এলে আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠত।

www.pathagar.com

গান
এবার ধান আইলো ঘরেরে বুঝি
ধান আইল ঘর
পিঠা, পায়াস খাব কত
কত দিন পররে বুঝি
ধান আইল ঘর
আউশ ধানের পিঠা পায়েস
আমন ধানের খই
বিলে আছে কই সিঙ্গী
আর বাজারের দই
রে বুঝি
ধান আইল ঘর।

## ৯. ঢেঁকির গান

আজকের দিনে ধানের কলের দৌলতে আমরা ভুলে গেছি চিরায়ত ঢেঁকির কথা। এই ঢেঁকিই আমাদের আবহমান কালের ধান ভাঙার কৌশল। ধুপুর ধুপুর করে মেয়েরা ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল বানিয়েছে। মেয়েরা কখনও একা আবার কখনও যৌথভাবে ঢেঁকিতে পাড় দেয় আর অন্যরা নোটে (পেট্য) হাত দিয়ে ধান এ পাশ ওপাশ করে। আর সে সাথে গান গায় তারা।

গান
ও ধান বানিরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া
ঢেঁকি নাচে আমি নাচি
হেলিয়া দুলিয়া
ও ধান বানিরে
ঢেঁকির পাড় শুনে ও ভাই
কুটুম আল বাড়ি
তিন কুটুমের গলায় দড়ি
আর কুটুমের আড়ি
ও ধান বানিরে

## ১০. বৃষ্টি নামানোর গান

ঋতুচক্রের সাথে বাংলার মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। বৃষ্টিই জীবনের আশ্রয়। জীবন ধারণের উপাদান। খড়ায় ফসলের মাঠ যখন খা খা করে তা দেখে বুক ভেঙে যায়। চাতকের মতো বৃষ্টির জন্য আকাশ পানে তাকিয়ে প্রার্থনা করে, দোয়া করে নামাজ পড়ে। গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে নাচে আর গান করে।

www.pathagar.com

**গান**

দেওয়ারে তুই অঝোরে নামো
দেওয়ারে তুই আজলে আজলে নামো।
আয়রে ম্যাগ আয়রে দেওয়া
সাজ্জা ক্যজ্জা আয়
পানি বিনে সোনার জমি
খইয়া খইয়া যায়
খরার তাপে কোলের ছাওয়াল
ছটফট ছটফট করে
ফটিক ফটিক জলদে
চাতক কাইন্দা মরে
কোলা ভরা বেচন কান্দে

## ১১. অষ্টক গান

'অষ্টক গান'এ অঞ্চলে এক সময় বহুল প্রচলিত ছিল যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। কালে ভদ্রে দু-এক বাড়িতে অষ্টক গান হয়। সাধারণত শীত থেকে বসন্তকালে অষ্টক গানের আস হতো। বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় অষ্টক গানের বেশি প্রচলন ছিল, তবে অষ্টক গানের আবেদন ছিল মুসলিম সবার মধ্যেই। অষ্টক গানগুলো হিন্দু ধর্মের দেব দেবী পৌরাণিক কাহিনি যেমনঃ রাম লক্ষ্মণ গীতার পালা, চণ্ডীদাস রজকিনী, অভিমন্যু বধ, রাধা কৃষ্ণ (ব্রজ নাগরী, নৌকা বিলাস ইত্যাদি), কার্তিক গনেশ, লক্ষ্মী সরস্বতীর কাহিনি মূলকভাবে রচিত। এসব গান রচয়িতার কোনো নাম পাওয়া যায় না। এ গানগুলো অনেকটা গীতি নাট্যরূপে অনুষ্ঠিত হতো। বিশেষ করে অষ্টক গানে বিষয় বস্তু অনুযায়ী সাজ গোজ করে মেয়ে পুরুষের ভূমিকায় অষ্টক গান পাওয়া হতো।

**আসর বন্দনা**

নমস্তে মা নমঃ দুর্গা
ওঁমা নমঃ দুর্গা নমঃ দুর্গা
ভৈরবী ভবানী মা
কালি মাতঙ্গে॥
কার্তিক আরও গণপতি
ওমা লক্ষ্মী আরও সরস্বতী
নিজগুণে কর দয়া অধমের প্রতি।
হেমন্ত মা সনে ছিল
তাইতে মা তোর দয়া হইল
নিজগুণে এসো মাগো
এই আসর গানে॥

www.pathagar.com

# লোকবাদ্যযন্ত্র

## ১. একতারা

এই লোকবাদ্য যন্ত্রটি তত বাদ্যযন্ত্র শ্রেণির। এই শ্রেণির লোকবাদ্য যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– ১. কোনো কিছু দ্বারা আচ্ছাদিত, ২. দীর্ঘ আকৃতির, ৩. যন্ত্রটিতে তার সংযোজন করা হয়। একতারা মানে, যে বাদ্যযন্ত্রে একটি মাত্র তার সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ একতারের বাদ্যযন্ত্রই একতারা। একতারা খুবই প্রাচীন যন্ত্র। আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের ১৭ সম্যক পদে একতারা গঠন সম্পর্কে জানা যায়।

একতারা তৈরির উপকরণ হচ্ছে একখণ্ড লম্বা বাঁশ বা কাঠের টুকরা, চেপ্টা পাতি লাউয়ের খোলস ও তার। বেনা নামের একটি বাদ্যযন্ত্র আছে যা একতারার মতো। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তা প্রচলিত।

একতারা

## ২. দোতারা

দোতারা ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতী প্রভৃতি লোকগানে বাজানো হয়। এটি খুবই জনপ্রিয় ও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্র ব্যতীত উল্লিখিত গান নিষ্প্রাণ মনে হয় শ্রোতাদের কাছে।

'দোতারা' শব্দটি উচ্চারর সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে পারে দুই তার বিশিষ্ট লোকবাদ্যযন্ত্র এটি। তবে তা ধারণামাত্র। দোতারার প্রয়োজন ৪টি তারের। তবে

www.pathagar.com

কোনো কোনো যন্ত্রী ৫টি তারও ব্যবহার করেন। মোবারক হোসেন খান তাঁর 'বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ' গ্রন্থে ৫টি তারের ব্যবহার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'সুরের বেশ বা ঝংকারের জন্য পঞ্চম তারটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

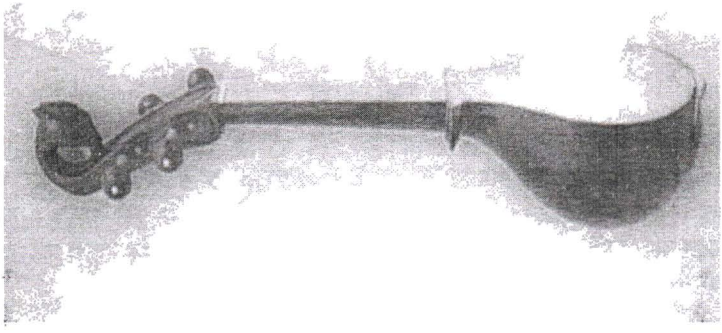

দোতারা

দোতারা তৈরির অন্যতম উপকরণ কাঠের টুকরা, যা লম্বা প্রায় আড়াই ফুট ও প্রস্থ অর্ধফুট। কাঠকে খোদাই করে দোতারা তৈরি করতে হয়। মোবারক হোসেন খান এই যন্ত্র তৈরি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তুলে ধরা হলো– "হাতড়ি-বাটালি সহযোগে কাঠ খোদাই করে দোতারার রূপ দেয়া হয়। নিচের দিকটা একটা খোলের মতো। উপরের দিকটা দণ্ড। খোলের ভিতরটা ফাঁপা। তেমনি দণ্ডের ভিতরটাও ফাঁপা। খোলের উপর একটি চামড়ার ছাউনি বা আচ্ছাদন লাগানো হয়। এক প্রকার আঠা দিয়ে এই চামড়া খোলে লাগানো হয়ে থাকে। দণ্ডের বুক পটরী নামে পরিচিত। পটরীর বুকে একটি ইস্পাতের পাত স্ক্রু দিয়ে দণ্ডের সঙ্গে সংযোজন করা হয়। খোলের শেষ প্রান্তে একটা লেঙ্গুটি আঁটা থাকে। খোলের উপর ছাউনির বুকে একটি কাঠ বা হাড়ের তৈরি সওয়ারি স্থাপন করা হয়।

পটরীর উপরের অংশে একটি কাঠ বা হাড়ের তৈরি তারগহণ থাকে। তারগহণের উপরের দিকে চারটি কাঠের বয়লা লাগানো হয়। এগুলোকে খুঁটি বা কানও বলে। এই চারটি বয়লা থেকে চারটি তার তারগহণের বুক বেয়ে পটরীর উপর দিয়ে সওয়ারি হয়ে লেঙ্গুটে সংযোজিত। দোতারার প্রথম তারটি লোহার মধ্য সপ্তকের মধ্যম স্বরে প্রথম তারের সুর বাঁধা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তার দুটো মুগা সুতো বা নইলনের। এদের সুর বাঁধা হয় সপ্তকের ষড়জে। এ দুটো তারকে জুড়ি তার বা সুর তার বলা হয়। চতুর্থ তারটিকে বাঁধা হয় মধ্য সপ্তকের পঞ্চমে। চতুর্থ তারটিও মুগা সুতো বা নাইলনের। দোতারার পঞ্চম তারটিকে চিকারি বলা হয়। দোতারার দণ্ডের একপাশে একটি বয়লাতে এই তারটি সংযুক্ত থাকে। দোতারা বাজানোর জন্য প্রয়োজন জওয়া"। জওলা নারকেলের মালা দিয়ে তৈরি। জওলাকে গুটিও বলা হয়।

www.pathagar.com

## ৩. খমক

খমক এক ধরনের একতন্ত্রী লোকবাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্র তৈরি করতে প্রয়োজন কাঠের খোল, গরুর চামড়ার চাউনি, লোহার তার বা রগ। খমক, ভাটিয়ালি, ভক্তিমূলক ও বাউল গানে বাজানো হয়। একে গুপী যন্ত্রও বলা হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে খমককে গোপীযন্ত্র নামেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মূল্যায়ন এরকম– বাজাইলে 'গুপ গুপ' শব্দ হয় বলে তা গুপীযন্ত্র।

খমক

## ৪. সারিন্দা

সারিন্দা এক প্রকার তত লোকবাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রটি নির্মাণে পুরো একটি কাঠের খণ্ডের প্রয়োজন। খণ্ডটি প্রায় দুই ফুট লম্বা। কাঠের খণ্ডটির নিম্নভাগ খোদাই করে নিতে হয়। উপরের দিকটা প্রায় দোতারার মতো নকশাযুক্ত। কাঠের খোদাই করা অংশ ফাঁকা থাকে। সরু ক্ষুদ্র অংশে চামড়ার ছাউনি থাকে। নিচ থেকে উপরের সাথে যুক্ত করা হয় তিনটি তার। একটি কাঠের রুলা বা কান যন্ত্রের মাথার কারুকার্যময় অংশে লাগানো হয়, যাতে তার বা তাঁতকে চড়ানো বা নামানো সম্ভব হয়।

সারিন্দা

www.pathagar.com

## ৫. মৃদঙ্গ বা খোল

মৃদঙ্গ বা খোল একটি আনদ্ধ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রের অবয়ব মাটির দ্বারা তৈরি। এর এক দিকে সরু এবং অন্যদিক কিছুটা মোটা। মাঝখানটা অপেক্ষাকৃত মোটা। খোলের দুই মুখে ছাগলের পাতলা চামড়া দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। ছাউনিকে বলা হয় তালা। তালার মাঝখানে থাকে ধুনা। ধুনা হচ্ছে তালার মাঝখানের কালো অংশ। খোল সাধারণত কাঁধে ঝুলিয়ে দুই হাতের আঙুল দিয়ে তাল টুকে টুকে বাজাতে হয়।

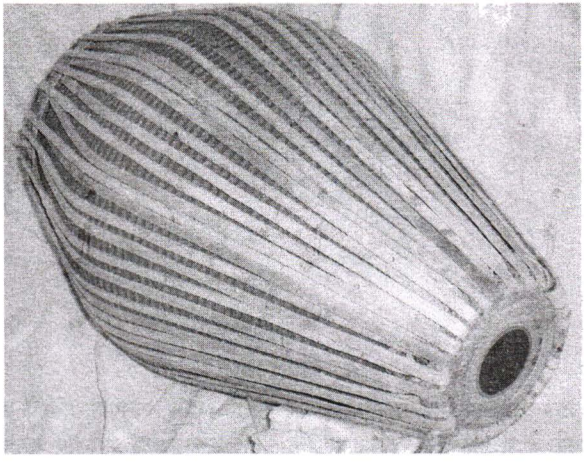

মৃদঙ্গ বা খোল

www.pathagar.com

# লোকউৎসব

সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা ছায়াশীতল রাজবাড়ী জেলা। এই অঞ্চলের লোকজন উৎসবপ্রিয়। হাসি, আনন্দ, দুঃখ, কান্না, বেদনা তথা সামাজিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি দিক দিয়ে তারা নানা রকম উৎসব পালন করে থাকে। এ জেলায় যেসব লোকউৎসব উদযাপন করা হয় সেগুলো আলোচনা করা হলো।

## ১. নবান্ন উৎসব

নতুন ধান ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে রাজবাড়ীতে নবান্ন উৎসব হয়। এটি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক বা কৃষকদের উৎসব। এটি কৃষকের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনে অথবা যে কোনো দিনেও হয়ে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায় থেকে হিন্দু সম্প্রদায় নবান্ন উৎসব বেশি জাঁকজমকভাবে পালন করে। কৃষির সাথে যারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে জড়িত তারা এ উৎসব পালন করে। ফসল কাটার আগে বিজোড় সংখ্যার ধানের ছড়া কেটে নিয়ে মাথায় করে বাড়িতে এনে ঘরের চালে বেঁধে রাখে। উৎসবের দিনে প্রত্যেক বাড়ির লোকজন ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, কাপড় চোপর ধুয়ে পরিষ্কার করে। খুব ভোরে বেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির যে ছোট সন্তান সে ধুতি পরে গোসল করে। গোসল করে ভেজা ধুতি পরে মাঠে যায়। মাঠে গিয়ে তিনটা গোছা থেকে তিনটা ধান দিয়ে তা এক নিশ্বাসে কেটে ফেলে। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় কলার পাতায়, তার মধ্যে কাজল, চন্দন এবং আগরবাতি নিয়ে যায়। তিনটা ধানের ছড়া নিয়ে জমিকে দেবতা জ্ঞান করে তারা পূজা করে। পূজা শেষে এগুলো নিয়ে বাড়িতে আসে এবং আসার সময় কোনো কথা বলে না। যখন সে বাড়িতে আসে তখন উলুধ্বনিও শঙ্খ বাজাতে থাকে। এভাবে গ্রামের সকল বাড়িতে যায়। যখন যে বাড়িতে যায় সে বাড়ি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা তার পায়ে জল ঢেলে দেয়। সব বাড়ি বেড়ানোর পর ধানের ছড়াগুলো একটা ঘরে রাখে। এই দিনে বিকেল বেলা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নবান্ন উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ী জেলায় নানা রকম ছড়া প্রচলিত আছে–

"কো কো কো আমাদের বাড়ির শুভ নবান্ন
শুভ নবান্ন খারা কাক বলি লবা
পাতি কাওয়া লাথি যায়
দাড় কাওয়া কলা খায়
কো কো কো আমাদের বাড়ির শুভ নবান্ন।

www.pathagar.com

নতুন চাল দিয়ে পিঠা বানানো হয়। যে লক্ষ্মী পূজা করে তার প্রসাদ সবাই গ্রহণ করে। কলার পাতায় চাল মাখা কলা, নারকেলের নারু রেখে দেওয়া হয়। মনে করে বছরের শুভ অশুভ এর উপর নির্ভর করে। একে কাকবলি বলে। কাকবলির পর রাতের ধানের বাকি অংশ চাল করে নতুন চালের পায়েস রান্না করা হয়। নতুন চালের এই পায়েসই নবান্ন নামে পরিচিত। আবার রাজবাড়ীরই অনেক জায়গায় নতুন ধানের খিচুরি রান্না করে। রাতে বাড়ির উঠানে বসে প্রত্যেক বাড়ি থেকে পায়ে, খিচুরি এনে খাওয়া হয়। খাওয়া শেষে গানবাজনা, কবিতা, লোকক্রীড়ার আয়োজন করা হয়।

## ২. বৈশাখি উৎসব

বাঙালি জাতিউৎসব প্রিয়। নববর্ষ হলো বাঙালির একটা বড় অনুষ্ঠান। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। পুরো একটি বছরের দুঃখ বেদনা নৈরাশ্য পেছনে ফেলে বছরের নতুন এ দিনটি আসে। রাজবাড়ী অঞ্চলের মানুষ এ দিনটিকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নেয়।

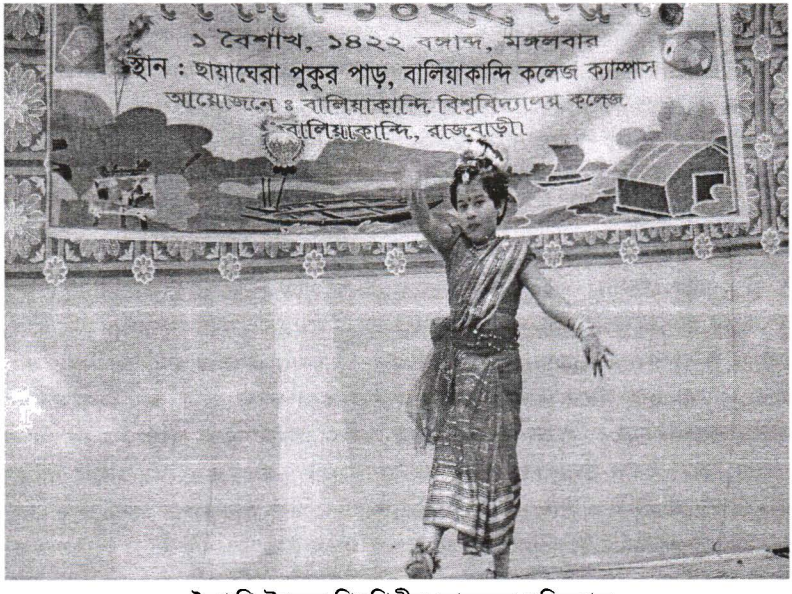


বৈশাখি উৎসবে শিশুশিল্পীর লোকনৃত্য পরিবেশন

পহেলা বৈশাখ সকাল বেলা থেকেই মেলা বসে। এই মেলায় মাটির, লোহার ও কাঠের তৈরি জিনিস, তৈজসপত্র, কেনা-বেচা হয়। মুড়ি, মুরকি, দই, মিষ্টি, নানা রকম খাবার কেনা-বেচা হয়। এই দিনের প্রধান খাবার হলো পান্তা ভাত, ইলিশ, কাঁচা মরিচ। আগের দিনে ভাত রান্না করে পানি দেওয়া হয়। পরের দিন পান্তা ইলিশ খাওয়া হয়। নববর্ষের দিনে রাজবাড়ীতে বই মেলা, খেলা, পুতুল নাচ, লাঠি খেলা, কবিগানের

www.pathagar.com

লড়াইয়ে আয়োজন করা হয়। স্কুল, কলেজ, রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে, কোনো দর্শনীয় জায়গায় মেলা বসে। গান বাজনার আয়োজন করে। মেয়েরা। লাল সাদা রঙের শাড়ি পড়ে।

ছেলেরা পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গামছা পরে। শোভাযাত্রা বের করে ছেলেমেয়েরা। এদিন ছেলে মেয়েরা নানা রকম সাজে। পালকিতে বর কনের দৃশ্য, লাঙল জোয়াল কাঁধে কৃষক– এমনি নানা রকম সেজে বাঙালির সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় এই দিনে। দেশীয় ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে তুলে ধরে এ সব করা হয়। এই দিনে বাংলাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মূলত রাজবাড়ী অঞ্চলের লোকজ উপাদানগুলো বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করে।

## ৩. পৌষ পার্বণ উৎসব

হৈমন্তী ঋতুর ধানের ও গানের উৎসব। নতুন ধান উঠার পর এই উৎসব হয়ে থাকে। পৌষ মাস শেষ হওয়ার আগের দিন থেকে ১লা পৌষ পর্যন্ত এই তিন দিনব্যাপী উৎসব চলে। বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরি হয় এই উৎসবকে ঘিরে। নানা ধরনের পিঠা–যেমন পাটিসাপটা, আলুর পিঠা, তেলপিঠা, পিঁয়াজ পিঠা, কপি বড়া, চিতই পিঠা (সরা পিঠা), ভাপা পিঠা, কুলি পিঠা ইত্যাদি।

জামাই-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। প্রথম দিনে সাধ্যের মধ্যে হিন্দুরা মূর্তি বানিয়ে পূজা করে। পূজা শেষে সবাই মিলে গ্রামের মাতব্বরের বাড়িতে যায়। এক বাড়ির পিঠা অন্য বাড়ি পাঠনো হয়। গ্রামের কৃষকরা ধান কাটার ও আনন্দের গান গায়। বাড়ি বাড়ি থেকে চাল তোলে। ঐ সব চাল দিয়ে খিচুরি রান্না করে সবাই মিলে খায়। এ দিনে ছড়া কাটা হয়।

এক দিবসে সোনার হার
নল কাটিবার যায়
নল কাটিবার যেয়ে
খাটি পালঙ্গও পার।
খাটি পালঙ্গ পেয়ে সোনার হার
শুয়ে নিদ্রা যায়।
দেবীপুরীর একটি কন্যা
গায়ে বাতাস দেয়॥

গ্রামে গরু দিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন রং দিয়ে গরুর গায়ে নকশা করা হয়। এছাড়ায় গলায় লাল রং-এর মালা দিয়ে বা কাপড়ের সাথে ঘুঘরি বেঁধে দেওয়া হয়। সবার আগে গরুকে পিঠা খাওয়ানো হয়। গরু পিঠা খাওয়ার পর সবাই পিঠা খায়, কেননা গরু সারা বছর কষ্ট করে জমি চাষ করে তাতে ভালো ফসল ফলে। গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। দৌড়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। এসময় গ্রামের চেয়ারম্যান, মাতব্বর উপস্থিত থাকে। এছাড়া অন্য খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

www.pathagar.com

## ৪. নৌকা বাইচ

শ্রাবণ মাসে এই উৎসব হয়ে থাকে। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যুব সম্প্রদায়রা চাঁদা তুলে নৌকা বাইচের আয়োজন করে থাকে। গ্রামে যাদের নৌকা আছে তারা সবাই বাইচ হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের নৌকা নিয়ে যায় এবং সারিবদ্ধভাবে নৌকা বেঁধে রাখে। আগে থেকে মাইকে বাইচের দিন নির্ধারণ করা হয়। উৎসবের দিন যারা অংশগ্রহণ করে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। এক একটা নৌকার নাম রাখা হয়। যেমন : মা ফাতেমা, ময়ূরপঙ্খী, শাপলা ইত্যাদি।

কয়েকটা দলে নৌকাগুলোকে ভাগ করে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এরূপ আট দশটি দল হল। প্রতি দলে যারা প্রথম হয় সবশেষে আবার দিন দিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এর মধ্যে থেকেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। এদের পুরস্কার দেখা হয় টেলিভিশন রেডিও, সাইকেল মোবাইল ফোন সেট ইত্যাদি। নৌকায় একজন হালে মাঝি থাকে সে নৌকায় লাইন ঠিক রাখে। আর দুপাশে থাকে বৈঠাধারী মাল্লা বা বাচেরা। মাঝখানে একজন থাকে সারি গাওয়ার জন্য। গানের তালে তালে বাচেরা নৌকা বায়। নৌকার মাঝখানে নৃত্যের জন্য কয়েকজন। গান–

"হেইয়ারে হেইয়া চলো নৌকা বাইয়া

এছাড়াও কিছু বয়াতি থাকে তারা গেয়ে থাকেন :

"বুলেরে বুল হেইয়া বুল
আলা বুলে গেছে চইলা
আরও জোড়ে দিও টান
সবার আগে যাইতে হবে।"

যে নৌকা জয়ী হয় সে নৌকা আশেপাশের গ্রামের বাড়ির ঘাটে ঘাটে গিয়ে টাকা, উপহার নেয়। নৌকায় যারা বাচে থাকে তাদেরকে নৌকার মালিক উপহার দেয় এবং ভূরি ভোজেনের আয়োজন করে।

## ৫. রথযাত্রা

রথযাত্রা হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও রাজবাড়ী জেলায় এ উৎসবে সকল সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বছরের আষাঢ় মাসে রথযাত্রা হয়ে থাকে। রথযাত্রায় ভক্ত পূজারী তার পিছু পিছু যান। এই রথযাত্রায় জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা থেকে শুরু করে শেষ হয় উল্টো রথে। জগন্নাথ রথের সাথে রয়েছেন সুভদ্রা ও বলরাম। রথের পথেই দেবতার ধূলি মন্দির।

মানুষ ও দেবতার এমন সহজ যোগ আর কোথায় নেই। রথের দড়ি টানতে পেরে সবাই নিজেকে সুখী মনে করে। রাজবাড়ী অঞ্চলের প্রায় সকল জায়গায় বিশেষ করে পাংশা থানার শ্মশান এলাকায় বেশি হয়ে থাকে। রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে। এ মেলায় খাবার, সৌখিন দ্রবাদি, আসবাবপত্র পাওয়া যায়। সবাই মিলে মিশে এ উৎসব করে থাকে।

www.pathagar.com

## ৬. জন্মাষ্টমী

রাজবাড়ী জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আর একটি জনপ্রিয় উৎসব হলো জন্মাষ্টমী। অনেক আনন্দের সাথে এ উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসব হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য হলেও এটা শুধু হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উৎসবে ভক্তিতে, আনন্দে, আবেগে বর্ণগোত্র নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করে থাকে। জন্মাষ্টমী শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে পালিত হয়ে থাকে। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দিনে উপবাস থাকলে সাত জনমের পাপ মুক্ত হয়। সুপুত্র লাভ হয়। পরকালে স্বর্গ পাওয়া যায়। ভক্তরা উপবাস থেকে রাতে কৃষ্ণ পূজা করে। গান গাওয়া হয় পূজার সময়।

কৃষ্ণ এলে এ সংসারে
আনন্দ আর ধরে নারে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়।

## ৭. চরক উৎসব

রাজবাড়ী জেলার হিন্দু সম্প্রদায় চরক পূজার আয়োজন করে থাকে। এই উৎসব চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে হয়ে থাকে। এই পূজাতে মানুষের পিঠে বড়শি বিঁধে সেই বড়শিতে রশি বেঁধে তা একটি শক্ত গাছের সাথে বেঁধে ঘুরানো হয়। বালা শ্রেণির হিন্দুরা চরক পূজার আসর আচরণ করে থাকে। এদের মধ্যে একজন বালা গুরু থাকেন। তিনিই সমস্ত কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

চৈত্র মাসের পনেরো তারিখে থানে ঘট বসানো হয়। তারপর একটা আসন তৈরি করা হয়। এই আসন নিয়ে গ্রামে গান গেয়ে চাউল ও টাকা মেগে। এই উৎসবে ঢাকঢোল ও নানা রকম বাদযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই সময় বালা গুরু বিশেষ নিয়ম পালন করে। সে পনেরো দিন নিরামিষভোজী থাকে শুধু রাতে ভাত খান। এটা একটা কষ্টদায়ক উৎসব। তবে এ অনুষ্ঠান আগের মতো না হলেও একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। যে গাছে চরক ঘোরান হয় তার নাম মাদার গাছ। গাছটি ১৮/১৯ হাত লম্বা হয়। গাছ পোঁতার পর গাছ পূজা করা হয়। গাছ পূজার উপকরণ হিসেবে লাগে আতপ চাল, ফলমূল, চন্দন, বেলপাতা ইত্যাদি। বিকেলের দিকে গাছ পূজা শেষ হলে ব্যক্তির পিঠে বরশি বিঁধান হয়।

## ৮. রাস উৎসব

এই উৎসবটি গোয়ালন্দ থানার চরবালিয়াকান্দি গ্রামে হয়ে থাকে। আগে অনেক জাঁকজমক করে এ অনুষ্ঠান হতো। বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। ৮টি কৃষ্ণ ও ৮টি গোপীর মূর্তি তৈরি করা হয়। একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাঝে রাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি থাকবে এবং চারপাশের চারজন কৃষ্ণ ও সাথীর যুগল থাকবে। এদের সঙ্গে থাকবে বড়ায়ি বুড়ির

www.pathagar.com

মূর্তি। প্রত্যেক মূর্তির সামনে আড়াই দিনে ১০৮ বার ভোগ দিতে হয়। মাটির মালসায় লুচি, মিষ্টি, বিভিন্ন রকম ফলমূল দিয়ে এই ভোগ দিতে হয়। আড়াই দিন শেষে একজন বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভোগ হিসেবে খিচুরি দিয়ে। সাতদিন পর ধান, দূর্বা দিয়ে এই মূর্তি ডুবিয়ে দিয়ে রাস পূজা উৎসব শেষ হয়।

## ৯. আশুরা বা মহররম উৎসব

মহররম একটি মাসের নাম। এ মাসটি মুসলমানদের জন্য অতীব পবিত্র ও করুণ দিন। রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ ও পাংশাতে এই উৎসব বেশি হয়ে থাকে। কারবালার বিষাদময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালন করা হয়। কারবালার ময়দানে ইমাম হোসেনের শহিদ হবার ঘটনা খুবই শোকাবহ। শিয়া মুসলমানগণ হোসেনের মাজার অনুকরণে তাজিয়া বানায়। এই তাজিয়া নিয়ে সবাই মিছিল করে। মিছিলকারীরা ঢাল, তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের অভিনয় করে। বর্ষা, লাঠিও যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। আবার একদল মুসলমানরা বলে এই দিনে চোখের পানি ফেলা ঠিক নয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা খালি গায়ে নিজের গায়ে আঘাত করে থাকে আর হায় হোসেন,হায় হোসেন বলতে থাকে। রাজবাড়ী অঞ্চলে এই দিনে আশেপাশের বাড়ি থেকে চাল, টাকা তুলে সবাই মিলে খিচুরি রান্না করে খায়।

## ১০. নুটানি লোকউৎসব

এই উৎসব হিন্দু মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই পালন করে থাকে। সন্তান জন্মের পর এই উৎসব হয়ে থাকে। সন্তান যদি নানার বাড়িতে জন্মে তাহলে দাদার বাড়ির লোকজন বাজার করে নানার বাড়িতে সন্তান দেখতে যায়। আর যদি দাদার বাড়িতে সন্তান জন্মে তাহলে নানার বাড়ি থেকে লোকজন বাজার করে দাদার বাড়িতে যায়।

এ সময় যে পক্ষ বাজার করে তারা সন্তানসহ বাড়ির মহিলাদের শাড়ি, মাছ, সেমাই, চিনি, পানসুপারি, মিষ্টি, তেল, বিছানা, মাজার সুতা, হাতে পরার বালা নিয়ে যায়। আগে এর সাথে ভাত, তরকারি, মাংস রান্না করে নিতে যেত। কিন্তু অনেক দূরে হলে রান্না করা খাবার নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিবহন ঝামেলা বলে এখন রান্না করে নেওয়া হয় না। এ উৎসব প্রতিটা পরিবার করে পালন থাকে।

## ১১. গুরু দাবড়ানো উৎসব

পৌষ মাসের শেষের দিন এই খেলা উৎসব হয়ে থাকে। এলাকার যারা বিত্তবান, যাদের অনেক গরু আছে তারা এই উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এলাকার সব চেয়ে বড় বড় গরু এই উৎসবে আনা হয়। গরুকে রাগানোর জন্য উৎসবের আগের দিন রাতে গরুকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হয়। প্রত্যেকটা গরুর জন্য ৫০/৬০ জন লোক নিয়োগ করা হয়। তাদেরকে ঐ দিনে উত্তমরূপে খাওয়ানো হয়। গরুকে ভালো করে

www.pathagar.com

গোসল করিয়ে লাল কাপড় দিয়ে সাজানো হয়। ৫০/৬০ জন লোক দুপুরে গরুগুলোকে প্রতিযোগিতার জায়গায় নিয়ে যায়। হাজার হাজার লোক উপস্থিত থাকে। তিনটি গরু প্রতিযোগিতা করতে পারে। তিনটি গরুকে মাঠের মধ্যে সবার সামনে ঘুরিয়ে মাঠের মাঝখানে শক্ত খুঁটির সাথে বাঁধা হয়। গরু যিনি লালন-পালন করেন তিনি গরুকে রাখিয়ে দেন। যে গরু দড়ি ছিঁড়ে আগে দৌড় দিতে পারে সেই প্রথম হয়। প্রথম স্থান অধিকারী গরুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

## ১২. বিচার গানের উৎসব

প্রতিবছর আশ্বিন অথবা কার্তিক মাসে এ উৎসব হয়ে থাকে। কয়েক দিনব্যাপী এ উৎসব হয়ে থাকে উসব বেশির ভাগই পাঁচ দিনব্যাপী হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে দিন বাড়ানো কমানো হয়।

বিভিন্ন জায়গা থেকে বয়াতিদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়। দুপুর দুটোর সময় এই উৎসব শুরু হয় এবং মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। অনেক দূর দূরান্ত থেকে এই উৎসবে লোকজন আসে, দশ/বারো জন বয়াতির মধ্যে প্রতিদিন দুজন করে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে মহিলাও থাকে।

একদলের দলনেতা প্রথমে উঠে আল্লাহ রাসুল এবং পরবর্তীতে গ্রামের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ মানুষকে ভক্তি শদ্ধা জানিয়ে বন্দনা করে। তারপর অপর দলও অনুরূপভাবে বন্দনা করে। এরপর দুই দলের মধ্যে গানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একেকজন বয়াতির গান প্রায় পঁচিশ/ত্রিশ মিনিট করে হয়ে থাকে। তাদের গানের বিষয় হলো-

* গুরু শিষ্যের পালা
* শরীয়ত মারফত
* নবুয়ত বেলায়েত
* জীব পরম
* হাশর কেয়ামত
* কাম প্রেম
* নারী পুরুষ

একজন বয়াতি গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে এবং অপরজন উত্তর দেয়। এভাবে চলতে থাকে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তর। যারা বিচার গান করেন তাদের অনেক বিষয়ে জানাতে হয়। একজনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সেও আবার প্রশ্ন করে। প্রচুর দর্শক হয়। দর্শকেরা এর মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে। সবশেষে দুই জন বয়াতি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং এভাবে শেষ হয়ে যায় সেদিনের গানের উৎসব। যথারীতি পরের দিন আবার শুরু হয়। এভাবে চলতে থাকে। এই উৎসবকে ঘিরে মেলা বসে। উৎসবে আমাজে মেতে ওঠে পুরো গ্রাম।

www.pathagar.com

## ১৩. মহোৎসব

রাজবাড়ী জেলার বারিয়াকান্দি থানার মহোৎসব বেশি হয়ে থাকে। বাসুদেব গোস্তামীর বাড়িতে এই উৎসব হয়ে থাকে। মাঘ ফাল্গুন মাসের কোন এক সময়ে তাদের সুবিধামতো এটি করে থাকে। বাসুদেব গোস্বামীর শিষ্যরা চাল, ডাল সঙ্গে নিয়ে আসে। শিষ্যরা রাত-দিন গুরু বন্দনা করে কীর্তন করে থাকে। তারা ভজন, দেহতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পকীয় কীর্তন করে থাকে। পরের দিন সকালে গোষ্ঠী কীর্তন করে। শ্রীকৃষ্ণ বাল্য সখাসহ মাঠে যে খেলা করতেন সে সম্পর্কীয় কীর্তন করে থাকে। উৎসব দুই/তিন দিন ধরে হয়ে থাকে। প্রথম দুই দিন তারা মাছ খায় না। ৩য় দিন তারা মৎস্যমুখী করেন। অর্থাৎ মাছ খায়। তারপর গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে চলে যান। অনেক আগে থেকেই এই সাংস্কৃতিক মহোৎসব হয়ে আসছে। তবে বর্তমানে খুব কমই এ উৎসব দেখা যায়।

www.pathagar.com

# লোকমেলা

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো রাজবাড়ী অঞ্চলেও বেশ কয়েকটি লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখি উৎসব বৈশাখি মেলা ও অন্যান্য সামাজিক উৎসবে বিভিন্ন মেলার পাশাপাশি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি লোকমেলার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

## ১. লুসির মেলা

রাজবাড়ী সদর উপজেলার বরাট ইউনিয়নের ভাকলা মৌজায় জমিদার বাগচী বাবুদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল লুসির মেলা। এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের ১২ তারিখ। মেলায় ২ দিন আগ থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজনের সমাগত হতো। বর্তমানে তেমনটি আর পরিলক্ষিত হয় না। তারপরও স্থানীয় পর্যায়ের লোকদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি।

চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় আয়োজন হয়ে থাকে নাগরদোলা, পুতুল নাচের। মেলায় কৃষকরা সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন এই মেলার জন্য। কারণ, এই মেলা থেকে তারা কেনে গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য ধামা, সাজি প্রভৃতি। লোক পেশাজীবীদের বাড়তি আয়ের উৎসও এই মেলা। ময়রার দোকানে বাতাসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যও পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পী বিভিন্ন ধরনের খেলনাসহ নানা ধরনের পণ্য নিয়ে বসেন। বেচাকেনাও ভালো হয় এই মেলায়।

## ২. হাজরা তলার মেলা

রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলার পাচুয়া এবং ছোট ভাকলা ইউনিয়নের মধ্যস্থলে অনুষ্ঠিত হয় হাজরা তলার মেলা। এই মেলাকে চড়ক পূজার মেলাও বলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই মেলার আয়োজন করা হয়। গৃহস্থঘরের নানান সামগ্রী খুব সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এই মেলায়।

## ৩. ঢেঁকি গারিয়ার মেলা

রাজবাড়ী সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের পাশে ১লা বৈশাখ এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের কৃষকদের নিয়ে একটি পূজার আয়োজন করেন। আর সেখানেই মেলাটির প্রচলন হয়। মেলায় সাধারণ মানুষে তাদের পছন্দের সামগ্রী বিশেষ করে বাঁশ, বেত ও মাটির পণ্য কিনতে পারেন।

www.pathagar.com

## ৪. বারুনির মেলা

রাজবাড়ী সদর উপজেলার খলিলপুরে নদীর পাড়ে বসে বারুনির মেলা। এই মেলাতেও শিশু-কিশোরদের খেলনাসহ গৃহস্থ ঘরের আসবাবপত্রসহ নানান পণ্য পাওয়া যায়।

## ৫. দুর্গাপূজার মেলা

গোয়ালন্দ ঘাটে শত বছর থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুর্গাপূজার মেলা। দুর্গাপূজা উৎসব উপলক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন হয়ে আসছে। মেলায় নানান ধরনের নকশি পাখা, খেলনা, লোকখাদ্যসহ গৃহস্থালিতে সহায়ক এমন বাঁশের ও মাটির তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

## ৬. চৌদ্দ হাত কালীপূজার মেলা

পাংশা উপজেলার গণপুত্যর গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় চৌদ্দ হাত কালী পূজার মেলা। সাত দিনব্যাপী চলে এই মেলা।

## ৭. রথের মেলা

রাজবাড়ী সদর উপজেলার আক্রবুনিয়া গ্রামে বসে রথের মেলা। রথের মেলায় বিভিন্ন লোক পেশাজীবীর দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

# লোকাচার

সমাজে বসবাস করার জন্য মানুষকে কিছু নিয়মনীতি, আচার অনুষ্ঠান পালন করে চলতে হয়। আর এ কারণেই সমাজকে কেন্দ্র করে রাজবাড়ী জেলায় বেশ কিছু প্রচলিত আছে।

## ১. গর্ভবতী মায়ের সাত খাওয়ানো

সাধারণত গর্ভবতী মায়ের সাত মাস পুরো হলে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে গর্ভবতী মায়ের সাত খাওয়ানো বলে। রাজবাড়ী জেলার সকল জায়গাতে এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সাত মাসে পড়লে মেয়ের বাবার বাড়ি থেকে লোকজন শ্বশুর বাড়িতে আসে। আসার সময় তারা বাজার সদাই করে আসে অর্থাৎ পান-সুপারি, মিষ্টি, মাছ, কাপড়, আরো অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসে। অনুষ্ঠান করে আত্মীয়দের আপ্যায়ন করা হয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে বউকে শাড়ি দেয়। এই শাড়ি পরিয়ে মেয়েকে এক জায়গায় বসিয়ে মিষ্টান্ন রান্না করে খাওয়ানো হয়। তাকে ঘিরে বাচ্চারা বসে থাকে এবং মিষ্টি খায়। ওই সময় মেয়ের কাছে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মেয়েকে বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

## ২. অন্নপ্রাসন

মেয়ে সন্তান জন্মের ৭ মাস পরে এবং ছেলে সন্তান জন্মের ৫ মাস পরে এ উৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবের মাধ্যমে সন্তানেরা মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য বাড়তি খাবার খেতে পারে। এর আগে দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার দেওয়া হয় না। উৎসবের মাধ্যমে সন্তানের মঙ্গল কামনা করা হয়। এই দিনে বিভিন্ন প্রকার খাবার রান্না করা হয়। হিন্দু হলে পুরোহিত ডেকে সন্তানের মুখে ভাত তুলে দেওয়া হয়। মুসলমান হলে মসজিদের ইমাম অথবা মৌলবি ডেকে মুখে ভাত দেওয়া হয়। আত্মীয় স্বজন, পড়ার লোকদের খাওয়ানো হয়। অনেকেই বাচ্চার জন্য উপহার আনে।

## ৩. আশীর্বাদ অনুষ্ঠান

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের একটি অংশ। আশীর্বাদ করতে যে সকল উপাদান লাগে তা হলো ধান, দূর্বা, কুলা, প্রদীপ, মিষ্টি ইত্যাদি। বরপক্ষ থেকে লোকজন মেয়ের বাড়িতে এসে ধান, দূর্বা ইত্যাদি মেয়ের মাথায় ছুঁইয়ে দেয়। অনুরূপভাবে মেয়ে বাড়ি থেকেও ছেলেকে ধান, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে আসে। উভয় পক্ষই সাধারণত অতিথি ও

www.pathagar.com

অভ্যাগতদের আদরযত্ন করে এবং বর মেয়ের জন্য উপহার সামগ্রী দেয়। বর্তমানে আশীর্বাদ হিসেবে আংটি, চেইন দেওয়া হয়। বিয়ের দিনে অথবা আগে এই আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

## ৪. গায়ে হলুদ

হিন্দু-বর্তমানে রাজবাড়ী জেলার সকল মুসলিম পরিবারের বিয়েতেই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠান না হলে বিয়ে যেন পরিপূর্ণতা পায় না। বিয়ের আগের দিনে গায়ে হলুদ হয়। বর পক্ষ কনের বাড়িতে যায় এবং কনের বাড়ির লোকেরা বরের বাড়িতে যায়। মা, চাচি, পিসি, মামিরা সকলে ঢেঁকিতে হলুদ কোটে। মা হলুদ নোটে নেড়ে দেয়। এ সময় মুখের মধ্যে পান দিয়ে থাকে এবং কোনো কথা বলে না। মনে করা হয় তাহলে বর কনে মিতভাষী হবে। আর যারা ঢেঁকিতে পার দেয় তারা এবং ভাবী, বোন, দাদি, নানিরা সকলে মিলে গীত পায়।

"হলুদ কোটে ডুগুরে ডুগু
আজকে হলদি কুটবার আইসে
জমিদারের বেটি।"

কুলাতে পান, সুপারি, পাঁচটি প্রদীপ, ধান, এক ফানা কলা, পাঁচ রকম শস্য। ৭টা দূর্বা ঘাস, চাল দিয়ে কুলা সাজিয়ে ঢেঁকির পাড়ে যেতে হয়। দুই পক্ষের লোকই আসার সময় হলুদের শাড়ির ছায়া, ব্লাউজ, জড়ি, আলতা, প্রসাধনী, মাছ পান, সুপারি নিয়ে আসে। ফুল দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে বসিয়ে রাখার হয়। একজন করে বা দুজন করে মেয়ে বা ছেলের গায়ে হলুদ দেয় এবং মিষ্টি খাওয়ার, এ সময় বর বা কনেকে সালামি দেওয়া হয়।

## ৫. চৈত্র সংক্রান্তি

এটি চৈত্র মাসের শেষ দিনে হয়। গ্রামের মহিলারা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে। ঘরের মেঝেতে, বাড়ির আঙিনায় আলপনা আঁকে। মহিলারা মুড়ি, মুড়কি বানায়। গ্রামের সবার বাড়িতে সবার দাওয়াত থাকে। রাতে, খিচুরি, মুড়ি, মুড়কি, পায়েস রান্না করা হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে। ভোজন শেষে কীর্তন পরিবেশিত হয়।

## ৬. গাজির গানের আসর

মানুষের মনের আশা পূরণের জন্য বিশেষ করে সন্তান লাভ, রোগ-বালাই মুক্তির জন্য গাজি বাবার নিকট মানত করা হয়। বুহকাল আগ থেকে রাজবাড়ী জেলায় এই উৎসব পালি হয়ে আসছে।

গাজির গানের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়। ঐ মঞ্চে গাজি বাবাকে অনুসরণ করে লাল কাপড়ের উপর একটা দুই হাত লম্বা লাঠি ও তার মাথার ওপর মানুষ আকৃতির

www.pathagar.com

একটা ছবি এঁকে দেওয়া হয়। এটাকে গাজির প্রতিচ্ছবি বলে উল্লেখ করা হয়। গাজির গানের অভিনেতা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে এতে অভিনয় করে থাকে। ঐদিনে তারা মাথার তেল ব্যবহার করতে পারে না এবং মাছ, মাংস খেতে পারে না। এছাড়া গাজির কাছে যে আশা থাকে তা গান শুরুর আগে তা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। মানতের চাল ও পয়সার পরিমাণও সুনির্দিষ্ট। কোনো অবস্থাতেই এগুলোর পরিমাপ কম বেশি করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে পয়সার পরিমাণ ৫১ টাকা, ১টি কুলা, ৫টি পান, ৫টি সুপারি, ১ পোয়া দুধ, ১টি আগরবাতি, সিঁদুর, ১টি কলস, ১টি গামছা, ১ কাঁদি কলা, সোয়া সের চাল ও আধা সের ধান। গাজির গানে শিরনির প্রচলন আছে। মানতের সময় মালিক যে পরিমাণ চাল, ডাল দেয় এগুলো গাজির নামে শিরনি করে। গাজির গান রাতে হয়ে থাকে। বর্তমানে গাজির গানে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বন্দনা করে গাজি কালুর পুথি পাঠ করা হয়। মানতকারীর সামনে কুলায় করে মানতের দ্রব্য রাখা হয়। আশা মানতকারীর সামনে পুঁতে রাখা হয়। গাজি কালুর পুথি পাঠ শেষে গান গেয়ে টাকা উঠানো হয়। বর্তমানে আগের দিনের মতো গাজির গান পরিবেশিত হয় না। এখন গাজির গানে নাচ গান বেশি হয়। তবুও গাজির গানের জনপ্রিয়তা কমেনি। এখনও মানুষের বিশ্বাস গাজির নামে মানত করলে আশা পূরণ হয়।

## ৭. মানত

রাজবাড়ী এলাকার মানুষ বিশ্বাস করে যে, মানত করলে তাদের মনের আশা পূরণ হয়। এই বিশ্বাসে তারা মাজার, মন্দির ও দ্বেতাদের নামে মানত করে থাকে। এই সময় বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা কেউ কেউ উপোস থাকেন। এই উপলক্ষ্যে বাড়িতে অনুষ্ঠান হয় এবং যে মাজার বা দেবতার নামে যে জিনিস মানত করা হয় সে জিনিস সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়। ঠাকুরের কাছে উপকরণ পৌঁছানোর পর উপোস ভাঙা হয়। বিশ্বাসের উপর এই উৎসব পালন করা হয়। তারা মনে করে এ ধরনের উৎসব পালন করলে তাদের আশা পূরণ হয়।

## ৮. গোসল করানো অনুষ্ঠান

বিয়ে এবং সুন্নাতে খতনাতে গোসল করানোর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ছেলে বা মেয়ের বিয়ের আগের দিন এ অনুষ্ঠান হয়। আর সুন্নাতে খতনার ৭ দিন পর এ অনুষ্ঠান হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করার পর আগে আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত করা হয়। বলে আসা হয়। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। গোসালের দিনে যাদের দাওয়াত করা হয় সে সকল মহিলারা পায়েস, ভাত, মাংস, ডিম অথবা সেমাই রান্না করে নিয়ে আসে। অনুষ্ঠান শুরু হয় সাধারণত দুপুরে। এ সময় মেয়েরা বিয়ের গীত গায়। বাড়ির উঠানের ওপর বড় পিঁড়ি দেয়। আর একটা শাড়ি চাদোয়ার মতো করে তার মধ্যে ৭টা পান, সুপারি, দূর্বা ঘাস ৭টা করে দিতে হয়। সলতে জ্বালাতে হয়। কুলার উপর সলতে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। বিয়ের ছেলে বা মেয়ে ঘরে বসে থাকে। সম্পর্কে যারা ভাবী হয় তারা কোলে করে উঠানে যেখানে পিঁড়ি দেওয়া

www.pathagar.com

থাকে সেখানে নিয়ে আসে। পিঁড়ির উপর বসিয়ে ভাবী বরণ কনের নখ কেটে দেয়। একে কামানো বলে। এ সময় মেয়েরা কামানোর গীত গায়। উপরে শাড়ি কাপড় চাদুয়ার মতো ধরে রাখতে হয়। এর মধ্যে এ পান সুপারি থাকে। কামানো শেষে গায়ে সাবান দেওয়া হয়। এ সময় গোসলের গীত গায়। সাবান দেওয়া শেষে পানি দিয়ে ভালোভাবে গোসল করানো হয়। নতুন কাপড় পরাতে হয়। এর পর ভদদরো কাটে। যে ভাবি থাকে তিনি বদনার পানি নিয়ে বিয়ের মেয়ে/ছেলের চার পাশে ৭ বার ঘোরে আর বদনার পানি মুখে নেয়। আশেপাশের সবাই জিজ্ঞেস করে কার ভদদরো কাটো আন। তিনি নাম বলেন। তারপর আতপ চাল গুড় দিয়ে মাখিয়ে সবার হাতে দেয় এবং সবাই খায়। ভদদরা কাটার সময় বর/কনে একটা পান মুখে দেয় আর একটা মাথায় দেয়।

## ৯. খির খাওয়ানো অনুষ্ঠান

বর/কনেকে গোসল শেষে মঞ্চে নিয়ে আসে। আগে থেকেই জায়গা ঠিক করে রাখে। সামনে পায়েস দেওয়া থাকে। এই পায়েস শুধু দুধ আর লবণ, আতপ চাল দিয়ে রান্না করে। মা, খালা, মামি, চাচি, নানি দাদিসহ সবাই এসে একটু করে খির/পায়েস বর/কনের মুখে দেয় আর যে যা পারে টাকা দেয়। এভাবে বাড়ির সবাই এবং পড়ার লোকজন, আত্মীয়স্বজন খির খাওয়ার। এই টাকা পরে বাড়ির ছোট ছেলেছেলেরা ভাগ করে নেয়।

## ১০. ব্যাঙের বিয়ে

হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই আচার পালন করে। দেশে যখন খরা অনাবৃষ্টি হয়, ফসল বোলান জন্য পানি দরকার কিন্তু বৃষ্টি হয় না, তখন তারা ব্যাঙের বিয়ে আচার পালন করে। বিশ্বাস করে সবাই এই আচার পালন করলে বৃষ্টি আসবে। তারা জমিতে ফসল ফলাতে পারবে। গ্রামের একটা বাড়িতে মিলে একত্র হয়ে বাড়ির উঠানে গর্ত করে। তারপর গর্তে পানি পানি দেয়। এর ২টা ব্যাঙ আগে থেকেই ধরে রাখা হয়। একটা ব্যাঙকে মেয়ে বানানো হয় অন্যটাকে ছেলে বানিয়ে এর এই গর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। রাজবাড়ী জেলার মানুষের বিশ্বাস ব্যাঙ ডাকলে সে দিন বৃষ্টি হয়।

## ১১. আমাবতি আচার

এ আচার পালন করা হয় সাধারণত আষাঢ় মাসে। সারা দিন রাত বৃষ্টি হয়। এভাবে অনেক দিন ধরে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির দিনে সামর্থ্য অনুযায়ী ইলিশ মাছ কিনে আনে। ইলিশ মাছ এনে মান কচুর ভাঁটা দিয়ে ঘটো রান্না করা হয়। গুড় ছাড়া পায়েস রান্না করে। এই পায়েস রান্না করা হয় মূলত কাঁঠাল দিয়ে খাওয়ার জন্য। গাছে কাঁঠাল থাকলে আগেই কাটা হয়। কাঁঠাল পাকলে সেই দিন পায়েস রান্না করে। কাঁঠাল বাড়িতে না থাকলে বাজার থেকে কিনে আনে। রান্না হলে গেলে থালায় করে প্রতিবেশীদের বাড়িতে দিয়ে আসে। তারাও আবার দিয়ে যায়। আত্মীয়দেরও অনেক সময় দাওয়াত করা হয়।

www.pathagar.com

## ১২. খাল পার হওয়া অনুষ্ঠান

কোনো গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব হতে দেরি হলে তখন এ আচার পালন করা হয়। সম্ভাব্য তারিখে বাচ্চা না হলে ভাবা হয় এ আচার পালন করলে সন্তান তাড়াতাড়ি প্রসব হবে।

গর্ভবতী যে বাড়িতে থাকে সে বাড়িতে কোনো আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি থেকে খাবার রান্না করে ঐ বাড়িতে আনতে হয়। এনে ঐ গর্ভবতীকে খাওয়াতে হয়। খাবারের মধ্যে থাকে মাংস, ডালের বড়া, ভাত, সবজি, সেমাই, পায়েস ইত্যাদি। গর্ভবতীসহ বাড়ির সবাই আত্মীয় স্বজনদের সাথে ঐ খাবার খায়।

## ১৩. বৃষ্টি নামানোর বন্দনা বা হলুদ দেওয়া

এই বন্দনাতে কমপক্ষে ৮/১০ জন কিশোরীর প্রয়োজন। এর মধ্যে একটা মেয়ে যে বাবা মায়ের একটি মাত্র কন্যা সন্তান হতে হবে। তার মাথায় একটা কুলা রাখা হয়। কুলাটি বিভিন্ন রকম উপকরণ দিয়ে সাজাতে হয়।

উপকরণ : কুলা, ঘটি, সরিষা, তেল, পানি, সিঁদুর, আমের পাতা, চারটা কচিকলা গাছ।

পদ্ধতি : ঐ গাছের ঘেরার মধ্যে কুলা রেখে তার ওপর ঘটি বসিয়ে পানি ভর্তি করে ঘটির মুখের ওপর তেল দিয়ে তারপর আমের পাতা সাজিয়ে দিতে হয়। চার পাশে সরিষা দিতে হয়। সিঁদুর দিয়ে আমের পাতা সাজিয়ে নেওয়া হয়। কুলাটা মেয়ের মাথা দিয়ে সারা গ্রামে ঘুরতে হয়। সমস্ত গ্রাম ঘুরে এসে কুলাটা আবার কলা গাছের মধ্যে বসায়। তারপর সবাই মিলে নাচ গান করে থাকে। গান হলো-

"দেওয়া নামে বিন্দু বিন্দু ইঠান ভরা পানি
তুমি দেওয়া ভাদিয়া পরো
চিনার ক্ষেত্রে চিনাচিনা পানি
ধানের ক্ষেত্রে হাটু পানি
ও দেওয়া নামোরে
গবির কাঙাল বাঁচারে।"

যদি বৃষ্টি না আসে এভাবে সাত দিন বন্দনা চলতে থাকে। সাত দিন ধরে গ্রামে যখন মেয়েরা ঘোরে তখন চাল, ডাল তুলে থাকে। শেষের দিনে ঐ সমস্ত চাল-ডাল দিয়ে খিচুরি রান্না করে গ্রামের সবাই মিলে খায়। এই বন্দনা সাধারণত চৈত্র মাসে হয়ে থাকে। বংশপরম্পরায় চলে আসছে এ আচার অনুষ্ঠান। এলাকার মানুষ মনে করে যে এই উৎসব পালন করলে সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামে এবং ক্ষেতের ফসল ভালো হয়। গ্রামের মানুষকে বাঁচায় তাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এ উৎসব হয়ে থাকে।

## ১৪. গুক্কু নাড়ু

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এই উৎসব পালন করে থাকে গোয়ানন্দ খানার চরকা বালিয়াকান্দি গ্রামের মানুষ। গাভীর বাচ্চা হওয়া উপলক্ষে এই উৎসব পালন করে

www.pathagar.com

থাকে। গরুর দুধ দিয়ে নাড়ু তৈরি হয় বলে এই উৎসবের নাম গুক্কু উৎসব। দৃঢ় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এই এলাকার মানুষ এই উৎসব পালন করে থাকে।

উপকরণ : কলার পাতা, ঘাস ও দুধের তৈরি নাড়ু।

পদ্ধতি : এই উৎসব মূলত গরুকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। গাভীর বাচ্চা ২১ দিন হলে এই পূজা শুরু করতে হয়। এক মাসব্যাপী এই পূজা হয়ে থাকে। পূজা যতো দিন না করা হয় ততো দিন গাভীর দুধ খায় না এবং বিক্রিও করে না। পূজা যে দিন থেকে শুরু হয় সে দিন থেকে গরুর দুধ দিয়ে নাড়ু তৈরি করা হয়। সন্ধ্যার পর কলার পাতার উপর নাড়ু সাজাতে হয়। মোট ৭টা নাড়ু থাকে। এর মধ্যে ৬টা ছোট নাড়ু আর একটা বড় নাড়ু বানানো হয়। চারদিকে ৬টা ছোট নাড়ু এবং মাঝে বড় নাড়ু দিয়ে সাজাতে হয়। তারপর পূজা শেষে একজন ব্যক্তি ঐ বড় নাড়ু পিছনের দিকে বেঁকে খাবে। আর বাকি ছয়টা নাড়ু অন্যরা ভাগ করে খাবে। পূজা শেষ হলে তারা দুধ খেতে পারে এবং বাজারে বিক্রি করতে পারে। যেহেতু এক মাসব্যাপী এই পূজা করতে হয় তাই প্রতিদিন পূজা শেষে পূজার প্রসাদ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে হয়। পূজা করার নিয়ম হলো একটা মাটির ঢিবির উপরে দুই আঁটি ঘাস দিয়ে পূজা করতে হয়। পূজা শেষে এক আঁটি ঘাস সরিয়ে নিতে হয়। পরের দিন সকাল বেলা ঐ ঘাসের আটি আবার ঢিবির ওপর রাখতে হয়। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ঐ পূজা করা হয়। পূজা যেদিন শেষ হয়ে যায় সেদিন যে ব্যক্তি পূজা করে তাকে উপোস থাকতে হয়। পূজার প্রসাদ তৈরি করে ঐ মাটির ঢিবির উপর রাখতে হয়। তারপর এক মাসব্যাপী যেসব উপকরণ জমা হয় সেগুলো পানিতে নিক্ষেপ করতে হয়। তারপর সবাই মিলে প্রসাদ খায় এবং যে ব্যক্তি উপোস থাকে সেও উপোস ভাঙে। এভাবে গুক্কু নাড়ু আচার পালন করে।

## ১৫. ভূত তাড়ানো

ভূত তাড়ানো বা ভূত দাবড়ানো অনুষ্ঠান গ্রামবাসীর অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই উৎসব পালন করে।

উপকরণ : পাটি, পুরাতন কাপড়, তার, কেরোসিন, লাঠি ইত্যাদি।

পদ্ধতি : পাট দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করে সেটাকে তার দিয়ে বাঁধতে হয়। গ্রামের মধ্যে কোনো ফাঁকা জায়গায় এই উৎসব করা হয়। বড় একটা ভূত তৈরি করে। তারপর ঐ ফাকা জায়গায় গিয়ে পাটের তৈরি বলগুলো কেরোসিন দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। বলগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে ঘুরাতে হয়। কয়েকজন মুখোশ পরে ভূত সাজে। যে বড় ভূত তৈরি করা হয় সেটা নিয়ে সবাই নাচানাচি করে কিছু সময় পর ছেলেরা কেরোসিন মুখে নিয়ে জ্বলন্ত বলের উপর ছিটিয়ে দেয়। তাতে আগুন আরো জ্বলে ওঠে। যেহেতু অন্ধকার রাতে করা হয় সেহেতু অদ্ভুতুরে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আগুন যখন আস্তে আস্তে কমে আসে তখন বড় ভূতটাকে আগুনে পোড়াতে থাকে আর ছড়া কাটে—

"ইচ্যার গুড়া খলস্যার গুড়া
ভূত দাবড়াবো পশ্চিম মিথ্যা।"

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান শেষে সবাই বাড়িতে চলে আসে এবং প্রত্যেকের বাড়ির সামনে একটা করে পাট কাঠি পুঁতে রাখে। তাদের বিশ্বাস এই পাট কাঠির মাধ্যমে গ্রামের সকল অমঙ্গল দূর হয়ে যায়।

## ১৬. ভিটা পূজা

এই উৎসব সাধারণত পৌষ মাসে হয়ে থাকে। পূজার মাধ্যমে এই উৎসব করা হয়। শরীরের ঘা দূর করে কিভাবে সুন্দর পতি পাওয়া যায় সেজন্য এ আচার পালন করা হয়। মূলত মেয়েরাই এ আচার পালন করে থাকে।

উপকরণ : কলা গাছ, বড়ই গাছের ডাল, দুই আঁটি ঘাস, বিভিন্ন রকম ঘাস ফুল।

পদ্ধতি : মাটিতে কলাগাছ পুঁততে হয়। বড়ই গাছের ডালের সাথে যে কাঁটা থাকে তার সাথে ফুল গাঁথতে হয়। তারপর কলা গাছের সামনে একটা মাটির ঢিবি বানিয়ে তার ওপর এগুলো রাখতে হয়। ঢিবির উপর জল ঘটি রাখতে হয়। প্রসাদ তৈরি করেও রাখতে হয়। সাধারণত গোধূলি লগ্নে পূজা শুরু হয় এবং সন্ধ্যায় শেষ হয়। তারপর সবাই মিলে প্রসাদ খায় এবং নাচ গান করে থাকে। যেমন–

ভিটা কুসুমের মারে
ভিটা বেঁধে দে
তোর ছাওয়ালেক করবে বিয়া
বাজনা এনে দে।"

## ১৭. গোছ আঁকা

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা গোছ আঁকা আচার পালন করে। ধানের চারার গোছা লাগানো উপলক্ষ্যে উৎসবটি করা হয়। বলে একে গোছ আঁকা বলা হয়।

উপকরণ : কলা, চাল ও এক গোছা ধানের চারা।

পদ্ধতি : বাড়ির যিনি কর্তা বা প্রধান তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে ধুতি পরে গোসল করেন। পরে ভেজা ধুতি পরে মাঠে যান। এ সময় তাঁর হাতে থাকে কলা, চাল ও ধানের চারা। তিনি উপোস থাকেন। জমিতে গিয়ে প্রথমে জমির পূজা করে থাকেন। যে ধানের চারাগুলো হাতে করে নিয়ে আসেন সে ধানের চারাগুলো মাটিতে পুঁতে দেন। তারপর ধান লাগানো শুরু হয়। এর আগে কেউ ধান জমিতে লাগায় না। কর্তা কলা, চাল একসঙ্গে মেখে সবাইকে খেতে দেয়। কর্তাকে সারা দিন উপোস থাকতে হয়। রাতে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু লোক খাওয়ান। আগে রাজবাড়ী অঞ্চলে প্রায় সবাই এই আচার মানতো, বর্তমানে অতোটা মানা হয় না। জমিতে ফসল যাতে ভালো হয় সে জন্য এই বিশ্বাস এই আচার পালন করে।

## ১৮. কাশি পূজা

এই উৎসব তিথি ধরে অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসে হয়। রাতের বেলায় এই আচার পালন করা হয়। পূজার উদ্দেশ্য হলো কাশির সাথে যেসব ভূত থাকে সেগুলোর সান্তনা দেওয়া।

www.pathagar.com

উপকরণ : ৪টা পাঁঠা, দশ জোড়া কবুতর, মদ, গাজা ইত্যাদি।

পদ্ধতি : সবগুলো পাঠাকে সিঁদুর দিয়ে সাজানো হয়। তারার মদ দিয়ে গোসল করানো হয়। স্নান করানোর পর বলি দেওয়া হয়। বলি দেওয়া মাংস গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি বানানো হয়। একটা দুধের মিষ্টি, একটা আখের মিষ্টি, একটা দুধ, তিল, চিনি ও বিভিন্ন প্রকার মসলা দিয়ে তৈরি হয়। সকল বাড়িতে এই মিষ্টিগুলো বিতরণ করা হয়। যেখানে এই পূজা করা হয় সেখানে একটা নেওড়া গাছ থাকে। গাছের নিচে পূজার আসন। বিভিন্ন প্রসাদ দিয়ে পূজা করা হয়। এ আচার হিন্দু সম্প্রদায় করে থাকে।

## ১৯. গাম্মি পূজা

রাজবাড়ী জেলার হিন্দু মুসলিম সকলেই এই পূজা করে থাকে। আশ্বিন মাসের শেষে এবং কার্তিক মাসের প্রথমে এই পূজা করা হয়। ভোর রাতে এই পূজা করা হয়।

উপকরণ : গাম্মি পূজা করতে যেসকল উপকরণ লাগে তা হলো নারকেল, তালের কুটি, শামুক, সাত পদের শাক, ধানের শিষ, বাঁশের শিষ, কাঁকড় মাটি, পানাপুটি, হলুদের ফুল, কাঁচা হলুদ, তেঁতুল, পাটের বীচি, কলমি, গরুর দাড়ি, আমগানের কুশি, কুলা, চাল মাপার সের, কচুর লতি, আয়না, চিরুনি, নিমের পাতা, ধামা খড় ইত্যাদি।

পদ্ধতি : ভোর রাতে উঠে খালি ঢেঁকিতে সাতটা পার দিতে হয়। তিন জায়গা লেপতে হয়। উপকরণগুলো ধামায় করে নিয়ে লেপা জায়গাতে রাখতে হয়। ২য় লেপার স্থানে খড় বিছিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় এবং ঐ আগুনে পূজার উপকরণগুলো ছেঁকতে হয়। কলসির মধ্যে পানি দিয়ে তার মুখের ওপর আমের কুশি দিয়ে তেল ঢালতে হয়। মশা তাড়ানোর জন্য কুলা ও খড় দিয়ে বাড়ির আশেপাশে কুশি মাড়তে হয় এবং বলতে হয়–

"মশা মশা পাক বারসা
মশার গলায় দড়ি
সব মশা উড়ে গেল
বানের বাড়ি।"

শেষ রাতে তয় লেপার জায়গায় গড়াগড়ি করতে হয়। তারপর সকাল বেলা হলুদ, নিমের পাতা বাটা পায়ে মেখে ছেলেমেয়ে উভয়ই গোসল করে আসে। মেয়েরা কচুর লতি দিয়ে চুল বাঁধে। কলসির তেল সবাই গায়ে মাখে। তারপর খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে তারা অনুষ্ঠান শেষ করে।

মুসলমানদের মধ্যে দেয়া যায় যে সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির লোকজন যে গাছে ফল ধরে না সে গাছ কেউ কাটতে যায়, দা নিয়ে একজন কোপ দেওয়ার অভিনয় করে। আর বলে ফল ধরে না এ গাছ কাটতো, অন্যজন বলে নানা এবারের বছর দেখ। তখন সে লোক কাটতে যায় সে বলে তাইলে থাক। মুসলমানরা এ উৎসব করে মূলত গাছে ফল ধরার জন্য বা বৃদ্ধির জন্য। তাদের বিশ্বাস, এভাবে করলে গাছে আগামীতে ফল ধরবে। এ কাজ খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে করা হয়।

www.pathagar.com

# লোকখাদ্য

অঞ্চল ভেদে মানুষের উপভাষার মধ্যে যেমন রয়েছে স্বাতন্ত্র্য তেমনি লোকখাদ্যের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র্য। ফলে রাজবাড়ী অঞ্চলের এমন কিছু লোকখাদ্য আছে যেগুলো অন্য অঞ্চলে পাওয়া যাবে না। আবার পাওয়া গেলেও স্বাদের দিক থেকে, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছে।

## ১. আমসত্ব

আমের মৌসুমে এলাকার মহিলারা আমসত্ব তৈরি করেন। এর জন্য বেশি পাকা আম লাগে। আমগুলো ছিলে হাত দিয়ে চটকিয়ে আঁটিগুলো ফেলে দেয়া হয়। অতপর আমের রসগুলো একটি পাত্রে রেখে দেয়া হয়। পোড়া মাটির নকশা করা পট বা কাঠের পিঁড়ি বা খেজুরের মাদুরের ওপর ছড়িয়ে রোদে শুকাতে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ পরপর পাত্রে রেখে দেয়া বাকি রস ওপরে হাত দিয়ে ছাড়িয়ে লেপে দেয়া হয়। ৪/৫ দিন পর যখন এটা পুরু এবং রোদে শুকিয়ে শক্ত হয়, তখন পাত্র থেকে টেনে উঠিয়ে আলাদাভাবে আরও ২/১ দিন রোদে শুকিয়ে শক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়। এগুলো মুড়ি বা দুধ-ভাতের সাথে খাওয়া হয়।

## ২. তালগুড়

তাল গাছের 'জট' বা তালের নতুন কাঁদি থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করা হয়। জট বা কচি কাঁদির মাথা ছুরি দিয়ে কিছু অংশ কয়েক দিন কেটে ফেলে দেয়ার পর যখন রস নামে তখন প্রতিটি জট বা কাদির মাথায় ছোট ছোট হাঁড়ি বেঁধে দেয়া হয়। রাত্রে এবং দিনে প্রায় ৪/৫ বার হাঁড়িগুলো বদল করা হয়। সংগৃহীত রস পাত্রে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। গুড় দিয়ে ছোট ছোট সুস্বাদু 'পাটালি' তৈরি করা হয়।

## ৩. আকরা

চাউল রান্না করার পর যে ভাত তৈরি হয়। সে ভাতকে নরম করে চালানীর মতো ছাকনির উপর রেখে ছড়িয়ে দিতে হয় রোদে। রোদে শুকানোর পর গরম বালিতে মুড়ির মতো ভাজা হয়। যা আকরা হিসেবে এ অঞ্চলে মুখরোচক লোকখাদ্যে পরিণত হয়।

## ৪. টাকি মাছ ভর্তা

ছোট ছোট টাকি মাছ সিদ্ধ করে কাঁটাগুলো ফেলে দিয়ে ঝাল-মশলাসহযোগে ভর্তা তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

## ৫. রামদিয়ার মটকা

চাউলের গুড়া ও চিনি এবং গরম মশলা মিশিয়ে মুণ্ড বানিয়ে চাক চাক করে ঘি মিশ্রিত তেলে ভাজতে হয়। রোদে শুকাতে হয় এবং তিল ছড়িয়ে দেয়।

## ৬. কচুর খাটা

এক সময় রাজবাড়ী অঞ্চলের প্রচলিত সুস্বাদু একটি লোকখাদ্য বুনো কচুর মুথাগুলি মাটির নিচে থেকে তোলা হতো। সেগুলো কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে নেয়া হতো। মুথাগুলো সিদ্ধ করে উপরের আবরণ তুলে ফেলা হতো। তারপর সেগুলোকে চটকিয়ে মোলায়েত করে তেঁতুল, গুড়, পানি ও লবণ এবং অন্যান্য মশলা দিয়ে পাক করা হতো। দেখতে অনেকটা ঘন ডালের মতো ছিল। এভাবেই রান্না করে পরিবেশন করা হতো। স্থানীয় ভাষায় এটিকে কচুর খাটা বলা হতো। এ খাবারটি এখন প্রায় লুপ্ত।

## ৭. কুলসি পিঠা

চাউলের আটা পানিতে গরম করে গ্রামে রুটি বানানোর কাইয়ের মতো কিছুটা শক্ত রাখতে হয়। তারপর খেজুরের গুড় দিয়ে পানিতে ভাঁপ দিয়ে কুলসি পিঠা বানাতে হয়। এ পিঠা এ অঞ্চলের খুবই জনপ্রিয় ও মুখরোচক পিঠা।

এছাড়াও এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লোকখাদ্য রয়েছে যেমন : রাজবাড়ীর চমচম, পাংশার শঙ্কর চানাচুর এবং বালিয়াকান্দির দই প্রভৃতি।

www.pathagar.com

# লোকনাট্য

## ১. রাম লক্ষ্মণের কাহিনি

বর্ণনা : ওরে বাল্মিকীর তপোবনে লব কুশি দুই ভাই
খেলা করে বনে বনে,
যজ্ঞের অশ্ব যায় সেখানে
ও আরও লবকে কুশি দেখাই সারা।
ওরে অশ্বের কপালে লিখে আছে, যে ঘোড়া বাঁধিবে
মোদের সংগে যুদ্ধ দিবে
আরো নইলে যে জন অবশ্যে মরিবে ॥

লবকুশ : কশি বলে লব দাদা এতো ভারি মজা
ধরো অশ্ব বেঁধে রাখি,
যুদ্ধ করব তাতে ভয় কী
আরো দেখি ব্যাটা কোথাকার রাজা।

রামলক্ষ্মণ : ওরে কে তোমরা যজ্ঞের অশ্ব রেখেছো বান্ধিয়া
দেও হে মোদের অশ্ব ছাড়ি
নইলে যাবা যমের বাড়ি
নইলে যুদ্ধ দেও হে সম্মুখে আসিয়া।

লবকুশ : কুশি বলে লব দাদা সহিতে না পারি
ধরো ধনুক যুদ্ধ করি
পাঠাইব ব্যাটারে যমের বাড়ি
আরও যেও নারে পলায়ন করি।

রাম : কী নাম তোদের হয়রে, পিতার
আমায় বল না শুনি
তোদের ভাব দেখিয়া আমার মনে হয়
তোরা দুটি ভাই আমার তনয়
একবার পিতা বলে কোলে আয় দুই ভাই

লবকুশ : মাতা মোদের দীনহীন পিতা নহে চিনি
আমরা বনে থাকি বনের ফল খাই

www.pathagar.com

রাম : এবার তোমার পরিচয় কি বল শুনি
ওরে ওরে ওরে শিশু এতোই অহংকার
একটি বানে দুইটি ভাইয়ের
পাঠাইব যমালয়ে এবার
শিশু বলে ক্ষমিব না আর।

ঘটনা : যুদ্ধ হলো রাম লক্ষণ মারা গেল ছেলেদের হাতে

সীতার বিলাপ : ওরে কোন বনে বাঁধিয়া এলি
আমার জীবন রঘুমনি, পুত্র হয়ে শত্রু হলি
আমার সিথির সিঁদুর মুছাইলি
আমার বনবাসে বিধবা ঘটাইলি

লবকুশি : কেন্দো না আর মা জননী
এসেছি এই বনে
দিয়ে সদাদুর কুমণ্ডলের পানি
বাঁচাই লাম রঘুমনি
এবার পুত্র মাতৃ দেশে আগমন।

## ২. রাধাকৃষ্ণ : নৌকা বিলাস

মেয়ে : আমরা ব্রজ নাগরী
দুগ্ধের ভাঁড় মাথায় করি
(তুমি) পার কর হে রসিক লইয়া
মোদের সহে না দেরি।

ছেলে : তোমরা দাঁড়াও হে কূলে
আসি নৌকার জল ফেলে
দেখ জলে বোঝাই থাকলে নৌকা
বাইলে কি চলে।

মেয়ে : শোন নবীন কাণ্ডারি
তোমার নাম জিজ্ঞেস করি
তুমি শীঘ্র করে দাও পরিচয়
মোদের সহে না দেরি।

ছেলে : আমার নাম কালি চরণ
খেওয়া দিচ্ছি অনেকক্ষণ
দেখ সবাইকে পার করতে পারি
হইলে একমন।

www.pathagar.com

মেয়ে : শোন নবীন কাণ্ডারি
আমরা অবলা নারী তুমি বল বল কত লইবা
পারেরই কড়ি॥

ছেলে : শোন ব্রজ নাগরী
আমি প্রেমের ভিখারি
দিয়ে প্রেম আলিঙ্গন
পার হয়ে যাও
লাগবে না কড়ি।

মেয়ে : ক্রোধে কয় বড়াই বুড়ি
তোমার সাহস তো ভারি
তুমি ঘাটের ও পাটুনি হয়ে
কথা কও ভারি।

ছেলে : তরি এনেছি কূলে
তোমরা এসো সকলে
এবার মধ্য নৌকায় থোও পাশরা
লয়ে যাই কূলে ॥

মেয়ে : দেখি তোমার ভাঙা নাও
দেখে করছে মোদের ভয়
পার হবো কী দূরের কথা
ডুবে মরবো যমুনায়।

ছেলে : আমার তরী নয়
দেখে করছে কেন ভয়
কত হস্তী, ঘোড়া রাত্র দিনে
পার করি সদায়।

বর্ণনা : এসে মধ্য যমুনায়

ছেলে : উঠলো তরঙ্গেরই ভয়
বুঝি ডুবলো তরী
ও কিশোরী এসো পাছা নায়।

বর্ণনা : ভেবে অধম বিজয় কয়
শোন কৃষ্ণ দয়াময়
দিয়ে চরণ তরী ভব বাড়ি
পার কর আমায়।

www.pathagar.com

## ৩. চণ্ডীদাস ও রজকিনির বড়শি বাওয়ার গান

বর্ণনা : দেবী বাগলিয়ার দেশে দ্বীজ
চণ্ডীদাস গোঁসাই
ও এক বড়শি হাতে নদীর ঘাটে
দ্বীজ মাছ ধরে সদাই
কন্যা ওপার বসে কাচে কাপড়
মনে ময়লা নাই॥

রজকিনি : ঘাটে কেগো তুমি নবীন সুন্দর
কোথায় তোমার বাস
মনের কিবা অভিলাষ
আমি যখন কাচি কাপড় নবীন
তুমি ধর মাছ,
তুমি আড় নয়নে চেয়ে থাক
লজ্জা নাই তোমার ॥

চণ্ডীদাস : তুমি শোন শোন ওগো ধনী
পরিচয় আমার
আমি ব্রাহ্মণের কুমার
তুমি যখন কাপড় কাচো ধনী
আমি ধরি মাছ।
তাইতে আড় নয়নে চেয়ে থাকি
লজ্জা নাই আমার ॥
(আকট)

রজকিনি : আর কি তুমি পাওনি সময়লো
ওরে আমি যখন কাপড় কাচি লো দ্বিজ

চণ্ডীদাস : কাজ কি তোমার বসন কাচা লো
আমার সঙ্গে চলো চলো লো ধনি।

রজকিনি : তুমি যে ব্রাহ্মণের ছেলে লো
জাইত যাবে তোর প্রেমে পইড়ে লো ॥
(পয়ার)

রজকিনি : ওরে একলা ঘাটে পেয়ে আমায় করলে অপমান
শোন ব্রাহ্মণের কুমার
তুমি বড়শি বেয়ে মাছ না পেয়ে দ্বীজ
ছিপে কামড়াও ক্যান
সদায় আমার পানে চেয়ে থাকো আমি লজ্জায় মরে যাই॥
(কতকতা)

www.pathagar.com

রজকিনি : ওগো ঠাকুর, মাছ কি ধরল?
চণ্ডী : বারো বছর পর আজ এক টিপ দিল।
রজকিনি : ও ঠাকুর, মাছ ধরার কী মন্ত্র জানো?
চণ্ডী : না, জানি না।
রজকিনি : (গান) তু যেও গো, ওগো ঠাকুর
সন্ধ্যায়, মন্ত্র আমি শেখাব তোমায়
মাছ ধরার একমাত্র জানি
যেও ঠাকুর আমার বাড়ি
মন্ত্র আমি শেখাব তোমায়
চণ্ডীদাস : কী কতা কহিলে তুমি
বল বল আবার শুনি
তোমায় বিনে ঘরে থাকা দায় ॥
রজকিনি : আমার মিলন তোমার সাথে
মালা আমি রেখেছি গেঁথে
আমার মালা তোমায় করব দান ॥

বর্ণনা : ওরে চণ্ডীদাস আর রজকিনি
প্রেমে মহাজন।
শুনি সাধকের বচন।
তারা এক মরণে দুইজন মরে
এমন শুনি নাই কখন।
তারা প্রেম করিয়া স্বর্গে গেল
মহতের বচন ॥

**অভিমান্য বদের কাহিনি**

ওরে গুহ চক্রে অভিমান্য অর্জুনের নন্দন
অস্ত্র সৈন্য রণস্থলে।
অভিমান্য কেন্দে বলে, এই বিপদে আমার
প্রাণ গেল।
যুদ্ধে আসবার কালে বারে বারে
মা করেছিল মানা
না শুনিয়া মায়ের বারণ
যুদ্ধেতে করিলাম গমন

www.pathagar.com

এবার অন্যায় যুদ্ধে জীবন আমার গেল।
ঘিরেছে আজ সপ্তরথী গুহ চক্রের রণে
বান ছেড়েছে অবিরত
আর প্রাণে সহিব কত
দেহ জড় জড় বানেরই আঘাতে
প্রাণ প্রেয়সী উত্তরা আমার
রহিলে কোথায়।
এই বিপদে পড়িয়ে একা
আর বুঝি হইল না দেখা
আমি বিদায় হলাম জনমের মতো।
ওরে বিপদকালে পিতামাতা রহিলে কোথায়
এই বিপদে পড়ে একা, ভাই-বন্ধু সব রহিলে কোথা
কোথায় মাতুল চক্রধারী
দেখে যাও হে ত্বরা করি
কোথায় মালুল নরনারায়ণ।
আকট :
বান আঘাতে প্রাণ যায় আর প্রাণ যায়
বানে অঙ্গ জড় জড় গো
কোথায় রলি মাতা পিতা গো
কোথায় রলি ও প্রাণ প্রেয়সী গো ॥
ওরে অভিমান্যের দশা দেখে বলে নারায়ণ
তুমি আর কেঁদো না অভিমান্য এসেছি তোমারি জন্য
তোমায় লয়ে যাব গোলক ধানে ॥

www.pathagar.com

# লোকক্রীড়া

## ১. সাকো খেতা

সাকো খেতা খেলাটি সাধারণত পাঁচটি গুঁটি নিয়ে খেলা হয়। দুজন খেলোয়াড় খেলাটি খেলে থাকে। প্রথম জন দান চালানোর সময় হাতে পাঁচটি গুঁটি নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় জন সেই পাঁচটি গুঁটির মধ্যে থেকে একটি গুঁটি বাদ দেয় যে গুঁটিটি ছোঁয়া যাবে না। যদি শুয়ে যায় তবে দান শেষ। এখন বাদ দেওয়া গুঁটি বাদে অন্য একটি গুঁটি হাতে নিবে। বাম হাতের তর্জনি এবং বৃদ্ধাঙুলি মাটিতে ঠেকিয়ে সাকো তৈরি করে। পান হাতের গুঁটি শূন্যে ছুড়ে দিয়ে হাতের ছোঁয়া দিয়ো সাঁকো অর্থাৎ বাম হাতের তর্জনি ও বৃদ্ধাঙুলের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশ পার করবে । যদি পার না করতে পারে তবে দান শেষ। এভাবে একে একে চাপটি গুঁটি পার করবে পার করা হয়ে গেলে বাম হাত তুলে নেবে ডান হাত দিয়ে একটি গুঁটি শূন্যে ছুড়ে বাকি তিনটি হাতের মুঠোয় নেবে এবং শূন্যের গুঁটিটিও ধরবে। এভাবে এক এক করে পয়েন্ট হতে থাকবে। যদি না পারে তবে দান অন্য জন পারে। পয়েন্টের ভিত্তিতে খেলে জয় পরাজয় হবে। যে বেশি পয়েন্ট পারে সে জয়ী হবে।

## ২. ধাপ্পা খেলা

এই খেলাটি সাধারণ মেয়েরা খেলে। ৮/১০ বদরের মেয়েরা ঘরে বসে কিংবা স্কুলের অবসর সময়ে তারা এই খেলা খেলে। ২/৩ জনের বেশি এ খেলায় অংশগ্রহণ করা যায় না। আর তাদের মধ্যে প্রথমে বাটাবাটি হয়। যে প্রথমে ওঠে সে খেলতে শুরু করে তারপর দ্বিতীয় জন তারপর তৃতীয় জন। এ খেলা হাতের খেলা তারা ভালো এক জায়গায় বসে একটা খাপড়া দিয়ে চারকোণা করে ঘর দাগায় আর সেই ঘরে চারটা ভাগ করে। আর হাতের এক নখ দিয়ে তারা সেই খাপড়াকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। এভাবে পার করে আর ছিকলি বলতে হয় এক নিশ্বাসে। ছিকনি বলে খাপড়া পাড় করতে পারলে চোম হয়। যে ছিকলি বলে তা হলো-

'হারিব ভিতর মসুড়ি
সেই তো আমার শাশুড়ি।'

## ৩. নাচটি ছাগল কাটি খেলা

১৮/২০ জন এই খেলাটি খেলতে পারে। এই খেলা ছেলে ও মেয়ের উভয়ের খেলা। খেলার শুরুতে দুই দলে সমানভাবে সদস্য সংখ্যা ভাগ করে নিতে হয়। আর তাদের মধ্যে টস হয়, যে দল টসে জিততে পারে সেই প্রথম লাফ দেয়।

www.pathagar.com

দুই দলে দুই জন রাজা হয়। আর বাদ বাকি সবাই সারি হয়ে দুই পাশে বসে। রাজা এক জনের নাম এক এক রকম রাখে আর অন্য রাজাও তাই করে। তাদের মাঝে যে দূরত্ব থাকে সেই দূরত্ব মাঝখানে একটা বুড়ি রাখে যদি সে বুড়ি আগে আনতে পারে তাহলে সেই দল অন্য দলকে একটা গেম দেবে। বুড়ি আনার সময় তারা ছিকনি বলে।

ছাগল কাটিরে ভাই ছাগল কাটি
কিরে ভাই লক্ষ্মী কাটি
তোর ছাগলে খাইছে ধান
খায়াটানা বারা যান।
তোমাগো বাড়ি কার বিয়ে
আমাগো বাড়ি ফুলের বিয়ে
কি বাজারে, ঢোল বাজারে।

এভাবে কথোপকথনের মাধ্যমে যে দল আগে বুড়ি নিয়ে থাকে, বুড়ি নিয়ে গেলেই গেম হয়। বুড়ি নেওয়া দল জয়ী হবে।

## ৪. বানে বউ বানে বউ খেলা

এই খেলাটি মাঝে মাঝে কথোপকথন আছে। এই খেলার শুরুতে খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। ১০ জনে খেলাটি খেলতে হয়। ছেলেমেয়ে উভয়ই এ খেলা খেলে। নির্দিষ্ট দুটি দাগ দুই পাশে দেয়, এক দাগ থেকে শুরু করে সবাই পায়ের বুড়া নখের উপর ভর দিয়ে আরেক দাগে যায়। এই খেলা রাস্তা, বাড়ির উঠানে যে কোনো জায়গায় খেলা যায়। খেলার শুরুতেই তারা বলে–

বান বউ বান বউ
মুখ খান ধুয়ে আসি
ছুরি খান নিয়ে আসি।

এই কথা বলতে তারা এক দাগ থেকে আরেক দাগে যায়, যে পেছনে পড়ে সে বুড়ি হয়। বুড়ির একটা কাঁঠাল বানায়। সবাই সেই গাছ থেকে কাঁঠাল চুরি করে। তখন বুড়ি সাথে সাথে বলে–

প্রশ্ন : আমার কাঁঠাল গাছের নিচে কিডারে
উত্তর : আমি-রে
প্রশ্ন : টাকা দিবি কবে
উত্তর : লাল শুক্র বারে
প্রশ্ন : পয়সা দিবি কবে
উত্তর : লাল শুক্র বারে

তখন তারা বলে ঐ বুড়ি তোর কাঁঠাল পাকে না তো পয়সা দেব না। তারপর যখন কাঁঠাল পাকে তখন বুড়ি জিজ্ঞাসা করলে বলে কাঁঠাল ফুরিয়ে গেছে। একথা শোনার পরে বুড়ি তাদেরকে তাড়া দেয়। প্রথমে যাকে মারে সে আবার বুড়ি হয়। এভাবে খেলা চলে। যতক্ষণ খুশি।

www.pathagar.com

## ৫. মালাবদল খেলা

এই খেলাতে দুট দল লাগে। প্রত্যেক দলে ৫ জন করে খেলোয়াড় থাকে। প্রত্যেক দলে ৫ জনের মধ্যে ১ জন করে প্রধান থাকে। সেই প্রধান বাকি চার জনের নাম দেওয়ার জন্য পছন্দমতো ফল কিংবা ফুলের নাম বেছে নেবে। রাজা বা প্রধান তার দলের যে কোনো এক জনের কোছার মধ্যে এমনভাবে মালা দেবে যাতে অপর দলের কেউ দেখতে বা বুঝতে না পারে কার কোছার মধ্যে দিল। অপর দলের খেলোয়াড় যদি কার কোছায় মালা আছে ঠিক ঠিক বলতে পারে তাহলে পাট্টি হবে এবং তাদের রাজা মালা লুকাবে। আর যদি ঠিক ঠিক বলতে না পারে তবে সেই দলের রাজাই আবার মালা লুকাবে এবং তাদের পাট্টি হবে। এই খেলাকে রাজবাড়ী জেলার অনেক অঞ্চলে কোস্তোয়া খেলা বলে। মাংস চুরি বা গোশত চুরি এই খেলায় দল থাকে ২টা। দুদলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। এক এক দলে কম পক্ষে ৪ জন করে থাকতে হয়। দাগের একপাশে একদল অন্য পাশে আরেক দল থাকবে। যারা দান পাবে তারা এক নিশ্বাসে গোশত আনার চেষ্টা করবে, অন্য দল ঠেকাতে চাইবে। এভাবে যদি আনতে পারে তবে তারা এক গেম বা ১ খান ঘাড়ে দেবে আর আনতে না পারলে অন্য দল দান পাবে। গোশত আনার সময় নিশ্বাসে বলে–

ঐ পাড়ে গিয়ে ছিলাম
ডাল ভাত খেয়েছিলাম
ডাল হাতো ঘনো
আমার নাম মোন।

এভাবে খেলা চলতে থাকে।

## ৬. সাতপাতা

এই খেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় নেই। একজন চোর হয়। বাকি সবাই গোল করে করে ঘর কোণায়। প্রত্যেকে ঐ ঘরের মধ্যে থাকে। এরা বলে–

আতা পাতা
কিসের পাতা?

চোর তখন কোনো একটা পাতার নাম বলে। যদি বলে আম পাতা তখন সবাই বলে এক নিশ্বাস 'আমের পাতা কী ঝামুর ঝুমুর' এভাবে বলে আম গাছের পাতা নিতে আসে ঘরে এসে দম ফেলে। এভাবে চোর সাতটা পাতার নাম বলে। সাতটা পাতা আনা হয়ে গেলে চোর অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে আর এরা মাটি খুঁড়ে পাতাগুলো পুঁতে রাখে। পোঁতা শেষে তারা চোরকে খুঁজে বের করতে বলে। চোর যার ঘরে পাতা খুঁজে পাবে সে আবার চোর হবে। আর না পেলে ঐ চোরই আবারও চোর হবে।

## ৭. আকাশে তিন তারা

বেশ কয়েকজন মিলে এই খেলাটি খেলতে হয়। একজন হাত টান করে বসে থাকে আর সবাই তার উপর দিয়ে লাফ দেয়। লাফ দেওয়ার সময় ছড়া বলে–

www.pathagar.com

আকাশের তিন তারা
আমার নাম জাহানারা
আমি কি জানি
ঠান্ডা লেবুর পানি
হাতে দেব মেরিল ঘড়ি
কানে দেব দুল।

লাফ দিয়ে পার হওয়ার সময় চোরের পায়ে লেগে যায় তাহলে সে আবার চোর হবে। এভাবেই খেলাটি চলতে থাকে।

## ৮. ভেবি খেলা

এটি পানির খেলা। কলা গাছের ভেলা বানিয়ে পানিতে ভাসিয়ে খেলা হয়। এই খেলায় বেশ কয়েকজন খেলতে পারে। ভেলা ধরে ভেসে থাকে সবাই। এভাবে থাকতে থাকতে যে আগে পানিতে ডুব দেয় সে মারা যায়।

## ৯. কলাডুম ডুম

এই খেলা খেলতে পাঁচ জন লাগে। চারকোনা দাগ লাগে। মাঝে একটা গোল থাকে সেখানে চোর থাকে। চার জনের একজন করে বলে–

কলা ডুম ডুম কলা ডুম ডুম
হাসনা পুটি সাচ সা দাও
নাচনা পুটি হাসনা দাও
টিনের তলে পয়সা থুলাম
অমুকের বিয়ে ঠিক করলাম।

তারপর চোরকে ছুঁয়ে বাকিদের ছুঁতে হয়। বাকিদের মধ্যে আগে যাকে ছোঁবে সে চোর হবে।

## ১০. কপাল টুনি খেলা

দুই দলে সমান খেলোয়াড় থাকে। ২ দলে একজন করে রাজা থাকে। একেক দলের ভিন্ন নাম থাকে। এক দলের দলনেতা অন্য দলের খেলোয়াড়দের চোখ বন্ধ করে ধরে রাখে। তারপর তার দলের কোনো খেলোয়াড়ের ছদ্ম নাম ধরে ডাকে। এভাবে বলে–

আয়রে আমার আপন
আয়েরে আমার টাহি
আয়রে আমার গজার।

সে এসে চোখ বন্ধ খেলোয়াড়ের কপালে টিপ দিয়ে যায়। পরে চোখ খুলে তার নাম বলতে হয় কে তার কপালে টিপ দিল যদি সত্যি বলতে পারে তবে সে এক লাফ দেবে। আর না পারলে যে টিপ দিলো সে লাফ দেবে। এভাবে খেলতে খেলতে যে দলের খেলোয়াড় আগে গন্তব্যে চলে যাবে তারা বিজয়ী হবে।

www.pathagar.com

## ১১. শিকল বাঁধা

অনেক জন মিলে খেলতে পারে। একজন চোর হয় বাকি সবাই এমনি থাকে যেই চোর হয় তার চোখ গামছা দিয়ে বাঁধা হয়। তারপর সবাই তাকে ছুঁয়ে পালায়। চোর কাউকে ধরে তার নাম বলতে পারলে সেই আবার চোর হবে। নাম বলতে না পারলে সেই চোর থাকবে।

## ১২. পলান টুক টুক

একজন মুচি হয়। অন্য সবাই গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকে। চোর আগে যাকে দেখবে সে আবার চোর হয়।

## ১৩. রুটি পিঠে

একটা গোল দাগ কাটা থাকবে। এই খেলাতে ৫ থেকে ১০ জন লাগে। মাঝখানে একটা দাগ থাকে। চোর সেখানে থাকে। তার চারপাশে সবাই তাকে মারবে আর সে যদি একজনকে টেনে ঐ দাগের ভিতর নিতে পারে তবে সে তখন চোর হবে।

## ১৪. ঘোরা পাদানি

৫ জন খেলোয়াড় থাকে। প্রথমে চার পাশে চারটা গর্ত করা হয় ও মাঝে একটা। ৫টা গর্তে ৫ জন মানুষ থাকবে মাঝখান থেকে একটা চারা অন্য গর্তে ফেলবে যার গর্তে পরবে তার ঘাড়ের উপর বসতে হবে। যার ঘারের উপরে থাকবে তাকে আবার চারটি ফেলতে হবে। যদি গর্তে ভেতরে না পরে তাহলে তাকে বসে থাকতে হবে। আর গর্তে পরলে অন্য জন আবার ফেলবে। এভাবে পর্যায় ক্রমে খেলাটি খেলে থাকে।

## ১৫. ঝিঙে ভাজা/বিলকিস নাচল

কয়েকজন গোল হয়ে দাঁড়ায় তারপর একজন প্রশ্ন করে আর সবাই উত্তর দেয়। সবার পা এক সাথে লাগিয়ে রাখে। তারপর তারা এক পা চেয়ে ঝিঙে ভাজা বলে।

পায়ের তলে কী
কাকের বাসা
ভাংছে কেডা
পোলা মা
ঝিঙে ভাজা/বিলকিস নাচল।

## ১৬. বাগুন ভাজা

বাগুন ভাজা খেলা অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা খেলে। এতে কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ ছয় জন অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রথমে বৃত্তকারের পরস্পরের হাতের আঙুল ধরে কেয়ামুঠ করে দাঁড়ায় তারপর একজন অন্য দুজনের হাতের নিচে দিয়ে ডুব দেয়। মানে সম্পূর্ণ উর্ধ্বমুখী হয়ে চায় এবং অন্য দুজনের মুষ্টি বন্ধ হাতের মাঝখানে তার পায়ের গোড়ালি উল্টো করে ঠেকিয়ে হাঁটু নিচের দিকে রাখে ও তার পা দ্বিতীয় জনের হাঁটু উল্টো দিকে

www.pathagar.com

রাখে। এমনি করে সবার পা সবাই চেপে ধরে ও পরস্পরের হাঁটুর সাথে উল্টো করা পায়ের গোড়ালি আটকে যায়। তখন সকলে হাত ছেড়ে বিপরীতমুখী হয়ে পায়ে নেচে নেচে 'বাগুন ভাজা তাড়াতাড়ি' কথাটি বার বার আওড়ায় ও হাততালি দেয়। ছোটরা এ খেলায় খুব আনন্দ পায়।

## ১৭. মানিক জোড় খেলা

এই খেলাটি ছেলেমেয়ে উভয়ই খেলে থাকে। দুজন করে জোড়া থাকবে আর চোর থাকবে একা। সেজন্য বেজোড় সংখ্যায় খেলোয়াড় নিয়ে মানিক জোড় খেলতে হয়। জোড়া আলাদা অবস্থায় যদি চোর তাদের কাউকে ছুঁয়ে দেয় তবে তাদের জোড়া ভেঙে যাবে এবং সে চোর হবে।

## ১৮. ছাগলগিরি খেলা

এই খেলা অনেকজন মিলে খেলা যাবে। যতো বেশি লোক হবে ততো ভালো হবে। প্রথমে দুইটি দল করতে হবে তারপর হাত ধরে দুই দল দুই দিকে দাঁড়াবে এক দল আরেক দলকে বলবে–

ও ভাই, ছাগলগিরি, ছাগলগিরি,
তোর ছাগল খাইছে ধান।
অন্য দল বলবে
ও ভাই লক্ষ্মীগিরি লক্ষ্মীগিরি,
খাইয়া দাইয়া বাইন্দা আন।
তখন প্রথম দল বলবে–
তোর বাড়ি কার বিয়ে?
অন্য দল বলবে–
আমাগো বাড়ি স্বর্ণার বিয়ে
প্রথম দল বলবে–
কি বাজাইরে?
দ্বিতীয় দল–
ঢোল বাজাইরে।

এভাবে দুই দল ছাগলগিরি ছাগলগিরি বলতে থাকবে। যার বিয়ে সে উল্টো দিক হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে দুজন থাকবে। তারা সবাইকে জিজ্ঞেস করবে কিভাবে বাড়ি যাবে? তারা বলবে– এভাবে তুলে নিয়ে যাবে। তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় যদি কারো হাত থেকে পায়ের আঙুল ছুটে যায় তাহলে সে কুত্তা হবে। এভাবেই খেলাটি আবার শুরু হয়।

## ১৯. রেশমা খেলা

এটি মেয়েদের খেলা। ২/৩ জন মিলেই এই খেলা হয়। পর পর সমান দূরত্বে তিনটা দাগ কাটা থাকবে। একটা খাপড়া পারে দিয়ে দল ধরে দাগের এপার থেকে ওপারে

www.pathagar.com

গিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। যদি দল চলে যায় তবে তাকে আবার পরে খেলতে দেওয়া হয়।

## ২০. চম্পা খেলা

একজন নিচু হয়ে থাকবে। তার পিঠের উপর দিয়ে লাফ দিতে দিতে এক নিশ্বাসে বলতে হবে–

চম্পা গলায় গাছমা
হাতে বালতি কাঁখে কলসি
আমরা দুটি ভাই
বানা বাগানে যাই
ব্যাতের ফুল কানে দিয়ে
হারমনি বাজাই।

## ২১. পেপাস খেলা

ছেলেমেয়ে উভয়ের খেলা। একটা চারকোণা কোর্ট কাটা হয়। তার মধ্যে একদল থাকবে এবং বাইরে একদল থাকবে। কোটের বাইরের দল একজন একজন করে দল নিয়েছি বলে এক পা উঁচু করে কোটের ভেতরের সবাইকে উঠানো চেষ্টা করবে। ছুঁয়ে আসতে পারলে সে দলের নম্বর বাড়বে।

## ২২. বরফ পানি খেলা

ছেলেমেয়ে উভয়ের খেলা। প্রথমে বাটার পর সে চোর হয় সে সবাইকে তারা করে। চোরে দৌড়ে যাকে ধরবে সে সে জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে। অন্য খেলোয়াড়রা তাকে ছুঁলে সে তখন আবার দৌড়াবে। না ছোঁয়া পর্যন্ত সে যদি নিজে থেকে দৌড়ায় বা নড়ে তবে সেই আবার চোর হবে।

## ২৩. ডাতা ডাতা

এই খেলা অনেকজন মিলে খেলা যায়। ছেলে মেয়ে উভয়ই এ খেলা খেলে। এ খেলায় দুটি দল থাকবে। এক একটি দলে ৭/৮ জন করে থাকবে। এক দল বাইরে খেলবে আর একদল বৃত্তের মধ্যে খেলবে। দুইটি বৃত্ত আঁকতে হবে যে দল বৃত্তের মধ্যে খেলবে সেই দলের প্রধান একজন থাকবে ঐ বৃত্তে। একজন একজন করে কুতকুত বলে যাবে এবং বাইরের সবাইকে ছোঁয়া দিয়ে সেই প্রধান জনকে তার বৃত্তে আনার চেষ্টা করবে। আনতে সক্ষম হলে গোল হবে।

## ২৪. নেকচি খেলা

নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে না। খেলোয়াড়রা সবাই মিলে তাদের এক হাতে বুজে আঙুল এক সাথে করে যে কোন একজন এক, দুই, তিন বলে এবং তিন বলার সাথে সাথে সবাইকে ছুটে পালাতে হয়। সে সবার শেষে যায় তাকে চোর বানানো হয়। সে তখন সবাইকে ছুঁতে চেষ্টা করবে। যে আগে ধরা পড়বে সে আবার চোর হবে।

www.pathagar.com

## ২৫. দুধ কলা খেলা

পানিতে নেমে এ খেলা খেলতে হয়। সাধারণত গ্রামের ছেলেমেয়েরা পুকুরে গোসল করার সময় এই খেলা খেলে থাকে, সে জন্য একে জলের খেলা বলা হয়। যে কয়জন মিলে ইচ্ছা এ খেলা খেলতে পারে। সবাই মিলে বাস্তুরি ছোট গোল করে কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেয়, তারপর সবাই মিলে বস্তুরি ভাসিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে পানি থই থই করতে থাকে। পানি স্থির হয়ে যাবার আগেই যে কস্তুরি হাতে নিয়ে একটা ডুব দিতে পারবে সে রাজা হবে। এটা বাচ্চাদের তৈরি এক মজার খেলা।

## ২৬. ট্যাক ট্যাক

দুই কোথায় দুই দল থাকবে আটজন করে। মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা দাগ কাটা থাকবে যাকে সার বলা হয়। এই দলের একজন ট্যাক ট্যাক বলে অপর দলের যে কয়জনকে এক নিশেষে ছুঁয়ে আসতে পারবে তার নম্বর ততো বেশি হবে। এভাবেই যেই দল যতো বেশি নম্বর পাবে তারাই জয়ী বলে বিবেচিত হবে। ট্যাক ট্যাক খেলা এভাবেই খেলতে হয়।

## ২৭. কুত কুত খেলা ও মাংস চুরি খেলা

দুটি পক্ষ থাকবে। প্রতিপক্ষে ছয়জন করে খেলোয়াড়। মাধের মধ্যে একটি ছক তৈরি করা হয় এবং তার মাঝে একটি ইট রাখা হবে। যা মাংস নামে অবিহিত এবং সেটাকে চুরি করে আনাই এই খেলার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে দম দিয়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে পাশ কাটিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা মাংস নিয়ে আসবে। যদি আনার সময় তাকে অন্য পক্ষের কেউ ছুঁয়ে ফেলে তবে সেই দল বাতিল এবার অন্য দল খেলাবে। এই খেলা মেয়েরা বেশি খেললেও ছেলেরাও খেলে থাকে। এটা স্থলের খেলা।

## ২৮. লাঠি বাড়ি খেলা

লোকজ অন্যান্য উৎসবের মতো লাঠিবাড়ি খেলা উৎসব অন্যতম। এই উৎসব হয় লাঠিবাড়ি খেলাকে কেন্দ্র করে। একটি নির্দিষ্ট দিনে তারা মিলিত হয়। লাঠিবাড়ি খেলা কার্তিক মাসের ১ম দিন এই উৎসবটি পালন করা হয়ে থাকে। রাজবাড়ি অঞ্চলের লোকজন অনেক ঘটা করে এই উৎসবটি পালন করে থাকে। লাঠিবাড়ি খেলার সাথে মিল আছে শরকি খেলা ও তলোয়ার খেলার। খেলায়ারবা দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলার নৈপুণ্য প্রদর্শন করে থাকে। একদল অন্যদলকে আক্রমণ করে অন্যদল তখন প্রতিরোধ করে। এভাবে খেলা চলতে থাকে। পুরো খেলার সময় ধরে থাকে ঢোলের বাদ্য। বাজনার তালে হয়। এই লাঠিবাড়ি খেলা বেশ বিপদজনক। এই খেলাতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। খেলার শেষে নাচ গান করে সবাই মিলে অনুষ্ঠান শেষ করে।

www.pathagar.com

# লোকপেশাজীবী গ্রুপ

## ১. তাঁতি

রাজবাড়ী জেলার কয়েকটি উপজেলায় এখনো তাঁতশিল্প বিদ্যমান আছে। আর তাঁত চালায় যে কারিগর তিনি হলেন তাঁতশিল্পী। তাঁতিরা বংশপরম্পরায় এই পেশায় নিয়োজিত আছে। রাজবাড়ী অঞ্চলের লুঙ্গি ও গামছা গুণে-মানে প্রসিদ্ধ। তবে বর্তমানে এই শিল্পের পেশাজীবীরা সংকটের মুখে আছে। সুতার দাম, রং ও অন্যান্য উপকরণের যে দাম তা কিনে, সারা দিন তাঁত চালিয়ে যে লুঙ্গি ও গামছা তৈরি করে তার ন্যায্য মূল্য পায় না। তাই এ পেশায় নিয়োজিত তাঁতশিল্পীরা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে।

## ২. কুমার

রাজবাড়ী জেলায় মৃৎশিল্প এখনো ক্ষীণও হলে টিকে আছে। এক সময় গৃহস্থালির হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, মটকি ইত্যাদি তৈরি করে মৃৎশিল্পীরা জীবিকা নির্বাহ করতো। মৃৎশিল্পীদের কুমার বলা হয়। মৃৎশিল্পীরা এখন আর গৃহস্থালির তৈজসপত্র তেমন তৈরি করে না। নকশি হাঁড়ি, সরা, পুতুল, মাটির কলস আর মাটির খেলনা তৈরি করে কোনো রকম টিকে আছে।

## ৩. গাছি

সাধারণত শীতকালে খেজুর গাছ কেটে রস বের করে জ্বাল দিয়ে যারা গুড় তৈরি করে তাদেরকেই গাছি বলা হয়ে থাকে। এক সময় এই এলাকায় প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। তখন একদল পেশাজীবী 'গাছি' পেশাকে জীবিকা নির্বাহের প্রদান অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিল। বর্তমানে এ পেশায়ও সংকট দেখা দিয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু লোক ভেজাল গুড় তৈরি করে কম দামে বাজারে বিক্রি করার ফলে আসল খেজুরের গুড় মার খাচ্ছে। তাছাড়া খেজুর গাছের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে অবৈধভাবে ইটের ভাটায় খেজুর গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গাছি পেশার লোকজনের সংখ্যা আজকাল অনেক কমে গেছে। পেশা পরিবর্তনে তারা বাধ্য হচ্ছে।

## ৪. দর্জি

দর্জি পেশা একটি প্রাচীন পেশা। জামা-কাপড়, পাজামা-পাঞ্জাবি– মেয়েদের সেলোয়ার-কামিজ-ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র তৈরি করে দর্জিরা। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনই এই পেশায় বেশি নিয়োজিত। রাজবাড়ি জেলায় প্রতিটি হাট-বাজারে দর্জিদের দেখা যায়।

www.pathagar.com

## ৫. কামার

গৃহস্থালি নানা কাজে, দা, কাঁচি, সরতা; কৃষি কাজে লাঙল, কোদাল, নিড়ানি ইত্যাদি যে তৈরি করে তিনি হলেন কামার। রাজবাড়ী জেলায় বিভিন্ন বাজারে এখনো এই পেশায় টিকে আছে অনেক পেশাজীবী। তারা হাঁপড় আর হাতুড়ি চালিয়ে এখনো এসব যন্ত্রপাতি তৈরি করছেন। এ অঞ্চলের বড় বড় বাজারে এই পেশার অনেক লোক দেখা যায়। অনেকে বলছেন, খুব ভাল নেই তাঁরা। লোহার দাম, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের সাথে তাদের সীমিত আয়ে কুলোতে পারছেন না তারা।

## ৬. ঘরামি

ঘর তৈরি করে যে তিনি হলেন ঘরামি। রাজবাড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই পেশায় টি' আছে কিছু লোক। তারা মূলত ছন, খড় ও বাঁশ-বেত দিয়ে ঘর তৈরির কাজ করে থাকেন। যারা নিম্নবিত্ত মূলত তারাই খড় ও ছনের ঘর তৈরি করিয়ে থাকেন।

## ৭. কাঠ মিস্ত্রি

কাঠ মিস্ত্রি দু ধরনের। যারা কাঠ ও টিন দিয়ে ঘর তৈরি করে দেন আর যারা ঘরের আসবাবপত্র– খাট-পালঙ্গ, চেয়ার-টেবিল-আলনা ইত্যাদি তৈরি করেন। রাজবাড়ী জেলায় এই পেশায় বহু লোক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

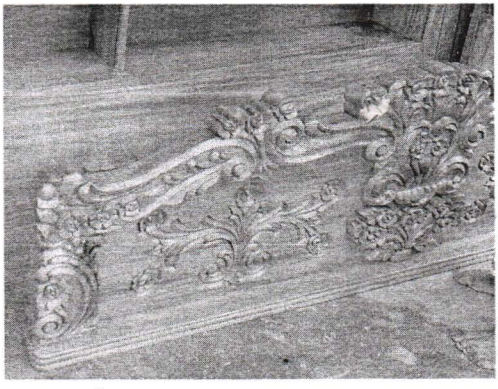

কাঠ মিস্ত্রি তৈরি নকশাযুক্ত খাটের একাংশ

www.pathagar.com

# লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ঘা, ফোঁড়া উপশম বিয়ে হওয়া, ঘরবাড়িতে যেন কুদৃষ্টি না পড়ে তারা জন্যে ঘরবাড়ি বন্ধ করা, শরীরের কোনো স্থানে কথিত বিষ লেগে ঘা হওয়া ইত্যাদির জন্যে এই মন্ত্র পড়ে ঝাড় ফুঁক করতে হয়।

১. করাৎ করাৎ মহাদেবের করাৎ
যাইকে কাটি আসতে কাটি
ডাইন কাটি যোগিনী কাটি
বাও গুলির বাতাস কাটি
পুব কাটি পশ্চিম কাটি
উত্তর কাটি দক্ষিণ কাটি
আকাশের তারা কাটি
কাটি পাতালের বালি
কাটিয়া করিলাম খান খান
(অমুকের) অঙ্গ থেকে অহলংকে যা
কার দোহাই কামরূপ কামুক্ষ্যার দোহাই
শীঘ্র যা। ছু.....।

২. বউ তার বাপের বাড়িতে থাকতে চায়, কিছুতেই স্বামীর বাড়িতে আসতে চায় না সরিষার তেলে এই মন্ত্র পড়ে বউয়ের গায়ে ছিটালে সেই বউ স্বামীর বাড়িতে আসবে-

ছাড় ছাড় ছাড়
তোর মা বাপ ঘর সংসার সব ছাড়
আমাকে নিয়্যা কর ঘর আর সংসার
আমাকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাবি
দোহাই লাগে ভীষ্ম মুণির
মহাদেবের মাথা খাবি।

৩. স্বামীর বাড়ি থেকে মেয়ে যাতে বাড়িতে আসে অথবা নিজের স্ত্রী অন্য কোনো পরকিয়া থেকে যাতে নিজের বাড়িতে আসে তার জন্যে এই মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে একটা নতুন মাটির ঢাকুন (ঢাকনা) এর পিঠে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দরজার চৌকাঠে বেঁধে রাখলে কাঙ্ক্ষিত রমণী ফিরে আসবে-

-নজর নজর ছন্দি

www.pathagar.com

-আমার নজরে করলাম তোরে বন্ধি
আমারে ছাড়িয়া ভেল্কি অন্য কোথাও যাবি
দোহাই লাগে ভীষ্ম মুণির শিবের
মাথা খাবি।

৪. পুরুষ বা নারী বস করতে হলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়ে পুরুষ সংক্রান্ত হলে ডান পায়ের বা নারী সংক্রান্ত হলে বাম পায়ের বুড়ো আঙুল মাটিতে ঘষতে হবে আর মন্ত্র পড়তে হবে-

থাক থাক থাক
এই বাকি জীবন থাক
অন্য কিছু না ভাবিয়া
আলার পথে নির্ভর করিয়া
সারা জীবন এই খানেই থাক
রহমানের রাহীম রহমানের রাহীম রহমানের রাহীম॥

৫. মেয়েদের প্রসব বেদনা উপশমের জন্যে পানি পড়া :

কাঁচা হাঁড়ি কাঁচা পাতিল কাঁচা মাথার চুল।
সংসার যার দোহাই লাগে তার
শীঘ্র আয় রহমানের রাহীম শীঘ্র আয় রহমানের রাহীম
শীঘ্র আয় রহমানের রাহীম।

৬. জ্বর হলে শুধু মাত্র ঝাড় ফুঁক :

উড়ি জ্বর, ছাড়া জ্বর, ছাড়ি জ্বর
রাত জ্বরা, দিন জ্বরা, দুপুর‍্যা জ্বরা
হাতে ছাড়, পায়ে ছাড় দশমুন্ডু ছাড়
ইহাকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাবি
দোহাই লাগে কামরূপ বামুক্ষ্যার
শীবের মাথা কিন্তু খাবি। ছু...।

৭. পেট বেদনার পানি পড়া (কচুর পাতার পাত্রে) :

বাধকের কী কী নাম
কাল বাধক, শ্বেত বাধক
ও পাড় ধোপার ঝি
তুমি আমার হইলে শীষ।
আমার এই পানি পড়া যে খায়
ছত্রিশ বাধক কে করে নিক্ষয়।

www.pathagar.com

৮. সাপের বিষ না মানোর মন্ত্র :

সাকুন্যা সাপুড়্যা ভাই গোক্ষুলেরই কথা
পঞ্চ অবতারে কৃষ্ণর জন্ম হইল কোথা
জন্ম হলেন যেথা সেথা দৈবগিনির দ্বারে
দৈবক তুলিয়া নিলেন গোক্ষলে নগরে।
গোক্ষলে নগরের লোক বলেন হরি হরি
যদি বিষ তুই উজ্যান ধাস
অষ্ট নাগের মাথা খাস।
এই নারকেল বত্রিশ কণ্ডোল বিষে টলমল করে
এই থাপোড়ে মারলাম বিষ মা মনসার বলে।

৯. এই মন্ত্র পড়ে রাত্রে ঘুমালে সাপে কাটবে না :

আস্তিক কাস্য মণির মাতা
ভগ্নি বাসকীস্ততা,
জড়ৎ কারও মণির পত্নি
মনসায় দেবি নমস্তুতেঃ নস্তুতেঃ নমস্তুতেঃ।

১০. কোনো গানের আসরে খাতে কুপ্রভাব না পড়ে অথবা কেউ যাতে যাদু, টোনা বান ইত্যাদি না করতে পারে তার মন্ত্র :

আকাশও বন্ধ অকহো নাগিনী
চৌদিক বন্ধ চৌষট্টি তাকিনী
পুবে আনু পশ্চিমে হনু
উত্তরে ভোলা মহেশ্বর
দক্ষিণে বাকচর।
আমার মন্ত্র গুরুর পা
নীল্যাচরণ ভালোগুচি দোহাই দিচ্ছি মা
শীত লক্ষ্যাবতি।

১১. গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে ঝাড় ফুঁকের মন্ত্র এক দমে ৭ বার :

সমুদ্রের ওপর তালগাছটি
কুঁড়্যায় কইলো বাসা
কুঁড়্যায় বইস্যা ঝাড়ে পাও
অমুকরে গয়ার কাঁটা খসে যাও।

১২. শরীরের হাড় ভাঙলে তা জোড়া লাগার ঝাড়ফুঁক :

রামের ভাই লক্ষণ
হাড় ভাইঙ্গল্যা কক্ষণ

www.pathagar.com

কার আজ্ঞ্যা কামুখ্যার আইজ্ঞ্যা
কাপে কাপে যাই গগ্যা লাইগগ্যা
সিদ্ধি জ্ঞান ওস্তাদের পাও
যদি গিয়ান বৃথা যাও
ঈশ্বর মহা দেবের মাথা খাও।

১৩. হা-ডু-ডু খেলতে শক্তি ও সাহস বৃদ্ধির জন্যে এই মন্ত্র পড়ে সরিষার তেলে ফুঁ দিয়ে সেই তেল সারা গায় মাখা হতো :

তৈল তৈল তৈল
তৈল মাখলাম গায়
আঠারো কোটি দেবতার বাহুবল
আমার বাহুতে আয়
বিস্পা বিষ্ণেশ্বর
তিন দেবতার মস্তক ফাটে
মারিলাম তোর ঘর।
পরিস্তপর উত্তর শিহরের পর
আমি যাবো ঘল
তোরে পাঠাবো যমের দক্ষিণ দুয়্যারের পর।
এ দেবী মা কালকে দেবী
মা বললাম আজ তোরে
আজকের আসরে জয়ভাগ্য দেও মা আমারে।
আমার ছেড়ে যদি মা অন্য খানে যাও
দোহাই দিচ্ছি তোর ধর্মের
কার্তিক গণেশের মাথা খাও।

www.pathagar.com

# ধাঁধা

১. দিলে খায় না, না দিলে খায়।
**উত্তর :** গরুর মুখের টুনা।

২. আকাশ থেকে পড়ল থালা
থালা ঝুন ঝুন করে।
**উত্তর :** বৃষ্টি।

৩. আকাশ থেকে পড়ল বুড়ি
তেনা তুলি নিয়ে সেই বুড়ি
নামায পড়ে মধ্যে বসে।
**উত্তর :** তাল।

৪. বিনলে ঝারে আগুন লাগলে
কেউ টেকাতে পারে না।
**উত্তর :** রোদ।

৫. একটা গাছে আপুর ঝুপুর
তারি তলে কালী কুকুর।
**উত্তর :** উকুন।

৬. খাল বিল শুকা গেল
গাছের মাথায় পানি রইল।
**উত্তর :** ডাব।

৭. তিন অক্ষরের নাম তার
পানিতে বাস করে
মধ্যির অক্ষর বাদ দিলে
আকাশে উড়ে।
**উত্তর :** চিতল

৮. এক গাছ টানা দিলে
বেত গাছ নড়ে

www.pathagar.com

খুকু মনি ডাক দিলে
পৃথিবী নড়ে।
**উত্তর :** ভূমিকম্প।

৯. তিন মাথা একমুখ
যতো দেওয়া যায়
ততোই খায়।
**উত্তর :** চুলা।

১০. গলা আছে মাথা নাই
হাত আছে তার পা নাই।
**উত্তর :** জামা।

১১. আমার ভাই আরজ
একশ একটা জামা গায়
তবু সে জামা চায়।
**উত্তর :** কলাগাছ।

১২. পানিতে বাস করে তবু
তৃষ্ণা মেটে না।
**উত্তর :** মাছ।

১৩. ডালা ভরা সুপাড়ি
গুনতে পারে কোন ব্যাপারি।
**উত্তর :** তারা ।

১৪. আগে ফল তারপর ফুল।
**উত্তর :** কদমফুল।

১৫. কোন ফলের চোচা নাই।
**উত্তর :** বড়ই।

১৬. রাজার বাড়ির শাড়ি
শুকাতে পারি
ভিজাতে পারি না।
**উত্তর :** কচুর পাতা।

১৭. শত শত বাক্তার দেল বল জঙ্গলে
দাঁত দিয়ে তুলে পোঁকা
বলেন কোন জল।
**উত্তর :** চিরুনি।

www.pathagar.com

১৮. জলে বাস পানিতে ভাসে
হাড্ডি নাই তার মাংস আছে।
**উত্তর :** জোঁক।

১৯. এক গাছে এক ফল
পাকিয়া আছে ভল ভল।
**উত্তর :** আনারস।

২০. লাল জামা পড়ে
মামাজান-হাসে।
**উত্তর :** পিঁয়াজ।

২১. ভোঁ ভোঁ করে ভ্রমর তো-নয়
মাথা দিয়ে মাটি খুড়ে ইঁদুর তো নয়।
**উত্তর :** লাটিম।

২২. উপর থেকে পড়ল ঢ্যাপ
ঢ্যাপ বলে মোর প্যাট কাট।
**উত্তর :** কুয়া।

২৩. কোন ফলে বোটা নাই।
**উত্তর :** ডিম।

২৪. কোন সাগরে পানি নাই।
**উত্তর :** বিদ্যাসাগর।

২৫. কোন পানি কখনও শুকায় না।
**উত্তর :** চোখের পানি।

২৬. সুর দিয়ে করি কাজ
নই আমি হাতি
পরের উপকার করি
তবু খাই লাথি।
**উত্তর :** ঢেঁকি।

২৭. গিয়েছিলাম রাজবাড়ীর হাটে
দেখে এলাম দুই মায়ের পেটে এক সন্তান।
**উত্তর :** দরজা।

২৮. ঢেউ এর উপর কেউ
তার পর বসে আছে

www.pathagar.com

লাট সাহেবের বৌ।
**উত্তর :** পানা।

২৯. গোসল করে তো গাও ভেজে না
**উত্তর :** কচুর পাতা।

৩০. বাড়ির পাশে কাটের গাই
বছর বছর দুধ পাই।
**উত্তর :** খেজুরের রস।

৩১. টাকার উপরে মার্বেল
নড়ে চড়ে পড়ে না।
**উত্তর :** চোখের মণি।

৩২. কোন ফুল বছরের একবার ফোটে
**উত্তর :** এপ্রিল ফুল।

৩৩. আলার কী কুদরত
লাটির ভিতর শরবত।
**উত্তর :** আখ।

৩৪. হট ঘুঘুর পিট টান
কোন ঘুঘুর তিন কান।
**উত্তর :** চুলা।

৩৫. শীতের দিনে নাইকো যার দাম
গরমের দিনে হাজার টাকা দাম।
**উত্তর :** পাখা।

৩৬. ও দুলাভাই ও দুলাভাই
কেনে ক্লাসে পড়
কোন গাছের পাতা নাই।
টপ করিয়া বল।
**উত্তর :** আলোক লতা।

৩৭. কোন পাতা গাছে ধরে না।
**উত্তর :** বইয়ের পাতা।

৩৮. কোন ফল গাছে ধরে না।
**উত্তর :** পরীক্ষার ফল।

www.pathagar.com

৩৯. নামে আছে কামে নাই
ধরতে গেলে দাম নাই।
**উত্তর :** ঘোড়ার ডিম।

৪০. আছাড় দিলি গলে না
টিবি দিলি গলে।
**উত্তর :** ভাত।

৪১. দুই পাশে দুই ভাই
কেউ কারো দেখা নাই।
**উত্তর :** চোখ।

৪২. লাল বুড়ি হাটে যায়
হাটে গিয়ে থাপুর খায়।
**উত্তর :** কলস।

৪৩. সবুজ বুড়ি হাটে যায়
হাটে দিয়ে চিমটি খায়।
**উত্তর :** লাউ।

৪৪. আমিরে ভাই খালে তুইরে ভাই ডালে
তোর সাথে দেখা হবে মরণের পরে।
**উত্তর :** মাছ ও মরিচ।

৪৫. মামুরা রাঁধে বাড়ে মামুরা খায়
আমরা গেলে ঘরে দুয়ার দেয়।
**উত্তর :** শামুক।

৪৬. কোন কোন গাছে বাজনা বাজে
কোন কোন গাছে সাজনা সাজে।
কোন কোন গাছেমানুষির মাথা
কোন কোন গাছে ছেঁড়া ক্যাঁথা।
**উত্তর :** 'বাজনা বাজে' কড়ই গাছের শুক্‌না ফল,
'সাজনা সাজে'কানাই নড়ি গাছের হলুদ ফল
মানুষের মাথা বেল গাছে।
ছেঁড়া কাঁথা কলা গাছের পাতা।

৪৭. আতালির'পরমষির শিং
পাঁড়া দিলি ফটাটিং।
**উত্তর :** শুক্‌না পাটকাঠি।

www.pathagar.com

*[প্রসঙ্গ : পাট ধোয়ার ঋতু শেষ হলে এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে শুকনা পাটকাঠি জমির আলে পড়ে থাকে। সেইগুলো পায়ের নিচে পড়লে মট্ মট্ করে ভেঙে যায়। এ থেকেই এই ধাঁধাটির উৎপত্তি এবং কিশোর কিশোরীগণ এই ধাঁধা বলে।]*

৪৮. এক বুড়ির এগারো বেটা।
চাইর বেটা তার নাদুস নুদুস
চাইর বেটা তার ঘিরতো মধু,
দুই বেটা তার শুক্না কাঠ,
এক বেটা তার পাগল নাথ।
**উত্তর :** গাভী গরু।
*[প্রসঙ্গ : গাভীট হলো বুড়ি। তার চারিখানা পা; চারটি দুধের বাট। দুইটি শিং এবং একটি লেজ, পাগলের মতো নড়াচড়া করে মাছি তাড়ায়।]*

৪৯. গাই বিয়্যাইলো আড় আড় বিয়্যাইলো বাছুর,
গাইর বানে দুধ নাই পাছ ছাড়ে না বাছুর।
**উত্তর :** মুরগি, ডিম, বাচ্চা।

৫০. ফল নাই ফুল নাই,
ধরে বারো মাস।
**উত্তর :** পান।
*[ব্যাখ্যা: কথিত আছে-পানের ফুল এবং ফল হয় না।]*

৫১. উপ্যার থ্যা পইলো বুড়ি
পইড়্যা হাইর‍্যা কুঁড়িমুড়ি॥
**উত্তর :** গরুর বিষ্ঠা ত্যাগ।
*[ব্যাখ্যা : গরু বিষ্ঠা ত্যাগ করলে উপর থেকে পড়ে তা থেতলিয়ে যায়।]*

৫২. আমার ভাই নাইট্যা,
কাপড় পরে সাতখান আঁইট্যা॥
**উত্তর :** কলাগাছ।
*[ব্যাখ্যা : কলাগাছ একটির পর একটি বাকল দিয়ে চাপা থাকে।]*

৫২. ঝোড়ের মদি কলা গাই,
বছর বছর দুয়ায়া খাই॥
**উত্তর :** খেজুর গাছ।
*[ব্যাখ্যা : প্রতি বছর শীতকালে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়।]*

৫৩. আঁধাইরা পুষ্কুনি গড়াইন্যা ঘাট,
বত্রিশটা কলা গাছ তার

www.pathagar.com

একখান মাইচ পাতা।
**উত্তর :** মুখ গহ্বর।
*[ব্যাখ্যা : মুখ গহ্বর এবং ইহার মাঝে দুই পাটিতে বত্রিশটি দাঁত এবং একটি মাত্র জিহ্বা-নির্দেশক।]*

৫৪. হারালি তালাশ করে
পালি পারে নেয় না।
**উত্তর :** পথ।
*[ব্যাখ্যা : পথ হারালে সবাই পথ খোঁজে, কিন্তু পথ খুঁজে পেলে পথ তো আর নিয়ে যায় না।]*

৫৫. ইট ঘুঘুর পীঠ টান,
কোন ঘুঘুর চাইর কান।
**উত্তর :** চৌচালা ঘর।
*[ব্যাখ্যা : চৌচালা একটি ঘরের উপরিভাগ টান টান এবং ইহার চারটি কোণা।]*

৫৬. আতালির পর মাথা থুইয়্যা,
ন্যাজ দ্যা খায় পানি।
**উত্তর :** চেরাগ বাতি।
*[ব্যাখ্যা : চেরাগ বাতির মোটা অংশ সাধারণত নিচে থাকে আর সলিতায় আগুন থাকে। সেই আগুনই তেল পোড়ায়– এটাই লেজ সদৃশ।]*

৫৭. আছে ফল দেশে নাই,
খাই ফল তার চুঁচা নাই।
**উত্তর :** শীলা বৃষ্টি।

৫৮. সকালে চাইর পায়ে হাঁটে
দুপুরে দুই পায়ে হাঁটে,
বিকালে তিন পায়ে হাঁটে।
**উত্তর :** শিশুকাল, যুবককাল, বৃদ্ধকাল।

৫৯. ঝোরে ত্যা বারাইলো টুনি
সোনার মুকুট মাথায় দিয়্যা
যদি টুনি মন করে,
হাজার টাকা খুন করে।
**উত্তর :** সাপ।

৬০. প্যাট বড় কার
প্যাঁচ বড় কার
চোখ বড় কার।
**উত্তর :** পেট বড় আকাশের, প্যাঁচ বড় কলমের, চোখ বড় আল্লার।

www.pathagar.com

৬১. চাইর ড্যা ঘড়া উপুর করা
বিনি সরায় মধু ভরা।
**উত্তর :** গাভীর বাঁট।
*[ব্যাখ্যা : গাভীর বাঁট দহন করিলে দুধ পাওয়া যায় এবং এর কোন সরা বা ঢাকনা দিয়েও ঢেকে রাখা যায় না।]*

৬২. ইল্ শুহ্যাইলো বিল শুহ্যাইলো
গাছের আগালে পানি রইলো।
**উত্তর :** ডাব নারিকেল।

৬৩. আল্লার কী কুদরত
লাঠির মধ্যে শরবত।
**উত্তর :** আঁখ।

৬৪. ইতু টুক মিট্যাই
ঘর ভইর‍্যা ছিট্যাই।
**উত্তর :** বাতির আলো।

৬৫. দিয়্যা হোয়
উইট্যা খসায়
**উত্তর :** ঘরের খিল।

www.pathagar.com

# প্রবাদ-প্রবচন

১. অকর্মা নাপিতের ধামা ভরা ক্ষুর।
**অর্থ :** অযোগ্য ব্যক্তির প্রচার বেশি।

২. মারে ডোয়ায় লাগে বেড়ায়।
**অর্থ :** একজনের মাধ্যমে অন্যজনের বোঝানো।

৩. কাটা ঘায়ে নুনির ছিটে।
**অর্থ :** কষ্টের উপর কষ্ট।

৪. নিজে বাঁচে অন্যের নাম।
**অর্থ :** আগের নিজের কথা চিন্তা করা তারপর অন্য।

৫. নিজের কোলে বা এক কোলো ঝেলি ঢালা।
**অর্থ :** স্বার্থপরতা।

৬. ভাত পায় না চা খায়।
**অর্থ :** দরিদ্রতার অর্থে।

৭. আমার নামে হগোলেই সুহি
পান্তা ভাত আর কচুর মুহি
সকলেই সুখি মুখি কচু।
**অর্থ :** আমাকে সবাই উপরে ভালোবাসে
মন থেকে ভালোবাসে না।

৮. ধানের মদি আঁহালী
কত নঙ্গ দেহালী।
মধ্যে কঙ্কর বা কনা রঙ্গ দেখালি।
**অর্থ :** কোনো মহিলা সিদ্ধান্তহীন কাজ করলে এই প্রবাদ বলা হয়।

৯. তাওইর 'চে' পুত্র্যা ভারী।
চেয়ে বা চাইতে পুত্রা।
**অর্থ :** ছোট মুখে বড় কথা।

১০. কছম কাটে ভাইংব্যার
জামিন হয় ভইরব্যার।

www.pathagar.com

ভাঙ্গতে ভর্তুকি দিতে।
**অর্থ :** কছম কাটা এবং কারো জিম্মাদার হওয়া ঠিক নয়।

১১. আগের হাল যেদিক যায়
পাছের হাল সেদিক যায়।
**অর্থ :** জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠ অনুসরণ করে।

১২. হগোলের কাম না চহে নাস্তা খাওয়া।
সকলের চকে বা মাঠে।
**অর্থ :** সবাই সব কাজ করতে পারে না।

১৩. জুত্ পালি জোলা এক ক্ষেও বেশি বুইন্যায়।
**অর্থ :** বাগে পেলে সবাই দুঘা মারে।

১৪. বুঝলাম না জেলার ভাইল
মারবি ঢেঁহি মাইরলো নাইল
**অর্থ :** এক কথা বলে বা এক কাজ করার নামে চালাকি করে অন্য রকম কাজ করে।

১৫. আ করলি আঠারো বুঝি।
**অর্থ :** ভাব দেখেই সব বোঝা যায় এমন।

১৬. যার যার ভাসুরের নাম হেই হেই জানে,
কয় না শরমে।
**অর্থ :** যার কৃতকর্ম সে নিজেই জানে।

১৭. পারে না বাল ফেলতে
উইঠ্যা পড়ে নাইত্ থাকতি।
**অর্থ :** কোনো অভিজ্ঞতা নেই অথচ সে কাজ করার জন্য বাহাদুরি দেখানো।

১৮. ঢহে খায় বেল গাছির গুড়।
**অর্থ :** যে দ্রব্যের সৌন্দর্য আছে, তার কদর বেশি। (প্রসঙ্গ : রাজবাড়ী জেলার বেলগাছি নামক এলাকার খেজুর গুড়ের স্বাদ সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার ছিল সেই থেকেই এই প্রবাদ।)

১৯. এত টাহা পালি তো আমি বাইল্যা কাঁদির ঠাহুর
**অর্থ :** প্রচুর অর্থ প্রাপ্তিতে ধর্মী হওয়া (প্রসঙ্গ : হয়তো বালিয়াকান্দি উপজেলায় কোনো এক বিখ্যাত ধনী ঠাকুর ছিলেন। তার নাম অনুযায়ী এই প্রবাদ।)

২০. গলাহাগা নবুকুলির মা
**অর্থ :** কোনো কথা গোপন রাখতে পারে না।

www.pathagar.com

২১. হগোল বাড়ির ছালুন খাই
এই কামে দইছ্যাক নাই।
সকল লাজ-লজ্জা।
**অর্থ :** দাওয়াতবিহীন খাদক।

২২. ছাওয়াল ছাওয়াল কর তোমরা
এমন ছাওয়াল দেব,
যেন, গলায় ঠেইহ্যা মরো।
**অর্থ :** পুত্র সন্তান লাভের আশায় আল্লার কাছে প্রার্থনার পর প্রাপ্ত পুত্র সন্তান যদি বখাটে হয়, তখন এই প্রবাদ।

২৩. এক পায় দুই পায়
শেখ ফহির বিদেয় অয়।
**অর্থ :** অলস কামচোরা ছেলেমেয়ে কাজের ভয়ে খাওয়া দাওয়া পর চুপি চুপি পালিয়ে যেতে থাকলে, সাধারণত মায়েরা এই প্রবাদ বলতো।

২৪. বারো হাত বাঙ্গির তেরো হাত বিচি।
**অর্থ :** বাবার চাইতে ছেলের ব্যবহার আরো খারাপ।

২৫. ঘোড়া নাদো আর পাদো
গোয়ালন্দ যাওয়াই নাগবি।
**অর্থ :** যে কাজ শুরু হয়েছে তা শেষ করতেই হবে।

২৬. মামলি আয় কাউর
আর বাপ মলি অয় ধাউর।
**অর্থ :** মা বাবা ছোট বেলায় মারা গেলে অভিভাবক না থাকলে এমনই হতে পারে।

২৭. গরম ভাতে বিল্যাই বেজার
উচিত কথায় কুটুম বেজার।
**অর্থ :** গরম ভাত আর উচিত কথায় তাৎক্ষণিক সমস্যা হতে পারে।

২৮. সোয়ামীর ভাত খায় আইস্যা·
ছাওয়ালের ভাত খায় কাইদ্যা
আর জামাইর ভাত খায় গলায় আইড়্যা বাঁইধ্যা।
**অর্থ :** মহিলা সম্পর্কিত প্রবাদ এটি। স্বামীর ঘর তার সুখের আর ছেলে বউয়ের সংসারে অনেক তিরস্কার সইতে হয় এবং মেয়ে জামাইর সংসারে থাকতে হলে সব কিছু সহ্য করে কাজ করে খেতে হয়।

২৯. সহালের মেঘও মেঘ না
সহালের কুটুমও কুটুম না।
**অর্থ :** সকাল বেলায় মেঘবৃষ্টি ও কুটুম এক সময় চলে যেতেই পারে।

www.pathagar.com

৩০. চুন খায়া গাল পুইড়বে।
দুই দেইহ্যা ভয় করে।
**অর্থ :** একই কাজ একবার করে ঠকলে দ্বিতীয় বার করতে ভয় হয়।

৩১. নাও চিনলাম ভাসায়া
নারী চিনলাম আসায়া
**অর্থ :** নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত 'হাসি' এবং নৌকার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য পানিতে ভাসা।

৩২. যতই কর ছন্দি ফন্দি
সব যাবি তোর গুপ্যাইনন্দি।
**অর্থ :** কোন চেষ্টা বা কলা কৌশলেও শেষ রক্ষা হয় না।

৩৩. রাইত ভর মারলাম হাপ
সহালে দেহি দড়ি
**অর্থ :** কোনো কাজের নিষ্ফলতা।

৩৪. মরারে মারো ক্যা।
নড়ে চড়ে না ক্যা।
**অর্থ :** দুর্বল বা অক্ষম মানুষের ওপর অত্যাচার বেশি হয়।

৩৫. বুদ্ধির কাম পরামিশ্যি করে,
ঘরে আগুন দ্যা ছাইপোহা মারে।
**অর্থ :** নিজের কাজ নানারূপ পরামর্শ নিয়ে জটিল করে তোলে শেষে নিজেরই বড় রকমের ক্ষতি সাধিত হয়।

৩৬. বারো কুদ্যালীর ঝি তেরো কুদ্যালী।
**অর্থ :** ঝগড়াটে মায়ের ঝগড়াটে কন্যা।

৩৭. দুরমুইষ্যার ফাঁদে পড়ে ধুতুম।
**অর্থ :** অভাগা যে দিক চায় সাগার শুকায়ে যায় এমন।

৩৮. বৃদ্ধি থাকলি কেউ ঘর জামাই থাহে না।
**অর্থ :** ঘর জামাই থাকা নিতান্তই অমর্যাদাকর কাজ এবং নিন্দনীয়।

৩৯. পারে না খুটি গড়াব্যার
দিয়্যা বসে কুলার বায় না॥
**অর্থ :** বড় কোনো কাজে হাত দিয়ে ব্যর্থ হওয়া।

৪০. ঢেঁহি নাই উঠ্যানে নোট
গুদ্যামে মাল নাই হারেরই।
**অর্থ :** কিছুই নাই অথচ মিথ্যে বাহাদুরি।

www.pathagar.com

৪১. দুঃখে পইড়া চাঁড়ালে শাপে
এড়াব্যার পারে না বাওনের বাপে।
**অর্থ :** খারাপ লোকেরও যদি সত্যিকার অভিশাপ হয় তাহলে সেটা বিফল হয় না।

৪২. আই ফুট্যানী আছে তোমার
বাইর ফুট্যানী নাই।
**অর্থ :** সব কিছুই করতে চায় কিন্তু কাজ করার কিছুই নাই।

৪৩. আই নাই তার বন্দুক ঘাড়ে
ফুট্যাব্যার পাবে না ঝাহি পারে॥
**অর্থ :** যে কাজ করার যোগ্যতা নাই, সেই কাজ করতে চায়।

৪৪. কাম সোহাগী ডাক পারে
পান্তা ভাতে হাত পোড়ে॥
**অর্থ :** প্রেমিকার ডাকে সব কাজ ফেলে ছুটে যেতে হয়।

৪৫. যার বিয়্যা তার খবর নাই।
পাড়া পড়শীও ঘুম নাই।
**অর্থ :** ঘটনার নায়কবিহীন অহেতুক উল্লাস।

৪৬. জল না জল ইন্দারার জল
ফলের মদি আম।
মেয়ের মদি মাজুর মা পুষ্যার মদি হাম॥
**অর্থ :** নিজেকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা।

৪৭. ঝড়ির আগে পড়ে কলা
আহালের আগে মরে জোলা।
**অর্থ :** ঝড়ে যেমন কলাগাছ আগেই ভাঙে তেমনই নাকি আকাল হলে তাঁতি বা জোলাদের অভাব বেশি হয়।

৪৮. কতায় কতা বাড়ে
ভোজনে প্যাট বাড়ে॥
**অর্থ :** বেশি কথা বললে আরো কথা বলা হয়, আর যত খাওয়া যায় ততই ক্ষুধা বাড়ে।

৪৯. ছাউ কত্তা বউ গিন্নি
সে ঘরে উজ্যাড়ির চিন্নি।
**অর্থ :** মা বাবা নয় ছেলে এবং বউ পরিচালক হলে সংসারে উন্নতি নেই।

৫০. আহালের কাম হহালে হারি।
**অর্থ :** সময়ের কাজ সময়ে করা।

www.pathagar.com

৫১. পয়সার বোরহী ন্যাজে গোশত।
**অর্থ :** টাকার কেনা জিনিসের মূল্যায়ন।

৫২. যেমুন মেুন তেমন তেমন
**অর্থ :** যে যেখানে মানান সই সেখানেই তাকে মানায়।

৫৩. উপরে ফিটফাট ভিতরে গোয়ালন্দ ঘাট
**অর্থ :** বাইরে ফিটফাট ভেতরে ফাঁকা।

৫৪. চোরে চোরে আলী
এক চোরে বিয়্যা করে আরাক চোরের হালি
**অর্থ :** চোরে চোরে মাসতুতো ভাই-এর অনুরূপ।

৫৫. কুঁইড়্যার কুড়ি বুদ্ধি
ল্যাংড়ার নাই অন্ত
একশ বিরাশি বৃদ্ধি যার এক চোখ অন্ধ।
**অর্থ :** অলস, খোঁড়া ও এক চোখ অন্ধ লোকের প্রতি তাদের কুটুবৃদ্ধির তিরস্কার।

৫৬. গুয়া ভালো না আলা চালির দোষ।
**অর্থ :** নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

৫৭. মোটে মা নাধে না
তপ্ত আর পান্তা।
**ব্যাখ্যা :** যা পাও তাই নিয়ে খুশি থাকো।

৫৮. মাথায় চুল নাই রোগোলে বাবড়ি।
**ব্যাখ্যা :** আলগা ফুটানি।

৫৯. গাইও বুইড়্যা বিয়্যান্যোও শেষ।
**ব্যাখ্যা :** শেষ বেলা যতটা সম্ভব কাজ করাই ভালো।

৬০. গুয়্যায় রং নাই ছোবায় রং।
**ব্যাখ্যা :** আসল থেকে নকল নিয়ে বেশি কথা।

৬১. খায় নয় আড়ে চোখে
বাড়ে না কপালের দোষে।
**অর্থ :** এ প্রবাদটিও দুর্বল স্বাস্থ্যের লোক সম্পর্কিত।

৬২. আতে নাই পয়সা কড়ি
টাহি আছড়াও মইন্যার দুয়্যারে।
**অর্থ :** অর্থহীন মানুষের সাধ্যহীন কর্ম।

www.pathagar.com

# লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস

## ক. লোকসংস্কার

**নববধূ সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার**

রাজবাড়ী অঞ্চলের নববধূদের নানা ধরনের বিশ্বাস এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে তাদেরকে ভালো বধূ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যেমন–

১. বিয়ের প্রথম দিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নতুন বউকে মাচার উপর তুলে দেওয়া হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় কোন পাত্রে কী কী রাখা আছে। তখন নববধূকে সব কিছু বলতে হয়। মাচার উপর যদি কোনো পাত্র খালিও থাকে তাহলেও নববধূকে বলতে হবে কিছু আছে। এতে বউয়ের দ্বারা সংসারে আয়-উন্নতি হবে বলে মনে করা হয়। পাত্র খালি আছে বললে মনে করা হয় এ বউয়ের দ্বারা সংসার উন্নতি হবে না।

২. যতক্ষণ পর্যন্ত নববধূর বাবার বাড়ি থেকে খাবার মিষ্টি পান, সুপারি নিয়ে না আসে ততক্ষণ বউকে কিছু খেতে দেওয়া হয় না।

৩. চাল, ডাল, পিঁয়াজ, রসুন, জিরা এক করে মিশিয়ে বউকে আলাদা করতে বলা হয়। এতে বউ কত ধৈর্য শীলতা পরীক্ষা করা হয়।

৪. ভাদ্র ও চৈত্র মাসে নতুন বউ-এর পা দেখা হয় না। তাই বিয়ের পর প্রথম বছর বউ ভাদ্র মাসে বাবার বাড়ি থাকে। এতে ভাদুরে পালন বলে।

৫. বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে দিনে দিনে যেতে হয়।

৬. বউ বাবার বাড়ি থেকে আসার পর টাকা-গহনা শাশুড়ির হাতে দিতে হবে। শাশুড়ির আরো কিছু টাকা দিয়ে বউয়ের হাতে সেগুলো আবার দেবে।

৭. নববধূকে ঘর পরিষ্কার করতে হয় এবং ঘর থেকে যে ময়লা আবর্জনা বের হয় তা কাপড়ের মধ্য দিয়ে শাশুড়ির কাছে দিতে হয়, শাশুড়ি তখন তাকে দোয়া দেয় স্বামী সন্তান নিয়ে মুখে থাকতে।

৮. বিয়ের পরের দিন ছেলের বউকে শাশুড়ি ঘর লেপায় এবং গোবর ভেঙে আসলে তাকে দুধ দিয়ে হাত ধোয়ায়।

৯. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বউ তার মাথার চুল দিয়ে স্বামীর পা মোচায়।

১০. বিয়ের প্রথম বছরে স্বামীর বাড়ি থেকে বউকে কাপড়-চোপড় দেওয়া হয় না। সে বছর বাবার বাড়ির কাপড় পরতে হয়।

www.pathagar.com

## গর্ভবতী রমণী সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার

গর্ভবতী রমণীর প্রতি যত্নশীল হওয়া সব সমাজের মানুষের চিরন্তন আদর্শের বিশেষ দিক। মাতা সুস্থতার ওপর অনাগত সন্তানের সুস্থতা অনেকটা নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে ভাবী সন্তানের কল্যাণ কামনা থেকেই গর্ভবতী রমণীর প্রতি পরিবারের সকলকে যত্নশীল হতে দেখা যায়। রাজবাড়ী আঞ্চলের লোকসমাজ এ সম্পর্কে অতি সচেতন। যেমন :

১. বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায় পোয়াতিদের মাছ কুটতে দেয়া হয় না। মনে করা হয় মাছ কুটলে বাচ্চার ঠোঁট কাটা হয়।
২. কোনো রমণী যখন প্রথমবারের মতো গর্ভবতী হয় এবং ৯ মাসে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বাদ খাওয়ানো হয়। ৫ তরকারি রান্না করে, মাছ এবং পায়ের রান্না করে পোয়াতীকে খাওয়ানো হয়। এর পর সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা জানার জন্য এক ধামার নিচে শীল এবং অন্য ধামার নিচে পাটা রাখা হয়। গর্ভবতী যদি শীলের ধামা তোলে তবে ছেলে হবে আর পাটার ধামা তুললে মেয়ে হবে। আবার গর্ভবতী রমণী যদি হা করে পায়েস খায় তবে সন্তানের মুখ বড় হবে বলে ভাবা হয়।
৩. গর্ভাবস্থায় মাটির ঘর লেপে পাটের ফেঁশো পরিষ্কার রাখতে হয়।
৪. গর্ভাবস্থায় চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণকালে গর্ভবতী চুল ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় না এবং কোনো প্রকার কাটা-বাছা করে না।
৫. গর্ভবতী রমণী বেশি শুয়ে থাকলে ক্ষতি হয়।

## প্রসূতি ও নবজাতক বিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কার

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি ও নবজাতকের সেবায় সকলে তৎপর হয়ে ওঠে। এই সময়ে প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য কিছু রীতিনীতি পালন করে।

১. সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর ঘরের সামনে বড়ই-এর তাল রাখা হয় এবং বাচ্চার মাথার কাছে লোহা গরুর দাঁত, মোথা ঝড়ু রাখতে হয় আপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
২. লোকবিশ্বাস– নবজাতকের কামানোর দিন (৭ দিন পর) আল্লাহ বাচ্চাদের ভাগ্য লিখেন। সেজন্য নবজাতকের বিছানার পাশে চাল, খাতা-কলম সোনাদানা টাকা রাখা হয় ৬ দিনের রাতেই। মনে করা হয় এ সন্তান বিদ্বান এবং ধনবান হবে।
৩. সন্তানকে ঠান্ডা পানি দিয়ে অনেক সময় ধরে গোসল করানো হয়। যাতে ঠান্ডার সমস্যা না থাকে।
৪. আতুর ঘরে গেলে গোসল করতে হয়।
৫. সন্তানকে নিয়ে যখন মা নানাবাড়ি বা দাদাবাড়ি থেকে নানা বা দাদার বাড়ি যায় তখন সন্তানের মাজায় পাটের আঁশ, ভাটির পাতা, পাতিলের কালি দিতে হয়।
৬. সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ১ মাসের মধ্যে যদি বাচ্চার গায়ে বড় আকারের গোটা বা হাম হয় তাহলে মায়ের মাসিকের কাপড় রোদে শুকিয়ে সেই কাপড় বাচ্চার গায়ে দিলে বাচ্চা যদি চমকে ওঠে তাহলে তার অসুখ ভালো হয়ে যায়।

www.pathagar.com

৭. সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর বাচ্চাকে কাপড় গরম করে চেপে ধরতে হয় এবং মায়ের বুকে পিঠে সাতবার ছোঁয়াতে হয় যাতে বাচ্চা স্বাস্থ্যবান হয় আবার অনেক সময় পর মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে গেলে প্রথমে একটু ফেলে তারপর দুধ খাওয়ায় যাতে বাচ্চার পেটের অসুখ না হয়।
৮. মা রোদের মধ্যে থেকে এসে ঠান্ডা পানি দিয়ে দুধ ধুয়ে বাচ্চাকে খাওয়ায়।

**সুলক্ষণা ও কুলক্ষণা রমণী বিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কার**

দৈহিক গঠনের ওপর মানসিক গঠনের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দাম্পত্য জীবনের সুখ দুঃখ অনেকটা নির্ভরশীল রমণীদের সদগুণাবলির ওপর। যেমন :

১. নতুন বউ শ্বশুর বাড়িতে আসলে, সেই বাড়িতে কোনো অঘটন ঘটলে বউকে অলক্ষী ভাবা হয়।
২. বউ সংসারী হবে না ছন্নছাড়া হবে তা পরীক্ষার জন্য ১০ কেজি অথবা ৫ কেজি চাল নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীরা কলার ডগার ঢেঁকি বানিয়ে ভাঙতে লাগে এর মধ্যে কেউ কেউ আবার চাল চুরিও করে। চাল ভাঙা হয়ে গেলে যদি চাল ১০ কেজিই থাকে তাহলে বউ সংসারী হবে আর যদি না হয় তাহলে সে ছন্নছাড়া হবে।
৩. যে মেয়ে হাতের আঙুল এবং চুলে হাত ফুটায় তাকে অপয়া বলে মনে করা হয়।
৪. যাদের পায়ের গোড়ালি দেখা যায় না তাদেরকে হস্তধনি বলা হয়। এদের স্বামী টেকে না।
৫. হাসলে গালে টোল পড়লে সেই রমণীকে অলক্ষী বলে এবং এসব মেয়ের যুবতী অবস্থায় স্বামী মারা যায় বলে বিশ্বাস।
৬. মেয়েরা চুল আচড়ানোর পর চিরুনিতে যে চুল থাকে তা গুঁজে রাখতে হবে। ভাঙা চিরুনি আর আয়না ব্যবহার করতে হয় না।
৭. রাতের বেলায় আয়নায় মুখ দেখলে আয়ু কমে যায়।

**স্বামীর মঙ্গল এবং দীর্ঘায়ুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার**

১. স্বামীর হায়াতের জন্য সিঁথির সিঁদুর হাতের চুড়ি এবং নাকফুল বউদের পরে থাকতে হয়। স্বামীর হায়াত বৃদ্ধির জন্য নতুন কাপড় পড়লে প্রথমে স্বামীকে সালাম করতে হয় এবং স্বামীর ভাগ্য ভালোর জন্য স্ত্রী স্বামীকে তার চুল দিয়ে পা মুছে দেয় প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে।
২. রান্নার পর প্রথম (আগ) খাবার স্বামীকে দিতে হবে।
৩. মেয়েদের শাড়ি পরে কোমড়ের দিকে তাকাতে নেই এতে স্বামীর হায়াত কাটা যায়।
৪. বিয়ের পর মেয়েদের মাসিক হলে মাসিকের ৭ দিন স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারবে না। যদি থাকে তাহলে স্বামীর আয়ু কমে যায়।
৫. বউ-এর হাতের চুড়ি ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভালো চুড়ি না পরা পর্যন্ত হাত শাড়ির আচল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় অথবা সুতা বাঁধতে হয়। খালি হাত স্বামী দেখলে আয়ু কমে যায়।

www.pathagar.com

## ঋতুকালীন সময়ে নারীদের বিভিন্ন নিয়ম নীতি

একজন কিশোরী নারী নানাবিধ শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত হয়। এই মধ্যবর্তীকালীন রয়েছে নানা প্রকার বিশ্বাস সংস্কার। এছাড়াও ঋতুকালীন সময়ে মেয়েরা নানা প্রকার নিয়মনীতি পালন করে থাকে। রাজবাড়ী অঞ্চলের মানুষেরা নিয়মনীতির ভিত্তিতে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. একজন কিশোরী বালিকা প্রাকৃতিক নিয়মে যখন প্রথম পরিপূর্ণ নারীতে রূপলাভ করে [তার প্রথম মাসিক এর সময়] তখন তাকে মাছ, শাক এবং হলুদ খেতে দেয়া হয় না।

২. চুল পার হতে (ডেমাতে) দেওয়া হয় না। মনে করা হয় তাহলে ঈদের মধ্যে তার মাসিক হবে।

৩. তেল, মাছ, হলুদ খেলে মনে করা হয় মাসিকে প্রচুর গন্ধ হয় এবং কাপড় থেকে পরিষ্কার করতে সমস্যা হবে।

৪. ঋতুকালীন ব্যবহৃত কাপড় খুব সাবধানে বাইরে নেড়ে দিতে হয় এবং সন্ধ্যার আগে ঘরে তুলে গোপন জায়গায় রাখতে হবে। এই কাপড় নষ্ট হয়ে গেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৫. প্রথম ঋতুকালীন রজধারা হাতের আঙুলে ভরিয়ে দেওয়ালে বা মাটিতে তিনটা দাগ দিয়ে একটার অর্ধেক কেটে দিতে হয় এতে রজধারা ৩ দিনের বেশি স্থায়ী হয় না বলে এলাকাবাসী মনে করেন।

৬. শনি এবং মঙ্গলবার ঋতুকালীন ব্যবহৃত কাপড় যাদি কেউ নেয় তাহলে মহিলাদের সন্তান হয় না। এজন্য এই সকল কাপড় খুব সাবধানে রাখতে হবে।

৭. ঋতুকালীন ব্যবহৃত কাপড় পানিতে এবং আগুনে দিতে হয় না। যদি দেয় তাহলে সেই মহিলার বাচ্চা পানিতে ডুবে কিংবা আগুনে পুড়ে মারা যায়।

৮. মাসিকের কাপড় বাইরে থাকলে খারাপ বাতাস লাগালে খারাপ অসুখ হয় সেজন্য এই কাপড়গুলো খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়।

## যাত্রাপথের শুভাশুভ বিষয়ক বিশ্বাস সংস্কার

শিকারে যাত্রা, বৈবাহিক সম্পর্কে স্থাপনের জন্য যাত্রা, দৈনন্দিন জীবনের আরো যেসব উল্লেখযোগ্য কর্ম আসে সেসব সম্পন্নের উদ্দেশে ঘর থেকে বাইরে যাত্রাকালের কিছু ঘটনা ও দৃশ্যকে শুভাশুভের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

১. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় খালি কলস, বিড়াল, রাস্তায় মরা লাশ, বিচি কলা এবং এবং বন্ধ্যা দেখলে যাত্রা অশুভ হয়।

২. যাত্রার পথে নতুন কাপড়ের কথা বলতে হয় না। পেছন দিক দিয়ে ডাক দিতে হয় না এবং বাসি ঘরে বের হতে হয় না। এতে যাত্রা অশুভ হয়।

৩. ডানে সর্প বামে শিয়াল দেখলে যাত্র শুভ হয়।

www.pathagar.com

৪. মেয়েদেরকে বাম পা প্রথমে দিয়ে বের হতে হয় এবং ছেলেদের ডান পা প্রথমে দিয়ে বের হতে হয়।
৫. যাওয়ার সময় হোঁচট খেলে আবার একটু বসে যাত্রা শুরু করতে হয়।

**স্বপ্ন বিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কার**

রাজবাড়ী অঞ্চলের মানুষের স্বাপ্ন সম্পর্কে রয়েছে নানা প্রকার বিশ্বাস সংস্কার :

১. স্বপ্ন ভোরে দেখলে সেটা জীবনে ফলে যায়।
২. খারাপ স্বপ্ন যেন না ফলে সেজন্য পানির/জলের কাছে বলতে হয়।
৩. স্বপ্নের মধ্যে গোখরা সাপ, শোল মাছ দেখলে ছেলে এবং অন্য সাপ, টাকি মাছ দেখলে মেয়ে হয়।
৪. নারকেল পারলে বা চুরি করার স্বপ্ন দেখলে গর্ভবতী রমণীদের ছেলে হয়।
৫. স্বপ্নে দাঁত পরে যাওয়ার বা নড়ে যাওয়া দেখলে বোঝা যায় যে, বাড়ির মুরুব্বি অসুস্থ হবে বা মারা যাবে।
৬. বিয়ের স্বপ্ন অমঙ্গল বয়ে আনে।
৭. গর্ভবতী রমণী যদি স্বপ্নে তাল, আম, মিষ্টিকুমড়া দেখে তাহলে মেয়ে হয়।
৮. অবিবাহিত মেয়েরা স্বপ্নে সাপ দেখলে তার মাসিক-এর সময় হয়।
৯. স্থানে বড় গাছ ভেঙে পড়া দেখলে নিজের ক্ষতি হয় এবং নৌকা তলিয়ে মারা যাওয়া দেখলে নিজের অথবা পরের ক্ষতি হয়।
১০. স্বপ্নে নৌকার বেড়ানো দেখলে মনের আশা পূরণ হয়।

**রান্না সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার**

দেশের গ্রামাঞ্চলে নানা প্রকার পিঠা, আচার, মুড়ি ভাজা ইত্যাদি রান্না বা তৈরি করার সময় নানা রকম বিশ্বাস সংস্কার রয়েছে। রাজবাড়ী এলাকার মানুষ এগুলো বানানোর সময় অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলে। যেমন :

১. পিঠা যাতে কেউ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য প্রথম পিঠা চুলার পাশে রেখে দিতে হয় এবং চুলার পাশে রসুন শুকনো মরিচ রাখা হয়। এতে পিঠার উপর কোনো কুনজর পরে না এবং পিঠা সুন্দরভাবে ফোলে বলে সকলের বিশ্বাস।
২. পিঠার পাত্রে তিন মাথার ছায়া পড়লে পিঠা ভালো হয় না, এজন্য রাধুনী পিঠার পাত্রে যাতে তিনজনের ছায়া না পরে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন তেলের পিঠার পাশে কয়লা রাখা হয়।
৩. পিঠার যাতে কারো চোখ না লাগে সেজন্য পিঠার আটা গুলিয়ে প্রথমে ঢাকুনের উপর যোগ (+) চিহ্ন দেয়া হয়।
৪. মুড়ি ভাজার সময় বাইর থেকে যদি কোন ব্যক্তি আসে তখন যদি আর মুড়ি ভালো না হয় তখন ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করা হয়।

www.pathagar.com

৫. বিভিন্ন ফলের আচার করার সময় ঋতুকালীন সময়ে মেয়েদের এবং গর্ভবতী রমণীদের কাছে রাখা হয় না। এরা আচার তৈরির সময় পাশে থাকলে এমনকি আবারে এদের ছায়া পড়লে আচার নষ্ট হয়ে যাবে।

## কৃষি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার

কৃষি অর্থনির্ভর রাজবাড়ী জেলার লোকসমাজে কৃষিকার্য বিষয়ক বেশ কিছু বিশ্বাস সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেমন :

১. ধান বোনার সময় মানত করতে হয় যে, যদি ধান বা যে কোনো ফসল ভালোভাবে উৎপন্ন হয় তাহলে কৃষক মসজিদে মাজারে বা মন্দিরে সিন্নি দেবে অথবা খাশি জবাই করে গরিব দুঃখীকে খাওয়াবে।
২. মিষ্টিকুমড়া, ডালিম, পানিকুমড়া গাছে যাতে ছুত না লাগে এবং গাছে যাতে ফল ভালো হয় এজন্য গাছে গাস্বী দেওয়া হয়।
৩. যে কোন গাছ লাগানোর পর যখন দেখা যায় গাছে ফুল বা ফল কিছুই ধরছে না তখন গরুর কাঁচা দুধ এবং সোনা রুপার পানি গাছের গোড়ায় ঢেলে দিতে হয় ও গাছ তরতজার জন্য মাছের আঁশের পানি গাছের গোড়ায় দিতে হয়। গাছে যাতে কারো চোখ না লাগে সেই জন্য গাছে মানই, মুখাঝাড়ু, গরুর হাড্ডি, ধূপ দিতে হয়।
৪. যে কোনো গাছ শনি এবং রবিবারে সন্ধায় লাগাতে হয়, বিশেষ করে ঝিঙ্গা এবং লাউ গাছ।
৫. গাছে ফল না ধরলে ফল ধরার জন্য খড় গাছে বেঁধে দিতে হয়।
৬. নারকেল গাছে ফল আসার জন্য লোহা গেড়ে দিতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র পাঠ করা হয়।
৭. এছাড়াও যে কোন গাছে ফল আসার জন্য এক মুঠো চাল পানির মধ্যে ভিজিয়ে ৩ দিন রাখতে হয় এবং সেই পানি গাছে ছিটিয়ে দিতে হয়।

## লোকচিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কার

লোকসংস্কৃতির একটি বড় অংশ হলো লোক চিকিৎসাবিধির সূত্রসমূহ। লোকসমাজের প্রতিটি সদস্য নিজের দেহকে, পরিবারকে সকল সদস্যের দেহকে যেমন, রোগমুক্ত রাখতে চান তেমিন তার গৃহ ও কৃষির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জন্তু-জানোয়ার হাঁস মুরগিকেও রোগমুক্ত রাখতে চান। তার জীবন ও গৃহের চারদিকে অবস্থিত উদ্ভিদ ও প্রয়োজনীয় চারা (যেমন ধান, গম, আখ) লতাপাতা, যেমন লাউ কুমড়া প্রভৃতি শাকসবজির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। রাজবাড়ী জেলার লোকচিকিৎসার দুটি অংশ। একটি হলো যাদু বিদ্যাগত আর অন্যটি ঔষুধ সংক্রান্ত। যেমন :

১. ছোট বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগালে নারা হেজা গাছের পাতা আগুনে দিয়ে চিপে রস খাওয়ালে ঠান্ডা ভালো হয়।
২. লাউ, পেঁপে, পানিকচু এবং মাসকলাই ডাল পেট ঠান্ডা রাখে।
৩. চোখ উঠলে, বসন্ত হলে ঋতুকালীন মেয়েদের ছোঁয়া যাবে না।

www.pathagar.com

৪. আমাশয় হলে কবিরাজ ঝাড়ফুঁক [যাদুমন্তের সাহায্যে] দিয়ে তেল ও পানি পড়ে দিলে ভালো হয়।
৫. ঠান্ডা লাগলে দুধ ও কলা খেতে হয় না।
৬. সন্তানের ঠান্ডা লাগলে দুধের মধ্যে তেজপাতা দিয়ে গরম করে খাওয়ানো হয়।
৭. বড়দের ঠান্ডা কমানোর জন্য মধু খাওয়াতে হয়। মদনা কলা, ডাবের পানি, বিচা কলা, আখের রস, আখের গুড় এবং কচুর শাক খাওয়া নিষেধ।
৮. পাতলা পায়খানা হলে কাঁচকলা, মসুরের ভাল, পেঁপে এই তিন প্রকারের খাদ্য খেতে হয় এবং এর সঙ্গে ভাতের মাড় দিতে হয়।
৯. বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের জন্য মেয়েরা কবিরাজের দেওয়া গাছটা সকালবেলা গোসল করে ভেজা কাপড়ে চালের নিচে দাঁড়িয়ে খায় এবং তাদের একমাস খিচুরি খেতে হয়।

**সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিশ্বাস সংস্কার**

১. বিয়ের দিন ছেলে অথবা মেয়েকে গোসল করিয়ে হাতটা মাথায় উপর দিয়ে সেই হাতের উপর আতপ চাল, চিনি এবং আদা রাখা হয় সেই খাবারটা পাড়া প্রতিবেশীরা কনে অথবা বরের মাথার উপর থেকে টাকা দিয়ে নিয়ে খায়।
২. ছেলে যখন বিয়ে করে বউকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন বাড়ির মানুষজন দরজার সামনে একটা কাপড় পেড়ে রাখে এবং তার উপর তরিতরকারী ফেলা থাকে। নতুন বউয়ের হাতে একটা ডালা থাকে, ছেলেটা তখন তরকারীগুলো তুলে তার বউয়ের ডালার মধ্যে রাখে এবং সম্পূর্ণ তরকারী তোলা হয়ে গেলে বউকে কোলে করে সামনের পাঁচটা মুচি ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে নিয়ে তোলে।
৩. যে কোন বড় অথবা ছোট অনুষ্ঠানে ভাত রান্নার পরে মহিলারা কিছু ভাত আঁচলের গিরায় বেঁধে রাখে এবং অনুষ্ঠান শেষ হলে সেই ভাত পুকুরে বা নদীর পানিতে ফেলে দেয়। এতে অনুষ্ঠানে ভাত কম পড়ে না।

**গবাদি পশুর কল্যাণ বিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কার**

১. শনি ও মঙ্গলবার গোবর কাউকে দেওয়া হয় না এবং গোয়াল ঘরে কখনই পানের পিক ফেলা হয় না কারণ পানের পিক ফেললে গরুর অসুখ হয় বলে মনে করা হয়।
২. শ্রাবণ মাস যেদিন শেষ হয়ে যায় তখন গোয়াল ঘরে নতুন ঢাকুনে দুধ কলা দিয়ে দরজার সামনে রেখে আসে।
৩. কোনো অবস্থাতেই একজন ঋতুবতী রমণীকে গোয়াল ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।

**ভূত প্রেত বা অশরীরী আত্মা সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার**

এ অঞ্চলের মানুষের ধারণা বিশেষ বিশেষ পরিবারের মানুষের রোগ শোক অকাল মৃত্যুর পশ্চাতে এই অশরীরী আত্মার ভূমিকা রয়েছে। তারা আরো মনে করেন যে

www.pathagar.com

এহেন অনিষ্ট কাজ নেই যা এই অশরীরী আত্মার দ্বারা সম্ভব নয়। এখানে কিছু বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ করা হলো–

১. মাছ নিয়ে অনেক রাতে একা আসলে পিবাট/শয়তান/কানাহলা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে আসে এবং সেই ব্যক্তির অমঙ্গল করে। এজন্য হাতে আগুন নিয়ে গভীর রাতে চলাফেরা করতে হয়।
২. ভর দুপুরে রমণীদের চুল ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

**বশীকরণ সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার**

অনেক সময় কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের প্রতি প্রণায়াশক্ত হয়ে পড়ে। যখন এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার শিকার হয় তখন তারা গ্রামের ওঝা, কবিরাজের দারস্থ হয়। এসব ক্ষেত্রে কবিরাজ প্রণয়প্রার্থীর যুবক যুবতীদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। যেমন : তারা পানি পড়া, তাবিজ কবজ ইত্যাদি দিয়ে রমণীদের বশীকরণের প্রয়াস চালায়। প্রকৃতপক্ষে এরা ভিন্ন পথে অতি কৌশল প্রেমিকের কাঙ্খিত রমণীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

**দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার**

সুখময় সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে তুলতে বিয়ে অন্যতম একটি প্রথা এই বিয়ের মাধ্যমে নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। আর এই দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে আমাদের দেশে বেশ কিছু বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছে পরিবারের সব সদস্যরা এই সব বিশ্বাস আমাদের মনে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে এই একুশ শতকে এসেও এগুলো প্রায়ই আমাদের চোখে পরে যা আমরা দেখতে পাই এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে।

১. স্বামী এবং স্ত্রীকে এক সঙ্গে চোখাচোখি করে বাসর ঘরে পাঠাতে হয়। এতে সংসার সুখের হয়।
২. বাসর ঘরে প্রবেশ করে স্বামী এবং স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি মুখ করতে হয়।
৩. সংসার সুখের জন্য এবং দাম্পত্য জীবন আনন্দময় করে গড়ে তোলার জন্য স্ত্রীরা স্বামীর নাম মুখে বলে না।
৪. স্ত্রীদের হাতের চুড়ি নাকের ফুল, ভেঙে গেলে স্বামীকে তাড়াতাড়ি আবার গড়ে দিতে হয়। রাতে ঘুমানোর সময় স্ত্রী স্বামীর বাম পাশে ঘুমায়।

**ছড়ায় লোকবিশ্বাস ও সংস্কার**

লোকসাহিত্যের যে কোন অংশের মতো ছড়াতেও ধর্ম, যাদুবিদ্যা এবং অন্যান্য সামাজিক আচার পরিচয় বিধৃত। কখনও কখনও ছড়ার মাধ্যমেও প্রাচীন কালের সংস্কার ক্রমাগত বাহিত হয়ে এ কালে এসে পৌঁছেছে। যেমন :

১. বউ হইয়াছে রঙের বিবি

www.pathagar.com

স্বামী ধরো মারো
বরের লক্ষ্মী গেছে চলে।

২. স্বামী যাহার একটু নরম
বউ তাহার অতি গরম
মোটে নেই লজ্জা সরম
স্বামী মরে ডবে।

৩. থমকো মারি, তুমকে ডাক
কিচকো মারি আজ
কেনি মাটিকে নিবে ঘাম
আমি নিবি মাটি
তুই নিবি ঘাস।

৪. আকাশ কাটা হাড্ডাজি
নয় চাকা হলেদি
বাকলা বাঁশের মুরা
লাল চুলার পষণ
ঐ চারটা হলো আমার ব্যবসা।

৫. মাসি, পিসি, বগনা বাসী
বনের ধারে ঘর।
ক্যানদ্র মাসি, বলে নাতো,
খাই এর মোয়াটা ধর।

৬. ছিরি পান্ধ্য পাব্‌কা
তিন দয়ের এক্কা
সাতে শালিক পাখি
আটে বান্ধা গুটি
নয় এ নেগু ঘোর
দশ এ দিলাম জোড়া
এগারো এক রলি
বারো বিয়ের কলি
তেইশে তেরিপট্টি
চব্বিশে খেলা
পঁচিশে ঝাক।

৭. টেপরা গাছের কাঁটা
ধান বাড়ি দিয়া ঘাটা
একুশে আইস্
বাইশে বইস্

www.pathagar.com

তেইশে তেরিক কাটি
চব্বিশে খাক নবিশে লাক।

৮. লাড়িয়ারে মা নরিয়া
ইলশা মাছের ঝোল
সারা রাইতে কুকুর ভোকে
নারিয়া শাখা চোর।

৯. কুন কুন মাথায় উকুন
বিলীয় ভোলায়
বেড়ায় উকুন।

১০. আটুবারে বটুরা
মশা মারে কটুরা
মনোর তেলে
জলুক বাতি
পুরুক ত্যাল
নাক্কা ঝাল।

১১. কুচ কুচ কালো কাক
ডাকে খালি খালি
কখনো মেখে দিব
কাজলের কালি
ছোট পাখি, আন দেলি
রং মাখা ফুল
তাই দিয়া খোকনের
বাইধা দিব চুল

১২. ছিরেছি করমুকি
কামের রাঙা জিলাপি

১৩. কুসুর মুসুর
ওরকা ডুসুর
তিনকা লিয়ে
মারব কিলে
কুমড়ার চাক
থাবপুটি দিয়া
হাতে থাক।

১৪. ভাঙা চিরুনি আর আয়না
বেড়ায় গুঁজে রাখতে হয় না
যে বেড়ায় গুঁজে রাখে
অলক্ষ্মী কয় তাকে।

www.pathagar.com

## বিধি-নিষেধ

রাজবাড়ী জেলায় লোকসমাজে বেশ কিছু বিধি নিষেধ আছে। যেমন :

১. থালা বাসন পরিষ্কার করার পর সেই নোংরা পানি পাড়াতে হয় না, নাহলে রাত কানা রোগ হবে।
২. ভাদ্র মাসে কোন বিয়ে দেওয়া হয় না।
৩. বিবাহিত মেয়েদের গোসল করে কাপড়ের পানি পায়ে ফেলতে হয় না, তাহলে হায়াত কাটা যায়।
৪. আগ ভাত মেয়েরা খেতে হয় না।
৫. ভাসুরের নাম নিতে হয় না।

## বিবিধ

১. সন্ধ্যার সময় বাতি জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে হয়।
২. ঘর লেপে হাত না ধুয়ে শনি ও রবিবার অন্য বাড়িতে যেতে হয় না, গেলে বাড়িতে ইঁদুর লাগে। যাওয়ার বিশেষ দরকার হলে মাথায় তেল দিতে হয়।
৩. বাড়িতে বিয়ের পর প্রথম ছেলেমেয়ে আসলে শরবত দিতে হয়, না হলে ঘরে ইদুর লাগে।
৪. গভীর রাতে কুক পাখি ডাকলে অমঙ্গল হয়।
৫. চড়ুই পাখি মঙ্গলের সময় ডাকে অমঙ্গলের সময় চলে যায়।
৬. কোনো কিছু বলার সময় টিকটিক ডাকলে সত্য হয়।
৭. শুকনো ডালের উপর কাক ডাকলে খারাপ হয়।
৮. ঝাঁকে কাক ডাকলে বা সামনে বাড়াবাড়ি করে পড়লে মৃত্যু হয়।
৯. ভর দুপুরে গাছে উঠতে হয় না।
১০. বিয়ের পর ৬ মাস স্বামী-স্ত্রী রাতে একা বাইরে যেতে হয় না।
১১. দাঁতে পাথর পড়লে সংসারে ক্ষতি হয়।
১২. হাতের এবং পায়ের নখের উপর সাদা দাগ পড়লে সংসারে ক্ষতি হয়।
১৩. ডান হাতের নখে সাদা দাগ থাকলে রান্না ভালো হয়।

## বিবাহ বিষয়ক লোক বিশ্বাস

১. কার্তিক, চৈত্র ও পৌষ, ভাদ্র মাসে বিবাহ দিতে হয় না। এসব মাসে বিবাহ দিলে সংসার দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
২. একগালে চড় মাড়লে অন্য গালেও দিতে হয় নাহলে বিয়ে হয় না।
৩. বিয়ের সময় হলুদ কোটা লাগে না হলে বিয়ে ভেঙে যায়।
৪. বিয়ের দিনে স্বামী স্ত্রীকে অন্য বাড়িতে থেকে খাইয়ে আনতে হয়।
৫. বিয়ের দিন সকালে বর কনেকে মাছ দিয়ে খাওয়াতে হয়।
৬. মরা চাঁদের মাসে বিয়ে দিতে হয় না।

www.pathagar.com

**বিবিধ**

১. ভাত খাওয়ার সময় মুখ থেকে ভাত পড়ে গেলে শত্রু বাড়ে।
২. ভিক্ষুক কে দুইবার চাল দিতে নাই দিলে ঘরের লক্ষী চলে যায়।
৩. দুপুর বেলায় ঝগড়া হলে অমঙ্গল হয়।
৪. বৃহস্পতিবার গাছ লাগালে ফল ভালো হয়।
৫. শনি, মঙ্গলবার নতুন কাপড় পরতে হয় না।

## খ. লোকবিশ্বাস

**ভোগ দেওয়া**

অতীতকালে এই প্রথা বা বিশ্বাস ছিল। কোনো লোকে নিরন্তর পেটের পীড়া থাকলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দুধ ভাত বা অন্য কোনো রান্না করা খাদ্য, এক কথায় ভুক্তভোগী যদি বিশ্বাস করত যে, এই খাদ্য এই খাদ্য খেয়েয় তার পেটের পীড়া হয়েছে তাহলে ওই খাদ্যের কিছু অংশ মাঠের মধ্যে আল পথের কোনো তেমাথায় কলার পাতায় করে "বিন্নার ছোপ" (বড় ঘাস) এর মধ্যে সন্ধ্যার পরে গিয়ে রেখে আসতে একে "ভোগ দেওয়া" বলে। কার উদ্দেশে এই ভোগ দেওয়া তার কোনো বিবরণ নেই। বিশ্বাস তেমাথায় ভোগ দিলে তার পেটের পীড়া ভালো হয়ে যাবে।

**ভয় পেলে লোহা পোড়া পানি**

ভূত বা অন্য যেকোনো প্রকারে যদি কেউ ভয় পায়, তাহলে তাকে লোহা গরম করে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি সংগে সংগে খাওয়ানো হয়। একে তার ভয় কেটে যাবে এরকম বিশ্বাস।

www.pathagar.com

# লোকপ্রযুক্তি

## ১. লাঙল-জোয়াল

লাঙল দেখতে বাংলা সংখ্যা '২'-এর মতো। বাঁকা অংশের নিচে শেষ প্রান্তে লোহার তৈরি একটি বিশেষ পাত সংযুক্ত করা হয় যেটা মাটি কর্ষণ করে। এটিকে স্থানীয় ভাষায় 'ফাল' বলা হয়। উপরের প্রান্তে ধরার জন্য 'গুটি' থাকে। এটি হাতে শক্ত করে ধরে রাখতে হয়। গুটি এবং ফাল-এর মাঝখানের বাঁকা কোণাকৃতি অংশে একটি ছিদ্র থাকে। সেখানে প্রায় ৫/৬ হাত লম্বা একটি কাঠের দণ্ড ব্যবহার করা হয়। স্থানীয়ভাবে তাকে 'ইশ' বলা হয়। 'ইশ' গরুর কাঁধে ব্যবহৃত জোয়ালের সাথে বেঁধে সংযুক্ত করা হয়। 'জোয়াল' কাঠের তৈরি ৪/৫ হাত লম্বা। দুই মাথায় বাঁশের তৈরি দুটি ছোট খুঁটি থাকে যা দুটি গরুর কাঁধে আটকিয়ে দেয়া হয়।

## ২. চাঁই বা দোয়ারি

বাঁশের তৈরি এক ধরনের মাছ ধরার যন্ত্র। এগুলোও বাঁশের তৈরি চিকন শলাকা দ্বারা এক ধরনের বুনো শক্ত লতা বা বেত বা গুনা দিয়ে তৈরি করা হয়। গোলাকার চ্যাপ্টা আকৃতিতে তৈরি যন্ত্রগুলোর এক পাশ বন্ধ ও অন্য পাশে মাছ ঢোকার জন্য ফাঁক রাখা হয়। ফাঁকা মুখটা বিশেষভাবে তৈরি যাতে মাছ ঢুকে বের হতে পারে না পারে। এগুলো পানিতে বাঁধ তৈরি করে বা বিশেষভাবে তৈরি বাঁধ যাকে 'বানা' বলা হয়। তার ফাঁকে ফাঁকে পানির তলায় পেতে রাখা রাখা হয়।

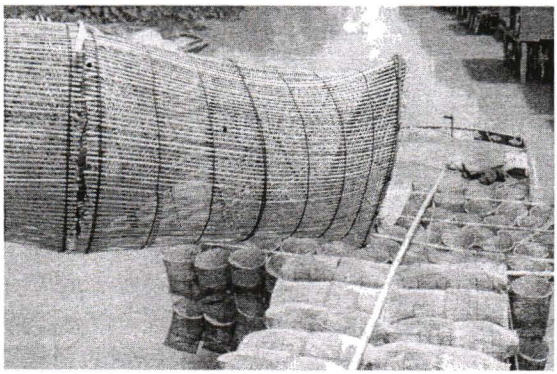

চাঁই বা দোয়ারি

www.pathagar.com

## ৩. খেপলা বা ঝাঁকি জাল

রাজবাড়ী অঞ্চলে মাছ ধরার জন্য খেপলা বা ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা হয়। চিকন সুতায় বোনা এই জাল এক দিক সরু অন্য দিক চওড়া থাকে। চওড়া অংশে লোহার কাঠি পরানো থাকে। বিশেষ পদ্ধতিতে কনুয়ের সাথে পেঁচিয়ে জাল ছুঁড়ে মারা হয় নদী বা পুকুরের দিকে– জাল ছড়িয়ে পড়ে। লোহার ভারে মাটিতে গিড়ে পড়ে। মাছ আটকে পড়ে। আর বেরুতে পারে না। এর পর আস্তে আস্তে টেনে পাড়ে তোলা হয়। আটকা পড়া মাছ বের করে আনা হয়। রাজবাড়ী অঞ্চলে ঝাঁকি জাল প্রায় সব বাড়িতেই আছে।

## ৪. কোচ

ছাতার শিক, সাইকেলের ও রিকশার শিক কিংবা সরু লোহার রড দিয়ে কোচের ফলা তৈরি হয়। এই ফলা সুতা কিংবা চিকন তার দিয়ে বাঁধতে হয়। বাঁধার পর এই ফলা লম্বা বাঁশের মাথায় যুক্ত করা হয়।

কোচ দিয়ে পানিতে ও কাদায় কুপিয়ে মাছ ধরা হয়। বোয়াল, শোল ও বাইন মছ ধরার জন্য কোচ খুব উপযোগী যন্ত্র। সাধারণত বর্ষাকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও কোচ দিয়ে মাছ ধরার প্রচলন রয়েছে।

## ৫. পলো

পলো বাঁশের তৈরি এক ধরনের মাছ ধরার যন্ত্র। একদিক সরু ও অন্য দিক খানিকটা ছড়ানো থাকে। অল্প পানিতে পলো দিয়ে মাছ ধরা হয়। সাধারণত বোয়াল জাতীয় মাছ ধরতে পলো ব্যবহার করা হয়।

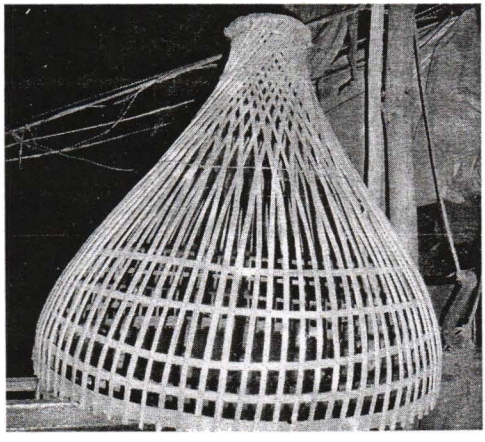

পলো

www.pathagar.com